প্রবন্ধ সংকলন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানকায়ে আমীনিয়া–আসগরিয়া

প্রবন্ধ সংকলন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

প্রবন্ধ সংকলন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশক:
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার (৪র্থ তলা), সুবিদবাজার, সিলেট।

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারী, ২০২৫।

সূচি

প্রাক কথন ০৪
ইমাম গাযালী (রাহঃ) ও তাঁর যুগ এবং আজকের সংস্কার আন্দোলন
প্রথম পর্ব ০৫
দ্বিতীয় পর্ব ২০
হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লা্হ্র
জীবন ও কর্মঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৩৩
একবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ও আল-কুরআন ৪৪
আমাদের পূর্বসুরী জ্ঞানান্বেষীরা ও আমরা ৬১
যুগের ফিতনা ও আমাদের কর্তব্য ৭১
ফিরে যেতে হবে আমাদের মূলে ৮৪
ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞান ও পুনর্জাগরণ ৯১
বাংলা ভাষাভাষী ইসলামপন্থী লেখকদেরক চ্যালেঞ্জ ১২০
দেশব্যাপী খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী ১২৪
কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সময় ১৩০
প্রাথমিক যুগের মহাত্মন সাধকদের বাণী থেকে আত্মশুদ্ধির সাধনা ১৩৬
ঈমানের আলোকে বিজ্ঞানশিক্ষা ১৪২
দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীল চেহারা এবং ইসলামী আক্বাঈদ ১৪৬
ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী মাদ্রাসা ও দারুল উলূম কানাইঘাটে একদিন ১৫৫
খানক্বার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৬৪
ফিরে এল সিয়াম সাধনার মাস- পবিত্র রমজান শরীফ ১৬৭
উপমহাদেশে বেসরকারি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা:
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৭১
ইসলাম ও বিজ্ঞান: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা ১৮৩
হযরত শায়খে কাতিয়া (রাহ.): যুগের শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিলের বিদায়গ্রহণ ১৯০
মান আ'রাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আ'রাফা রাব্বাহু ১৯৮
লন্ডনে সংবর্ধনা ও ‘বাহরুল উলূম’ উপাধিতে ভূষিত ২০২
আমাদের এই বসুন্দরা ও শ্রেষ্ঠ জীবী আমরা ২০৮
মুসলমানদের উত্তরাধিকার: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ২১৩
ইলমে তাছাওউফের গুরুত্ব ২১৬

প্রাক কথন

আলহামদুল্লিাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় বিভিন্ন সময়ে রচিত বেশ কিছু প্রবন্ধ একত্রিত করে একটি বইয়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠ করে পাঠকরা উপকৃত হবেন বলে আশারাখি।

লেখালেখির ওপর যাদের কাছ থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম ক'জন হলেন কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর সুযোগ্য খালিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দা.বা.), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, লেখক গবেষক কবি আবদুল মুকিত মুখতার, ড. মোহাম্মদ শামীম খান প্রমুখ। আল্লাহপাক তাদের সবাইকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন।

মানুষ হিসেবে লেখালেখির মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বভাবিক। আমি এজন্য সর্বোপারি আল্লাহর পবিত্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রয়োজন মনে করলে আমাকে অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সতর্কতার সাথে সংশোধন করা হবে।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।
১৮ জানুয়ারী ২০২৫।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম

ইমাম গাযালী (রাহঃ) ও তাঁর যুগ এবং আজকের সংস্কার আন্দোলন

প্রথম পর্ব ঃ ইমাম গাযালী (রাহঃ) ও তাঁর যুগ

দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আক্বীদার ওপর বার বার নাস্তিক, মুশরিক ও মুনাফিকরা আঘাত হেনে আসছে ইতিহাসব্যাপী। 'খাইরুল কুরুন' বা প্রাথমিক সর্বোত্তম তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এ তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন ধর্ম-দর্শনের উত্তরাধিকারী হিন্দু-বৌদ্ধ, জোরোস্তার, মাযদাক, গ্রিক ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের প্রভাব মুসলিম বিশ্বে পতিত হয় ধর্ম ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইসলামের চতুর্মুখী দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে। এতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ইসলামী মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস ও তাহজিব-তামাদ্দুন। ঈসায়ী অষ্টম শতকের শুরু থেকে জন্ম নিতে থাকেন স্বনামধন্য একাধিক মুসলিম জ্ঞানতাপস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী তথা হাদীস শরীফ থেকে তাঁরা পান অফুরন্ত প্রেরণা। এসাথে সংযুক্ত হয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন-জ্ঞান- যা ছিলো মূলত ইউক্লিড, পিথাগোরাস, ডেমোক্রেটাস প্রমুখের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা এবং সক্রেটিস, এরিষ্টটল ও প্লেটোর ভাববাদী দর্শন। আব্বাসী খিলাফত-কালে রাজধানী বাগদাদ হয়ে ওঠে মুসলিম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কয়েক শতাব্দি যাবৎ স্থায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে বাগদাদ শহর ছিলো সেযুগে পৃথিবীর মধ্যে সবদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। দর্শনের উপর গবেষণা সাধনে মুসলিম চিন্তাবিদরা গ্রিক গ্রন্থাদি আরবীতে ভাষান্তরের প্রয়োজন বোধ করলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবী [৮৭৩-৯৫০ খৃঃ] এবং ইবনে সীনা [৯৮০-১০৩৭ খৃঃ] ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরাই গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনা নিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী গবেষণা করেছেন। তাঁরা শুধু নিও-প্লাটোনিক দর্শনের বই-পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন

নি বরং, নিজেরা এর ব্যাখ্যা, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে দর্শনকে সুসম্মৃদ্ধ করেছেন।

সেযুগের মুসলিম জ্ঞানচর্চার এক পর্যায়ে ইসলামের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু বাদ-মতবাদ অনেক গবেষকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। এর ফল দাঁড়ালো, ইসলামের মৌলিকত্বের উপর মৃদু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঘাত যা অধিকাংশ চিন্তাশীলদের দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু এড়াতে পারে নি এক মহা-পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী দৃষ্টিকে। এই মহান জ্ঞানতাপস ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (রাহঃ)।

বিশ্ববিখ্যাত এই মুসলিম চিন্তাবিদ ৪৫২ হিজরীতে [১০৫৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তুলনামূলকভাবে তাঁর জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। হিজরী ৫০৫ সালে [১১১১ খৃঃ] তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তবে হায়াত কম পেলেও তিনি এর প্রায় সবটুকুই কাটিয়েছেন গভীর জ্ঞানান্বেষণে। আল্লাহপাক তাঁকে অত্যন্ত ক্ষণজন্মা জ্ঞানবান এক মাহাপুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পরে এরূপ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী জ্ঞানতাপস এ পৃথিবীতে আর কেউ আজো জন্ম নিয়েছেন কি না সন্দেহ আছে। তিনি ছিলেন একাধারে তাফসীরবিদ, মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সুফি ও সর্বোপরি উচ্চপর্যায়ের মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থকার। এককথায়, তিনি ছিলেন হাজার বছরের যুগসংস্কারক।

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্র আবির্ভাব ঘটে ইসলামী চিন্তা-চেতনার ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে। তাঁর সময়ে চারটি জ্ঞানচর্চা ছিলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ। এগুলো হচ্ছে গ্রিক ভাববাদী দর্শন, কালাম-শাস্ত্র, বাতিনিয়া বা তালিমিয়াদের তৎপরতা ও ইলমে তাছাওউফ। ইমাম সাহেব জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সত্যান্বেষী ছিলেন। আর তা খুঁজতে যেয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই মুক্তমনা রাখতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন- প্রকৃত স্বতঃস্ফূর্ত সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য পূর্বধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো পূর্বোল্লিখিত চারটি জ্ঞানচর্চার কোনটিকেই তিনি মহাসত্য বলে মেনে না নিয়ে এগুলোর আসল স্বরূপ কী তা আবিষ্কারের প্রয়াস পান।

ইমাম সাহেব তাঁর আত্মজীবনীমূলক ‘আল-মুনকিযু মিনাদ্দালাল’ নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন।

সেযুগের এই জ্ঞানান্বেষী দল-চতুষ্ঠয়ের উপর গভীর গবেষণা চালিয়ে সবগুলোতে তিনি ত্রুটি আবিষ্কারে সক্ষম হন। তিনি দেখিয়েছেন, এসব শাস্ত্র যে শুধু কলুষযুক্ত তা নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে এমন-সব উপাদান এতে সন্নিবেশিত হয়েছে যা ইসলামী মৌলিক ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংঘাতময় ও ক্ষতিকর। সুতরাং যুগসংস্কারক হিসেবে ইমাম সাহেব এগুলোর মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্মূলে অসীম সাহসের সঙ্গে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনভর এই সংগ্রাম চালিয়ে সফলতার চরমে পৌঁছেই তিনি এ ধরা থেকে পরপারের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমান।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) অন্য কারোর তুলনায় যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা বেশী অনুধাবন করেছিলেন তা ছিলো এই: ইসলামী মৌলিক আক্বীদা, বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় ওহীর জ্ঞানের সঙ্গে সংঘাতময় কোনো বাদ-মতবাদ শিকড় গেড়ে বসে থাকলে যে ক্ষতিকর ফলাফল দাঁড়ায় তাহলো- ঈমানী দুর্বলতা। ক্ষেত্রবিশেষে এ দূর্বলতা থেকে জন্ম নিতে পারে ধর্মের প্রতি অনীহা, এমনকি নাস্তিকতা (নাউযুবিল্লাহ্)। এই দুর্বলতার বাহ্যিক স্বরূপ পুরো সমাজে প্রকাশ পায় মুসলমানের আ’মালী জিন্দেগীতে। কারণ পরহেজগারী ঈমানী শক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে এ শক্তির উপর আঘাত পড়লে পুরো মুসলিম সমাজই লক্ষ্যচ্যুত হতে বাধ্য। এহেন দুর্বল মুসলিম সমাজ তখন অন্যের শিকারে পরিণত হয়।

ইমাম সাহেব তাঁর ক্ষুরধার মসীহকে বাহ্যিক ওয়াজ-নসিহতমূলক লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা মোটেই সমুচিত মনে করেন নি। বরং সমস্যার উৎসমূলে কলমী আঘাত হেনে ক্ষতিকর উপাদানগুলোর মূলোৎপাটনের পর, সঠিক সমাধান দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে উদ্ধার করে গেছেন। তাঁর জীবনভর গবেষণা ও কলমযুদ্ধের ফলে উল্লিখিত মৌলিক শাস্ত্র-চতুষ্ঠয় কলুষমুক্ত হয়েছিল। মুসলমানরা ফিরে পেয়েছিল ঈমানী প্রাণশক্তি। ফিরে পেয়েছিল তাদের একান্ত আপন, একক, ঐশীজ্ঞানে আলোকিত মহাসত্য- দ্বীন-দর্শন।

(২)

হযরত গাযালী (রাহঃ) ভূমিকায় উল্লিখিত শাস্ত্রগুলোর মধ্যে যেসব ত্রুটি পেয়েছিলেন তা আবিষ্কার করতে যেয়ে এগুলোর উপর গভীর অধ্যয়ন করেন। তিনি লিখেছেন, কোন বিষয়ের উপর আলোচনা-সমালোচনা আদৌ সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে পুরো ওয়াকিফহাল না হওয়া যায়। সুতরাং পশ্চিমা (গ্রিক) দর্শনকে ক্ষতিকর মনে করাই একজন গবেষকের জন্য যথেষ্ট নয়। এর উপর অধ্যয়ন করতে হবে গভীরভাবে। ঈমান-আমলী শক্তিসহ এ কাজে অগ্রসর হলে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া থেকে মুক্ত থাকা যাবে। কারণ, এসব শাস্ত্রে প্রাপ্ত আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কথা, ভাষার কাঠিন্য ও চারতুরতা অপরিপক্ক মনকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত সত্যান্বেষী ঈমান-আমলী শক্তি ও সতর্কতাসহ অগ্রসর হলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। ইমাম সাহেব প্রতিটি সত্য-সন্ধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সেযুগের শাস্ত্রের উপর সতর্কতাসহ গভীর অধ্যয়ন শেষে, শক্তিশালী যুক্তিতর্ক ও প্রমাণপঞ্জী সাপেক্ষে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে এসবের মধ্যকার ত্রুটিগুলো উদ্ঘাটক করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে মুসলিম সমাজকে সঠিক পন্থা দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর গবেষণার প্রভাব মুসলিম বিশ্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে পুরো পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হয়, যা আজো অনুভূত হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার সকল 'আস্তিক' গবেষক-দার্শনিকরা হাজার বছর ধরে তাঁর কাছে ঋণী হয়ে আসছেন, একথা পশ্চিমা গবেষকরা আজ অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) সমকালীন যুগের যে চারটি জ্ঞানান্বেষী দলের উপর অধ্যয়ন শেষে ত্রুটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার উপর একে একে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

(ক) ধর্মবেত্তা বা মুতাকাল্লিমদের মধ্যে ত্রুটি

ধর্মবেত্তাদের শাস্ত্র হচ্ছে কালাম। শাস্ত্রটি বিদ'আতীদের দ্বারা অনুসৃত বিভ্রান্তির ধূম্রজাল থেকে খাঁটি হকপন্থীদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়ে ক্রমে ডেভোলাপ করে। বিষয়টির ক্রমবিকাশের অবশ্যই একটি ইতিহাস আছে। আমরা সেদিকে এ প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

কালাম শাস্ত্রবিদ বা মুতাকাল্লিমগণ বলিষ্ঠ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সেযুগে প্রতিষ্ঠিত বিদআতী ও ভ্রান্ত ক'টি মতবাদ তথা কাদরিয়া, খারিজী, কারামাতিয়া, বাতিনিয়া, মুতাযিলা, শিয়া ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত সুন্নীপন্থীদের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে সক্ষম হন।

ইমাম সাহেব মুতাকাল্লিমদের এই বিরাট সাফল্যকে স্বীকার করেও কিন্তু তাদের প্রমাণ-পদ্ধতি ও তর্কনীতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আবিষ্কার করেন। আর তাহলো, প্রতিপক্ষের যুক্তিপ্রমাণে দুর্বলতা বের করে তা খণ্ডনের উপর অত্যধিক আধিক্য। অর্থাৎ, নিজেদের পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করার উপর শৈথিল্য। প্রতিপক্ষের বিশ্বাসে যে ফাটল আছে তা-তো ঈমানী-মানদণ্ডে বিচার করলে অবশ্যই সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ ব্যাপারটি তারা অনুধাবন করতে পারে না বলেই তো নিজেরা যেভাবেই হোক স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ তৈরী করে। এখন তাদের এসব প্রমাণপঞ্জীতে যে ভুল আছে, তা ধরিয়ে দেয়াই যথেষ্ট হবার নয়। বরং মুতাকাল্লিমদের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। কট্টর যুক্তিবাদী নিজের যুক্তিতে ভুল-ভ্রান্তি অনুধাবন করার পর সে অপরের আক্বীদায় বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বে সেটাতে শক্তিশালী স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিপ্রমাণ খুঁজে দেখবে। তারপর সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। মোটকথা, কালাম-শাস্ত্র দ্বারা উপকার হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু প্রত্যেক রোগীর জন্য তা মহৌষধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

(খ) বাতিনিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রুটি

এ দলটি তালিমিয়া নামক গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত ছিল। তারা একজন সাধু ইমামের অনুসরণের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ (হাক্বিকাত) জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বিবেচনা করতো। আর এই মহাসত্য লাভ করতে হলে 'তা'লিম' ছাড়া অন্য কেনো কিছুর প্রয়োজন ছিলো না। তালিমিয়ারা সর্বদাই একজন 'ইমামের' অনুসরণকে অত্যধিক গুরুত্ব দিত। ইমাম গাযালী (রাহঃ) তাদের এই ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রথমে গভীর অধ্যয়ন করেন। এরপর স্বয়ং বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে এদের চিন্তাধারার উপর একখানা গ্রন্থ রচনার নির্দেশ এলো।

ইমাম সাহেব দেখিয়েছেন, অস্পষ্ট, সর্বসাধারণের জন্যে দুর্বোধ্য এবং চরম বিদআতপূর্ণ তালিমিয়া মতবাদ ভীষণ ক্ষতিকর। তারা তাদের ইমামের উপর এতই গুরুত্বারোপ করতো যে, এতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরীকার অনুসরণের ক্ষেত্রে উপেক্ষা হতে থাকে। ইমাম সাহেব লিখেছেন, এটা একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অর্থহীন মতবাদ। এর প্রসারের জন্য অজ্ঞ ইসলাম দরদীদের ভ্রান্ত প্রতিকার পদ্ধতিই দায়ী। অর্থাৎ এদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও বিদআতগুলোর সঠিক জবাব না দেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ তালিমিয়াদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। ইমাম সাহেব যুক্তির মানদণ্ডে দেখিয়েছেন, 'ইমাম' হিসেবে আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বযুগের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা এই 'ইমাম' পদ্ধতিটি আধুনিক যুগে খ্রিস্টবাদে অনেকটা 'পোপ' পদ্ধতির অনুরূপ। বাতিনিয়ারা মনে করতো, মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ইমাম থাকবেন যার অনুসরণ সবাই করবে। তিনি সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকবেন, যে কোন সমস্যার সমাধান একমাত্র তিনিই দিবেন। বলাই বাহুল্য, তালিমিয়াদের ইমাম মানা আর শিয়াদের ইমাম মানার মধ্যেও খুব একটা পার্থক্য ছিলো না।

(গ) দার্শনিকদের মধ্যে ত্রুটি

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌র যুগে দার্শনিকদের মধ্যে তিনটি দল ছিল। এরা হচ্ছে: (১) বস্তুবাদী (Materialist), (২) প্রকৃতিবাদী (Naturalist) ও (৩) অস্তিবাদী বা ভাববাদী (Idealist)।

ইমাম সাহেব উক্ত তিনটি দলের মতবাদসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেকটিতে ত্রুটি আবিষ্কার করে তা কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বস্তুবাদীরা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী নাস্তিক। সুতরাং এদের নিয়ে বেশী কিছু বলার নেই।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বজগতকে গবেষণা করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উপর গভীর তথ্যানুসন্ধান চালায়। তারা সৃষ্টজগতের বিশেষকরে প্রাণীজগতের স্বরূপ দেখে বিনাবাক্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। তবে তারা রূহানী বা আত্মার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তারা

আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে দ্বিধা-ধন্দে আছে। বাস্তবে এ দলটি স্রষ্টাকে স্বীকার করলেও আত্মার অবিনশ্বরতা, পরকালের জিন্দেগী, কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করতো।

তৃতীয়তঃ অস্তিবাদীরা ছিলেন সে যুগের আধুনিক দার্শনিকগণ। এ গোষ্ঠির গুরুরা হলেন সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল। এরাই সফলভাবে প্রথমোক্ত বস্তুবাদী নাস্তিকদের মতবাদকে খণ্ডন করেন। এই গ্রিক জ্ঞানতাপস-ত্রয়ের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিফলিত হয়েছিল মুসলিম দার্শনিক ফারাবী ও ইবনে সিনার মধ্যে। ইমাম সাহেব এই মুসলিম দার্শনিক-দ্বয়ের চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে তিন ধরনের ত্রুটি আবিষ্কার করেন, যথা:- নাস্তিকতার প্রভাব, বিদ'আত ও মুবাহ্ বিষয়বস্তু। তিনি দেখিয়েছেন দার্শনিকদের গবেষণার মৌলিক বিষয়াদি যথা- গণিত, তর্কশাস্ত্র (কালাম), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা (Metaphysics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চরিত্রদর্শন, নীতিবিদ্যা (Ethics) ইত্যাদিতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

(ক) গণিত

গণিতশাস্ত্রকে মাদার অব সায়েন্স বলা হয়ে থাকে। তবে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এর কোন বিরোধ ইমাম সাহেব খুঁজে পান নি। ধর্ম গণিত থেকে মুক্ত। গণিত বা হিসাববিজ্ঞান দ্বারা বস্তুর ফিজিক্যালিটী ও গতিময়তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যেমন: সৌরজগতের গতিময়তা। গাণিতিক উপায়ে আমরা কোন্ সময় কোন্ স্থানে ভবিষ্যতে সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে তা সঠিকভাবে জেনে নিতে পারি। সুতরাং এই বিয়ষের সঙ্গে ধার্মিকতার সংঘাত কেন ঘটবে? তবে ইমাম সাহেব এই শাস্ত্রবিদদের উপর সূক্ষ্মভাবে দু'টি কুফল প্রতিফলিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন। এক. গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'সবকিছু'কে দেখা [যা আদৌ সম্ভব নয়] এবং দুই. যখন গবেষক গাণিতিক উপায়ে জগতকে অবলোকন করে মুগ্ধ হন তখন ধর্মবিশ্বাসকেও গণিতের ভাষায় বুঝতে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা দেখান। এরফলে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা ও শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ধর্মকে ত্যাজ্য বলে বিবেচনা করতে পারেন।

উপর্যুক্ত শেষোক্ত কুফল থেকে সমাজে সার্বিকভাবে আরেক ধরনের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাহলো, ইসলামী চিন্তাবিদগণ 'ইসলাম দরদী' সেজে পুরো দর্শনকেই সত্যবিচ্যুত একটি বিষয় বলে আখ্যায়িত করে এবং এ থেকে সমাজকে দূরে ঠেলে দেয়। দার্শনিকদের যাবতীয় শিক্ষা-দর্শনই বর্জনীয় বলে প্রচার করে। এমনকি তাদের অংকশাস্ত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যকেও ধর্মের নামে বর্জন করা হয়। অথচ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতের মানদণ্ডে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের কোন সংঘাত বিদ্যমান নেই।

ইসলামী কিছু চিন্তাবিদ সেযুগে বিজ্ঞানকে ও বিশেষকরে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা গণিতকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করার ফলে, সমাজে দর্শন ও দার্শনিকদের [এরা মূলত সেযুগের বিজ্ঞানী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন] মতবাদসমূহ বর্জন করার যে সিদ্ধান্ত নেন, তার কুফল সেযুগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইমাম গাযালী (রাহঃ) বলেছেন, সর্বসাধারণ যখন জানতে পারলো যে, বাস্তবে দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক যেসব তথ্যাদি প্রকাশ-প্রচার করছেন তা মূলত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন তাদের আস্থা দার্শনিকদের উপর আরও শতগুণ বৃদ্ধি পেল। এ থেকে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়লো ইসলামী ঈমান-আক্বীদার উপর। মুসলিম সমাজ ভাবতে লাগলো, ইসলামের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় (নাউযুবিল্লাহ্)। তারা দেখলো [ঐসব অপরিপক্ক ইসলাম দরদীদের একগুঁয়েমীর ফলে] ইসলাম বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করে। সুতরাং এই অযৌক্তিক, কাল্পনিক, অসত্য কথাটি সর্বত্র মারাত্মক প্রভাব ফেললো মানুষের ঈমান-আক্বীদার উপর।

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌র যুগে বৈজ্ঞানিক উন্নতি আজকের তুলনায় তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নি। তথাপি, ইমাম সাহেব অনেক বৈজ্ঞানিক বাদ-মতবাদ ও আবিষ্কারের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক ঈমান-আক্বীদার সামঞ্জস্য সেযুগেই অনুধাবন করেছিলেন। আধুনিক যুগে এসে এ সত্যটি সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। এ ব্যাপারে আমরা প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে কিছুটা আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ্।

(খ) তর্কশাস্ত্র

ইসলামী ঈমান-আক্বীদা ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কহীন দু'টি বিষয়। নানাবিধ প্রমাণ, নীতি-নৈতিকতার সংজ্ঞা-ভিত্তিক যুক্তিতর্ক, পূর্ব-নির্ধারিত এক্সিওম বা ধারণাভিত্তিক মতবাদ, সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণে শর্তাদি আরোপ ইত্যাদি হচ্ছে তর্কশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়াদি। তবে এ শাস্ত্র দ্বারা ধর্মবিরোধী মনোমুগ্ধকর মন্ত্র ভাষা ও যুক্তির সমন্বয়ে উপস্থাপন সম্ভব। এতে সাধারণ থেকে উচ্চপর্যায়ের পণ্ডিতরা পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে, বিনা-দ্বিধায় এ শাস্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট আক্বীদা বিরোধী মতবাদসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিতে পারেন। অর্থাৎ ভাষার মারপ্যাঁচে সুসম্মৃদ্ধ তর্কশাস্ত্র হচ্ছে 'ব্রেনওয়াশে'র সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার। তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা' দ্বারা অতি-প্রভাবিত যে কোন জ্ঞানবান পণ্ডিত ব্যক্তিও তর্কশাস্ত্র দ্বারা পথভ্রষ্ট হতে পারেন। হয়েছেনও অনেকে। মূলত তর্কশাস্ত্র বা 'ইলমুল কালাম' ধর্মবিরোধী বাদ-মতবাদ নিয়ে যেটুকু গবেষণা করেছে সে তুলনায় ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বা ধার্মিকতার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আলোচনায় শৈথিল্য দেখিয়েছে।

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মূলত সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বস্তুর গঠনপ্রণালীর উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই বুঝায়। ইমাম সাহেব ক'টি মাত্র বিষয় ছাড়া এই জ্ঞানচর্চায় ইসলামী চিন্তা-চেতনা-আক্বীদার সঙ্গে কোন বিরোধ খুঁজে পান নি। এ বিজ্ঞানের নেতিবাচক দিকটি হলো এইঃ এ বিষয়ের অনেক গবেষক মনে করেন স্বভাব (মাদার নেচার) স্বয়ংক্রিয় সত্তা বা স্রষ্টা। অর্থাৎ তাদের ধারণা, প্রকৃতিই স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। কিন্তু ইসলাম এই মতকে ভ্রান্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছে। পুরো নেচার বা বস্তুজগত আল্লাহ্‌র অধীন। সে (নেচার) কখনও স্রষ্টার (আল্লাহ্‌র) ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্দেশের বাইরে নিজে নিজে কোন কার্য-সম্পাদনে সক্ষম নয়। সে আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রিত আইনের অধীন। সুতরাং নেচারেল সাইন্সের সঙ্গে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। কিন্তু বস্তুজগতের মধ্যকার গুণগত প্রাকৃতিক আইন-কানুন যেগুলো গণিত শাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, সেগুলো কোন ক্রমেই ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হতে পারে না।

বাস্তবে ইসলামী চিন্তা-চেতনা-আক্বীদা ও ওহীর জ্ঞানে পরিপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে হাক্বিকাত বা স্বতঃসিদ্ধ মহাসত্য। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) যুগে এসে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র চরম উৎকর্ষলাভ করে। ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে যে মূলত বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নেই তার প্রমাণ তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন গবেষক বা বিজ্ঞানী সেযুগে ইসলাম ও এর শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন বা এর আক্বীদা-বিরোধী অবস্থানে অধঃপতিত হয়েছেন বলে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই।

(ঘ) অধিবিদ্যা

অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্সের মধ্যে সেযুগে ইমাম সাহেব তিনটি ক্ষেত্রে গবেষকদের বাদ-মতবাদ ইসলামের সঙ্গে ঘোর বিরোধপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ-

(ক) তারা বলে পুনরুত্থান হবে আত্মিক- দৈহিক নয়। কিন্তু ইসলামী আক্বীদা হচ্ছে শেষ বিচারের দিন দৈহিক ও আত্মিক পুনরুত্থান ঘটবে। অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে নশ্বর দেহকে আল্লাহপাক পুনর্গঠন করে সেদিন উত্তোলন করবেন।

(খ) তারা বলে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সার্বিক অর্থাৎ সমষ্টিগত জ্ঞান রাখেন বটে কিন্তু এর প্রত্যেকটির জ্ঞান এককভাবে রাখেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা নাস্তিকতার পর্যায়ভূক্ত। কারণ, আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্টভাবে তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত, এর একটি অণু-পরমাণুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। আরও বলেছেন, গাছের একটি পাতাও তাঁর অজান্তে ঝরে না।

(গ) সেযুগে তারা বিশ্বাস করতো, এ মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে ছিল এবং অনন্তকাল থাকবে। অর্থাৎ এ বস্তুজগৎ অতীত অনন্ত থেকে ভবিষ্যৎ অনন্ত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। এ বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিরোধী। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, এ মহাবিশ্ব আল্লাহ্র ইচ্ছায় সৃষ্ট এবং ফের তাঁরই ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে (বস্তুজগত) ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ঙ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ইমাম সাহেবের যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জাগতিক সাফল্য ও ক্ষমতা অর্জন কিভাবে সম্ভব এ নিয়েই মাথা ঘামাতেন। এর ব্যতিক্রম অবশ্য আজও আমরা

দেখি না। আধুনিক যুগের ‘গণতন্ত্র’, ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’, ‘সমাজতন্ত্র’, ‘জাতীয়তাবাদ’, ‘পুঁজিবাদ’, ‘কমিউনিজম’ ইত্যাদি ধারণা ও বাদ-মতবাদ শত শত বছর পরের ব্যাপার-স্যাপার। ইমাম সাহেবের যুগে মুসলিম বিশ্ব ছিলো টেকনিক্যালী খিলাফত ব্যবস্থার অধীন। আর বাস্তবতা ছিল রাজতন্ত্র।

ইমাম সাহেবের যুগ থেকেই কিন্তু প্রাচীন গ্রিকদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর গবেষণা শুরু হয়েছিল বলেই মনে হয়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘আল-মুনকিযু মিনাদ্দালাল’–এ এ-ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আসমানী কিতাব ও প্রাচীন পণ্ডিতদের (অর্থাৎ গ্রিকদের) পরম্পরায় প্রাপ্ত বাণীসমূহ ছিল তাদের [মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের] মূলনীতির উৎস’ [সত্যের সন্ধানে, মাওলানা মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত]।

বলাই বাহুল্য, গ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা যেহেতু মুসলিম সমাজে তখনও বাহ্যিকভাবে অপ্রকাশিত ছিল তাই এ নিয়ে ইমাম সাহেব তেমন বেশী গবেষণা করেন নি।

(চ) চরিত্রদর্শন

চরিত্র-দর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তু মানবাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইমাম সাহেব দাবী করেছেন, গবেষকরা দর্শনের এই পুরো শাখাটি সুফিদের কাছ থেকে ধার করেছেন। মানবাত্মার গুণাবলী, নীতি-নৈতিকতার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন কীভাবে সম্ভব- চরিত্রদর্শন এ নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে। ইমাম সাহেব নিজেই চরিত্র-দর্শনকে সর্বাপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর প্রখ্যাত কালজয়ী গ্রন্থ ‘ইহ্ইয়া উলূম উদ্-দ্বীন’–এ চরিত্র-দর্শনের আলোচনা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা ইতোমধ্যে কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। তিনি অতি কঠিন বিষয়বস্তুও সাধারণ্যের পাঠযোগ্য করে তুলেছেন। অপরদিকে উচ্চপর্যায়ের জ্ঞানপিপাসুরাও এ থেকে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারেন। ইমাম সাহেবের এই গ্রন্থটি আজো পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে সুপাঠ্য একটি বই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) উপর গভীর গবেষণা শেষে এতে দু’টি ত্রুটি আবিষ্কার করেন। তিনি এগুলোকে আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই আপদ-দ্বয়ের একটি সমর্থকদের ও অপরটি এর বিরোধীদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য।

প্রথমতঃ ইমাম সাহেবের যুগে প্রচলিত সমর্থকরা এ শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ও সুফিদের বাণীসমূহ লক্ষ করে নিঃসংকোচভাবে তা মেনে নেন। কিন্তু দার্শনিকরা যে অতি সূক্ষ্মভাবে কৃত্রিম সত্যগুলোকেও শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন, তা তারা [সমর্থকরা] অনুধাবন করতে না পেরে ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। মূলতঃ সমর্থকরা চরিত্রদর্শন দ্বারা উপকৃত যেটুকু হয়েছিলেন, সে তুলনায় তাদের অপকার হয়েছিল অধিক।

অপরদিকে ঘোর বিরোধীরা আরও বেশী আপদে পতিত হয়। এরা পুরো দর্শনকেই অস্বীকার করে বসে। যার ফলে ভাল ও সিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলোও এরা অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। ইমাম সাহেব বলেন, বুদ্ধিমানদের উচিৎ যে কোন মনীষীর কথা, উক্তি, উপদেশ কিংবা দর্শনকে নিজস্ব ঈমান-আক্বীদার মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করা এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন করা। তিনি অবশ্য এ নীতি সর্বসাধারণের জন্য অবলম্বন সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থায় দর্শনশাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে। ইসলামী ঈমান-আক্বীদা দৃঢ়ভাবে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তা আলোকিত হওয়ার পর দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অনেকটা নিরাপদ। মোটকথা ইসলামী উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন সুধীজনরা দর্শন শাস্ত্রের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে অপারদর্শী, অপরিপক্ক ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই দর্শনের পাঠাভ্যাস থেকে দূরে রাখতে হবে। তিনি ‘আল-মুনকিযু মিনাদ্দাল’–এ মন্তব্য করেন, ‘এ আপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে সাধারণ লোকদেরকে তাদের [দার্শনিকদের] রচনাবলীর পাঠাভ্যাস থেকে বিরত রাখতে হবে। যেমনি দূরে রাখা হয় সন্তরণ জানে না এমন লোককে সমুদ্রে অবতরণ ও এতে স্নানাদি থেকে অথবা নিষেধ করা হয় শিশুদের সাপ নিয়ে খেলতে’ [সত্যের সন্ধানে, পৃঃ ২৯]।

এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে আমরা আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাব থেকে কিভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্। তবে এখানে এটুকু বলে রাখি, ইমাম সাহেব যে দর্শনকে ‘সাপ নিয়ে খেলা’র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেই দর্শন-সাপটি আজ অজগর তূল্য রূপ ধারণ করেছে। না, এর অর্থ দর্শনকে পুরোপুরি অগ্রাহ্যকরণ নয়। বরং পশ্চিমা দর্শনের নেতিবাচক দিকগুলোর বিরোধিতা বুঝাচ্ছে। আজ আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই অজগর

নিয়ে খেলছে। সুতরাং এ যামানায় ক'জন আছেন যারা পাশ্চাত্য-দর্শনের দংশন থেকে মুক্ত? বাস্তবে পুরো আধুনিক মুসলিম বিশ্ব দংশনে আক্রান্ত। এই বিষক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে সমাজবিধ্বংসী ক্যান্সার রোগ যা ইসলামী ঈমান-আক্বীদা, তাহজিব-তামাদ্দুনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সমাজের এই দুরাবস্থা সত্যিই ভয়ংকর।

ইমাম সাহেব (রাহঃ) তাঁর যুগের সত্যান্বেষী চারটি প্রসিদ্ধ দলের মধ্যে ইতোমধ্যে আলোচিত তিনটির উপর গভীর গবেষণা চালিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্জন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্য সফলভাবে আঞ্জাম দেন।

মহাসত্যের সন্ধানী ইমাম গাযালী (রাহঃ) এখানে এসে কিন্তু থামেন নি। ইলমে তাছাওউফ শাস্ত্রের উপর তিনি এবার গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি এ বিষয়ের উপর লিখিত উচ্চপর্যায়ের কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন। আবু তালিব মক্কী (রাহঃ), হারিস মুহাসিবী (রাহঃ), আল্লামা শিবলী (রাহঃ), আবু ইয়াজিদ বিস্তামী (রাহঃ) প্রমুখ সুফি সাধকদের পুস্তকাদি ও বাণীসমূহ পাঠ করলেন। তবে তাছাওউফ এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র অধ্যয়ন দ্বারা এর সঠিক স্বরূপ বুঝা যায় না। তাছাওউফ বুঝতে হলে তাছাওউফপন্থী হতে হবে বা সুফিদের রাস্তায় চলতে হবে। প্রণালীবদ্ধ 'তরীকা' অনুসরণ করে শায়েখ বা মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক আত্মিক পরিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয়লাভকে বলে ইল্‌মে তাছাওউফ। এই জ্ঞানার্জন অধ্যয়নলব্ধ নয় বরং অভিজ্ঞতালব্ধ। তাছাওউফচর্চার মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের সাধনা ছাড়া প্রকৃত হাক্বিকাত লাভ সম্ভব নয়, যা ইলমে লাদুনী বা সাধকের অন্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের শর্ত হচ্ছে একজন কামিল পথপ্রদর্শক বা মুর্শিদের হাতে বয়েআত গ্রহণ। ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌র মুর্শিদ ছিলেন আবু আলী ফরমাদী ফযল ইবনে মুহাম্মদ আলী (রাহঃ)।

এ প্রবন্ধে আমরা ইমাম গাযালীর (রাহঃ) যুগ ও তাঁর কর্মের উপর আলোকপাত করছি মাত্র। স্বল্প পরিসরে তাঁর বর্ণাঢ্য, সুদূরপ্রসারী জীবন-কর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে এসে আমরা যেসব সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়েছি, তাঁর যুগেও অনুরূপ অনেক সমস্যা মুসলিম উম্মাহের উপর পতিত হয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আমাদের

ধারণা, সেযুগ ও এ যুগের সমস্যাবলীর মধ্যে একটি প্যারালাল বা মিল বিদ্যমান। এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াস। দ্বিতীয় পর্বে আমরা এর উপর আরও আলোকপাত করার আশারাখি। এখানে এটুকু বলে রাখি, সেযুগে ইসলামী ঈমান-আক্বীদার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকে ইমাম সাহেব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা সফলভাবে প্রতিহত করেছিলেন। আজও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে পুরো মুসলিম বিশ্ব আঘাতপ্রাপ্ত- যার প্রভাবে গোটা সমাজ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে। এই হামলাটি আসছে ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংঘাতময় পাশ্চাত্যদর্শন থেকে। সে যুগের মতো এযুগেও অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ এ দর্শনকে ইসলামী ঈমান-আক্বীদার মৌলিক মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষতিকর উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজ সর্বগ্রাসী চতুর্মুখী এই হামলা মুসলিম সমাজকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসৃত সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে। আজ আবারও ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ভিতকে তার স্বস্থানে সুদৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এ কাজটি আঞ্জাম দেয়া ইসলামী শরীয়ত, তরীকত ও দর্শনের উপর গভীর গবেষণা ছাড়া সম্ভব নয়।

সত্যান্বেষণে ইমাম গাযালী (রাহঃ) সবশেষে ইল্‌মে তাছাওউফকে সঠিক রাস্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তবে এযুগের মতো সেযুগেও ভণ্ড পীরদের অভাব ছিলো না। ইমাম সাহেব সঠিক তাছাওউফপন্থী ও ভণ্ডদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সর্বসাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত 'হাক্বিকাত' বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে শুধুমাত্র ইলমী গবেষণা দ্বারা উন্মোচন আদৌ সম্ভব নয়। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র যদিও মানবজীবনের উৎকর্ষ-সাধনে বিরাট অবদান রেখেছে, কিন্তু প্রকৃত মহাসত্য দর্শন দ্বারা বের করা অসম্ভব। কারণ, এ মহাসত্য উপলব্ধির ব্যাপার। এটা কখনও যুক্তি, গবেষণা আর চিন্তা-চেতনা থেকে আবিষ্কার করা যায় না। শেষ জীবনে ইমাম সাহেব দীর্ঘ ১০ বছর সংসারত্যাগী সুফি-দরবেশের হালতে সিরিয়া, বায়তুল মুকাদ্দাস, মক্কা ও মদীনা শরীফ ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সুফি ইমাম গাযালী (রাহঃ) এই দীর্ঘদিনের সাধনার মাধ্যমে যেটুকু জ্ঞানলাভ করেছিলেন তা তিনি 'আল-মুনকিযু মিনাদ্দালাল' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। তিন বলেন, "এ ১০ বছর কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে আমি সন্দেহাতীতভাবে এ সত্যটি

উপলব্ধি করেছি যে, সুফিমণ্ডলীই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সাধক, তাঁদের নৈতিক চরিত্র মানবকুল শ্রেষ্ঠ, জীবনদ্বারা অতি স্বচ্ছ এবং তাঁরা নিখুঁত ও উন্নততর নৈতিকতায় এতই বলিষ্ঠ ও উচ্চমানের যে, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও শরীয়তবেত্তাদের যাবতীয় জ্ঞান গরিমার সমন্বয় করেও এর মুকাবিলা হবে না" [সত্যের সন্ধানে, পৃঃ ১৮]। মোটকথা, ইমাম সাহেব ইলমে তাছাওউফের মধ্যে আসল সত্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি এ সত্যে উপনিত হওয়ার ক্রমধারা একটি মাত্র বাক্যে ব্যক্ত করেছেন এভাবে: 'যুক্তিপ্রমাণ-ভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত 'জ্ঞান' [দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান] – এ অনুসিদ্ধান্তগুলো প্রত্যক্ষ করার নাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা [অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান – সুফিদের সাধনা] এবং শ্রবণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে উপলব্ধি [ইল্‌মে মা'রিফাত – আল্লাহ পরিচিতি] করার নাম ঈমান" [সত্যের সন্ধানে, পৃঃ ৯৯]।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) যুগ ও আজকের সংস্কার আন্দোলনের উপর প্রবন্ধের এ প্রথম পর্বের সমাপ্তি এখানেই টানছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা আজকের মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে যে বহুমূখী সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা চিহ্নিতকরণ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান খুঁজে বের করার দিক-নির্দেশনার উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন এবং ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখুন। আ-মিন।

সিলেট, ৬ জুন ২০০৫ ইং।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম গাযালী (রাহঃ) ও তাঁর যুগ এবং আজকের সংস্কার আন্দোলন

দ্বিতীয় পর্ব ঃ আজকের সংস্কার আন্দোলন

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানিত্বের উপর বহুমূখী আক্রমণের চিত্র সম্পূর্ণটা তুলে ধরার স্কোপ এ প্রসঙ্গে নেই। মুসলিম উম্মাহকে যদি আমরা একটি দেহের সাথে তুলনা করে দেখি তাহলে বলা যায়, এর পা পঙ্গু, হাত অচল, দেহে ক্যান্সার রোগ, চোখের উপর অন্ধকার পর্দার আবরণ, কর্ণে সীসা-ঢালা অবস্থা। এর আসল রূপ-রং-চেহারা সম্পূর্ণ বিকৃত। এই বহুধা রোগাক্রান্ত দুর্বল দেহ-খানাকে সতেজ-সজাগ-তেজস্বীকরণ ও ভেতর-বাইরে প্রাণশক্তি যোগানোর প্রয়োজন বোধহয় সকল ঈমানদার ব্যক্তি মাত্র অনুভব করবেন।

ইসলাম ও মুসলমানিত্বের উপর এহেন হামলা অতীতে অনেকবার হয়েছে। ইতোমধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রথম পর্বে আমরা প্রায় ন'শ বছর পূর্বে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্র যুগ ও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কার-কার্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করেছি। আমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে যে, ইমাম সাহেবের যুগে ইসলামী বিশ্বাস-আক্বীদা ও চিন্তা-চেতনায় যেভাবে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল, এযুগেও ঠিক তাই হচ্ছে ও হয়েছে। পার্থক্য শুধু মাত্রা ও শক্তির ক্ষেত্রে। সেযুগের তুলনায় আজকের এই প্রভাব শতগুণ শক্তিশালী ও বহুমূখী। তখনকার যুগে দর্শনের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (নেচারেল সাইন্স) নামমাত্র ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু আজ পুরো দর্শনই বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ত্রুটিপূর্ণ দর্শন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক থিওরীবলীর মধ্যে [যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল- এ দাবীও কেউ করতে পারবে না] সখ্যতা গড়ার প্রবণতা এখন প্রকট। সুতরাং ‘মুক্তচিন্তা’ এখন এক অভিনব নাস্তিক্যবাদিতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নীতিকে মানবজীবনের ঈমান-আক্বীদার মাপকাঠি হিসেবে

চিহ্নিতকরণের প্রবণতা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান বা প্রভুবিশ্বাসও এখন বৈজ্ঞানিক যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। দর্শন এখন এভাবে বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

আধুনিক যুগে এই দর্শন-বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে ধার্মিকতা ও আস্তিক চিন্তা-চেতনার ভিত উপড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এখানে 'ধার্মিকতা' শব্দটির প্রয়োগ অহেতুক নয়। কারণ, 'ইউরোপীয় অন্ধকার যুগে' [জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ বাস্তবে মধ্যযুগ বলতে খৃস্টীয় ৫০০ থেকে ১৫০০ সাল এই হাজার বছরকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এ যুগটি কোন ক্রমেই পুরো পৃথিবীর জন্য 'অন্ধকার' ছিলো না। আসলে এই 'অন্ধকার যুগ' পুরোটাই ছিলো ইউরোপে সীমাবদ্ধ। এই সময়টা কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের 'আলোকিত যুগ' ছিল। এই স্বর্ণযুগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ঢাকা দেয়ার প্রবণতা আজ বহুদিন যাবৎ ইউরোপীয় লেখক, বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিকরা দেখিয়ে আসছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজেও অনেকে 'মধ্যযুগীয় কায়দায়', 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' ইত্যাদি কথা লিখেন। এখানেও পশ্চিমাদের চিন্তা-চেতনা যে কত মারাত্মকভাবে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করেছে তার প্রমাণ মেলে।] খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাধর 'চার্চ'-এর ধর্মের নামে অগ্রহণযোগ্য কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া থেকেই 'রেশনালিজম'র ভিত স্থাপিত হয়। আর এই 'চরম যুক্তিবাদী' দর্শনের সম্মুখে চরমভাবে বিকৃত ইয়াহুদী-খৃস্টবাদী চিন্তা-চেতনা-দর্শন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপরদিকে একই সময় ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরবর্তী যুগে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের সুবাদে পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মৌলিক আবিষ্কার ও চিন্তা-চেতনাকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

বৈজ্ঞানিক এই চেতনার সঙ্গে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত চরম যুক্তিবাদী দর্শন পশ্চিমা জগতে সখ্যতা গড়ে তুলে। যার ফলে এই শক্তিশালী জুটির বহুমুখী আক্রমণের শিকার হয় চরমভাবে সত্যবিচ্যুত ঐশী-ধর্মদ্বয় ইয়াহুদী-খৃস্টবাদ। এই হামলা থেকে ধর্ম-জুটি আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব পড়ে রেশনালিজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দর্শন-

বিজ্ঞান থেকে। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে পৃথিবীব্যাপী শুরু হয় পশ্চিমা উপনিবেশিক সম্প্রসারণ। ইউরোপিয়ানরা নানা কৌশলে কলোনাইজেশন প্রক্রিয়া সফল করে তুলে। এরপর দীর্ঘকাল রাজনীতিক ক্ষমতা দখলে রেখে তাদের নতুনভাবে প্রাপ্ত চরমভাবে কলুষিত ধর্ম-দর্শনকে শাসিত নেটিভদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যখন পশ্চিম ইউরোপে কৃষি থেকে শিল্প বিপ্লবের উত্তরণ ঘটছিল, ঠিক তখন বৃটিশ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র 'কেরানি' তৈরীর বিপ্লব শুরু করেছিল। সুতরাং ইচ্ছে করেই শিল্পায়ন প্রক্রিয়া থেকে শাসিতদের বঞ্চিত করা হয়। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শুধু নিজেরাই যাতে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয় সে নীতি বহাল রেখে, পুরো বহির্বিশ্বকে শাসক হিসেবে ক্ষমতাবলে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখে। চরম স্বার্থপর এই বেনিয়াদের পলিসির শিকার আজ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ অঞ্চল। উপনিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সাদা চামড়ার ঐ ধূর্ত শাসকরা পাক-ভারতে একটি শিক্ষানীতি চালু করে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ্-উদ্-দৌলার ক্লাইভের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের মাত্র ২৪ বছর পর, ধূর্ত ইংরেজ গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস 'মহামেডান কলেজ অব ক্যালকাটা' নামকরণে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন। পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানই 'কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত ইংরেজরা 'কেরানি' সৃষ্টির জন্য মুসলমানদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কারণ, সেযুগে মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মশিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। ইংরেজ বেনিয়ারা বুঝতে পারলো যে, মুসলমানদেরকে শাসন-যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, তাদের ধর্মশিক্ষার সঙ্গে পশ্চিমা শিক্ষা জড়িত করতে হবে। তাই এই পলিসি গ্রহণ করলো।

এ প্রসঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা আদৌ উদ্দেশ্য নয়। সেযুগে বৃটিশ বেনিয়ারা যে তাদের স্বার্থরক্ষার্থে সরকারী খরচে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছিল, তা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করলাম মাত্র। অবশ্য আলিয়া মাদ্রাসা এখনও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর বর্তমানে এতে ইসলামী শিক্ষার অগ্রাধিকারই দেয়া হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ আলিম-উলামাও বেরিয়ে এসেছেন। তবে সার্বিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় যে পশ্চিমা দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান, তা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে।

আমার ধারণা আধুনিক শিক্ষানীতিতে পাশ্চাত্য-দর্শনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে লালন করায় মুসলিম বিশ্বে ক্ষতি হচ্ছে সর্বাধিক। উন্নত বিশ্বের জন-জীবনের চাকচিক্য ও আপাতদৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থাকে অনুসরণ করে নিজেদের জীবনের মানোন্নয়ন কল্পে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্ষিয়া মুসলিম বিশ্বে খুব গতিবেগে এগিয়ে চলছে। পাশ্চাত্যকরণ বা ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রক্ষিয়ার সবটুকুই আমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য- তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম দেশে ভারী শিল্পায়ন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তরণ কোন ক্রমেই ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের থেকে ধার করে প্রযৌক্তিক জ্ঞানের প্রসার আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঘটানো শুধু উচিত নয় বরং একান্ত কাম্য। কিন্তু আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, বাস্তবে ওয়েস্টার্নাইজেশন এরূপ কলুষমুক্ত কোন ব্যাপারকে বুঝায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারক-বাহক ছিলেন মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘকাল যাবৎ। মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা গ্রিক বিজ্ঞান শুধু পুনঃআবিস্কৃত হয় নি, কলুষমুক্ত হয়ে চরম উন্নতিলাভ করেছিল। সুতরাং বৈষয়িক উন্নতিসাধনের হাতিয়ার এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে আজ মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা বিরোধী হতে পারে? কখনও নয়। পাশ্চাত্যকরণ আসলে একটি মুখোশধারী প্রক্রিয়ার নাম। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে তাদের ঈমান-আক্বীদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। পশ্চিমা 'বেহায়পণায়' নিয়ন্ত্রিত কালচারেল আগ্রাসন দ্বারা মুসলমানদের তাহজিব-তামাদ্দুনকে নিশ্চিহ্ন করা। এককথায়,

ধর্মহীন পশ্চিমা সমাজের মতো তথাকথিত 'মুক্ত' মন-মানসিকতায় মানুষকে গড়ে তুলে মুসলিম বিশ্বকেও একটি ধর্মহীন সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এই ওয়েস্টার্নাইজেশনের আসল লক্ষ্য। এ কাজ কিন্তু শুধু বাইর থেকে সম্ভব নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমা দর্শনের সরাসরি প্রভাব থেকে সমাজে সচরাচর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তথাকথিত 'প্রগতিশীল' শব্দের ব্যানারে একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এ দলটির ব্যাপ্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের লেখালেখি ও কর্ম-তৎপরতার মাধ্যমে তারা পশ্চিমা সমাজ-ব্যবস্থাকে মুসলিম সমাজে এ-টু-জেড প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামী মৌলিক ঈমান-আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তারা প্রকাশ্যে কটাক্ষ করে যাচ্ছে। দ্বীনকে তারা 'অন্ধবিশ্বাস' বলে আখ্যায়িত করে। দ্বীনদার মুসলমান ও আলিম সমাজকে তারা 'মৌলবাদী' বলে গালি দেয়। ইসলামী সমাজ-বিধ্বংসী পশ্চিমা-দর্শনে বিকৃত-মস্তিষ্ক এ অভ্যন্তরীণ জ্ঞানপাপী দলটির আক্রমণ থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায়? আজ এই প্রশ্নটি সচেতন মহলে বার বার উঁকি দিচ্ছে। জবাব তো খুঁজে বের করতেই হবে।

অনেকে সঠিক দিকনির্দেশনা খোঁজছেন। মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা কলমী যুদ্ধকে গতিশীল করা, সভা-সমিতির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণ, বিক্ষোভ-মিছিল করে প্রতিবাদ জানানো, রাজনীতির মাঠে নেমে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি হচ্ছে কার্যকর পদক্ষেপ। কথাগুলো অনেকেই বলে থাকেন।

উপর্যুক্ত প্রতিটি পন্থাই নিঃসন্দেহে উৎসাহ-ব্যঞ্জক। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো, এগুলো মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ এসব তৎপরতা মূলত 'অন দ্যা সারফেস এক্টিভিটি'। এগুলো দ্বারা স্থায়ী সুফল সম্ভব নয়। এসব কার্যাদি হচ্ছে কোন বিষ-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন কিংবা পাতা মুণ্ডানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মাধ্যমে বৃক্ষের আদৌ কোন ক্ষতি হচ্ছে না। সে পুনরায় শাখা-প্রশাখা ও নতুন পল্লবী গজাবেই। এর কারণ হলো, সে মাটি থেকে রস ঠিকই পাচ্ছে। তার মূল সম্পূর্ণ অক্ষত ও সজীব।

এদেশে পশ্চিমাপন্থী বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির বিষ-বৃক্ষটি মূলত সর্বদাই অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। সিজন এলেই 'জ্ঞানপাপী' নামক ফলগুলো এই বৃক্ষ

থেকে উৎপাদন হয়ে সমাজে বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে এই বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ বিষ-বৃক্ষটিকে সমূলে ধ্বংস করা।

পাঠকরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই এই বিষ-বৃক্ষটি কি তা ধারণা করে নিয়েছেন। এটা হচ্ছে, পশ্চিমা দর্শনে পুরোদমে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত আজকের বৃহত্তর শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটি দু'শ বছরেরও বেশী পুরনো। ইংরেজ বেনিয়াদের দ্বারা সৃষ্ট এই শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার যা কিছুই হয়েছে, তাতে একটি বিষয় অক্ষত রয়ে গেছে- আর তাহলো ইসলামী ঈমান-আক্বীদা বিরোধী পশ্চিমা দর্শন দ্বারা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। আর যেহেতু পশ্চিমা দর্শন সেযুগের তুলনায় আজ আরোও ব্যাপকভাবে নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবমান, তাই এই নিয়ন্ত্রণের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা (অর্থাৎ, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি) থেকে যে প্রোডাক্ট বা শিক্ষিত-সমাজ তৈরী হচ্ছে, সেটি ঈমান-আক্বীদায় দুর্বল এক ভয়ংকর ফৌজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের নয়নের মণি নতুন প্রজন্মকে পাশ্চাত্য-দর্শনে কলুষিত এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এ থেকে রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায় কি?

আমি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। আমার ধারণা, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কার ছাড়া 'জ্ঞানপাপী' সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সমূলে ধ্বংস-সাধন আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, 'মাদ্রাসা-শিক্ষা'র তুলনায় আধুনিক সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। সুতরাং মাদ্রাসা-শিক্ষা যদি নৈতিক দিক থেকে সুনাগরিক গড়ে থাকে, তবে তা ভালো কথা। কিন্তু বাকী সিংহভাগ মুসলিম ছেলেমেয়েরা কোথায় যাচ্ছে? এদেরকে নিয়ে তো আমাদের ভাবতে হবে।

সঠিক ইসলামী জ্ঞান ও দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কয়েকটি প্রস্তাব

(প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির 'বাদ-মতবাদ' থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে'র অনুসারী সকলেই নিম্নল্লিখিত বোর্ডগুলোতে

সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। আমাদের আক্বীদা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ। আসহাবদের প্রত্যেকেই 'সত্যের মাপকাঠি' হিসেবে আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাঁরা সকলেই আমাদের আদর্শ। সুতরাং নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবগুলো যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বাতিল-পন্থীরা যাতে এতে আশ্রয় না পায়, সেদিকে সতর্ক-দৃষ্টি একান্ত জরুরী। চরম বিদআতী ও বাতিল-পন্থীদের নিয়ে সঠিক সংস্কারমূলক কাজ শুধু অসম্ভব নয়- অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় রাখুন।)

(ক) শীর্ষস্থানীয় ইসলামী গবেষক-চিন্তাবিদদের [এদের সবাই মাদ্রাসা-শিক্ষিত হওয়া জরুরী নয়] দ্বারা সুগঠিত একটি 'জাতীয় গবেষণা বোর্ড' গঠন।

এই বোর্ডের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী ঈমান-আক্বীদা বিরোধী এবং ক্ষতিকর প্রত্যক্ষ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসহ নেতিবাচক প্রভাবসমূহ বৃহত্তর জনসমক্ষে তুলে ধরা। সহজ সরল বাংলা ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে জ্ঞানগর্ব 'ইলমী' গবেষণার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখা দরকার সমাজ সচেতনতা ছাড়া কোন বৈপ্লবিক সংস্কার আন্দোলন সম্ভব হয় না। এ বোর্ড সরকারী শিক্ষানীতির উপরও প্রয়োজনমাফিক 'উপদেশ', 'সতর্কীকরণ' ও 'চাপ' সৃষ্টি করবে।

(খ) উক্ত বোর্ডের ছায়া সংগঠন হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'ইসলামী ঈমান-আক্বীদা ও আধুনিক শিক্ষা' নামকরণে এডভাইজরী বোর্ড গঠন।

এই বোর্ড সাধারণ মানুষকে সঠিক শিক্ষার্জন সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেবে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দ্বীনি ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ করেও কিভাবে ফায়দা হাসিল সম্ভব, এ উপায়টি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হবে এই এডভাইজরী বোর্ডের কাজ। লক্ষ করুন, এখানে আমি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা কনি নি। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই এরূপ

লিখেছি। মোটকথা, ইসলাম ও এর ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের বিরোধিতা আমাদের জন্য কোন সুফল বয়ে নিয়ে আসবে না। আমরা চাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্মৃদ্ধ, সুন্দর, উন্নত, ধনাঢ্য, নৈতিকতায় উৎকৃষ্ট একটি সুশৃংখল সমাজ গড়ে উঠুক। কিন্তু বৃহত্তর সমাজগঠনে ঐসব লক্ষ্যর্জনে ঈমানী শক্তির দূর্বলতা নয় বরং সবলতাই পূর্বশর্ত বলে আমাদের বিশ্বাস। অথচ বর্তমান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা ঈমানী সবলতার পরিবর্তে একেবারে দুর্বল মানস ও মনন নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমগ্র জাতি। নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্র-গঠনে ঈমান-আক্বীদা ও তাহজিব-তামাদ্দুনের বিকল্প নেই। পশ্চিমা দর্শনের ব্যাপক অধ্যয়ন ও এর গ্রহণযোগ্যতা এবং একশ্রেণীর নামধারী ইসলাম দরদীদের অপতৎপরতার ফলে এ লক্ষ্যর্জন আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং 'পাশ্চাত্যকরণ', 'প্রগতি' ও 'আধুনিকীকরণের' নামে আমাদের শিক্ষিত সমাজকে পশ্চিমা 'জড়বাদী' ও 'নাস্তিক্যবাদী' দর্শন দ্বারা দিগ্‌ভ্রান্তকরণ কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। চিন্তাশীল সুধীজন কবে এই সত্যকে অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসবেন?

(গ) 'সরকারী ও কওমী মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার' নামকরণে হক্কানী উলামা-পীর-মাশায়েখ ও ঈমানে-দীপ্ত বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের নীতি-নির্ধারক বোর্ড গঠন।

মাদ্রাসা-শিক্ষার মৌলিক বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ন রেখে স্পেশালাইজ্‌ড বিষয় হিসেবে অ-কলুষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবী। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ অর্থে এটাই বুঝায়। আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজীসহ ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযৌক্তিক বিষয়গুলোকে ক্যারিকুলামে স্থান দিতে হবে। মনে রাখা জরুরী, ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণ সাপেক্ষে একথা এখন দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হয়েছে যে, ইসলাম দ্বারাই গোটা বিশ্ব আলোকিত হয়েছিল- তথাকথিত ইউরোপীয় 'অন্ধকার' যুগে। ইসলামের আলোকোজ্জ্বল সর্বোৎকৃষ্ট নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা ও সে-

সঙ্গে মুসলিম মনীষীদের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সেই ইউরোপীয় অন্ধকার যুগকে ভেদ করে জাগিয়ে তুলেছিল গোটা বিশ্বকে। একদিকে ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে নিষ্কলুষ তাওহীদ ও অপরদিকে আধ্যাত্মিক খোরাক প্রদান করতে সুফিতত্ত্ব ও ইলমে তাছাওউফ 'ইনসানে কামিল' গড়ার আদর্শ হিসেবে মানবজাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল। আজকের মডার্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসম্মৃদ্ধ বিশ্ব-সমাজ ইসলামের কাছে চিরঋণী- এ সত্যটি অকপটে সকল চিন্তাশীল মনীষীরা স্বীকার করছেন। অতীতে এই সত্যকে তারা চাপা দেয়ার তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এখন আর নয়। সুতরাং, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার-করা জ্ঞান বলে মনে হলেও বাস্তবে এর উত্তরাধিকার আমরাই। আমাদের পূর্বসুরী জ্ঞানতাপসরা এর গবেষক, রক্ষক, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক। এরাই এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। আজ আমরা ইয়াহুদী-নাসারা ও ইসলামী নামধারী তাদের এজেন্টদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছি। আমাদের মাঝে নৈতিক চরিত্র-গঠনের শিক্ষা তথা ইসলামী ঈমান-আক্বীদা ও বৈষয়িক উন্নয়নের জ্ঞান তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটে নি। এর কারণ হলো, দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মেইনস্ট্রীম শিক্ষাব্যবস্থায় অনাগ্রহ- যার কারণ আগেই বলেছি; স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমা দর্শনের ব্যাপক প্রভাব। আর অপর কারণটি হলো, উপনিবেশিক সময়কার শিক্ষানীতির অতি অল্প সংস্কার। ইংরেজ বেনিয়াদের 'কেরানি' সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থার কতটুকু সংস্কার হয়েছে সুধী পাঠক বাস্তবতার আলোকে একটু ভেবে দেখুন।

আজ থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর আগে যুক্তরাজ্যের উচ্চপর্যায়ে (হাইয়ার এডুকেশনে) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী। একই সময় বাংলাদেশের উচ্চ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন ছিল 'আর্টস' তথা কেরানি সৃষ্টির ছাত্র-ছাত্রী। এ সমীক্ষায় অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্র অন্তর্ভূক্ত নয়। আজ দীর্ঘ ২৫ বছর পর স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ের হার আমার সঠিক জানা নেই। কিন্তু খুব একটা বেশকম হয়েছে বলে মনে হয় না। এই হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনাগ্রহতার একটি নমুনা। অথচ বৈষয়িক উন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ব্যাপক শিক্ষা

ও প্রসার ছাড়া আজকের চরমভাবে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ঠিকে থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

মোটকথা, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির পাশাপাশি কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো একান্ত জরুরী। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলিমরাও কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র দক্ষ ফোর্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবেন দেশের সরকারী-বেসরকারী ইন্ডাষ্ট্রি ও দপ্তরসমূহে চাকুরী গ্রহণ করার। এতে অভিভাবকরা সন্তানদেরকে একই সঙ্গে ইসলামী বিষয়াদির উপর আলিম ও মেইনস্ট্রীম কর্মজীবী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনের তাগিদেই অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের রুজি-রোজগারের উপর অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে তা হয় না বলে একটি বিশ্বাস সবার মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এই বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটবে যখন অভিভাবকরা মাদ্রাসায় গিয়েও দেখতে পাবেন সেখানে কম্পিউটার, ল্যাবেরটরি ও প্রযৌক্তিক যন্ত্রপাতি বিদ্যমান। সুন্নাতী লেবাস পরেও ছাত্ররা সেখানে গবেষণা চালাচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর। এই দৃশ্যটি অবশ্যই তাদের মননে রেখাপাত করবে।

অবশ্য মনে রাখা জরুরী যে, মাদ্রাসাশিক্ষা মূলত ইসলামী শিক্ষাকেই বুঝায়। সেখানে ক্যারিকুলামে বিজ্ঞান ও প্রযৌক্তিক বিষয়ক প্রসার যাতে এ মৌলিক শিক্ষাকে কোনক্রমে ক্ষুণ্ন না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ ঈমান-আক্বীদা, সুন্নাতের উপর পাবন্দ, ইলমের সঙ্গে আ'মলের জরুরত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদির উপর গুরুত্বকে কিছুতেই হ্রাস করা চলবে না। যেমন একদল নামধারী মুসলমান আজকাল তা করে থাকে। তারা বলে ইসলামকে 'আধুনিক' করতে হবে! তারা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের উপর অতি অল্পই গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাদের মুখে একমুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি নেই- কিন্তু তারা 'ইসলামী বিপ্লব! ইসলামী বিপ্লব!' বলে চিল্লাচিল্লি করে। এহেন দলের সংখ্যা আজকাল বেশ কয়েকটি আছে। যে যুগে ইসলামী মৌলিকত্বকে আরো সুদৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জরুরত দাঁড়িয়েছে, সে যুগে এসে এই ভ্রষ্টরা ইসলামকে পাতলা বানাতে চায়! এদের খপ্পর থেকে সবাই সাবধান!

ইলমের সঙ্গে আ'মলের গুরুত্বকে অবশ্যই সর্বত্র আরোও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বিশেষ করে আলিয়া লাইনের মাদ্রাসায় আজকাল এর প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এটা শুভ লক্ষণ নয়। বিজ্ঞানী হয়েও সুন্নাতি লেবাস, মাথায় টুপি বা পাগড়ী রাখা, নামাযের প্রতি যত্নবান, মুখে একমুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি, পায়ের গোড়ালির উপরে লুঙ্গি-পাজামা রাখা ইত্যাদির প্রতি পাবন্দ থাকাতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে বা হবে বলে আমি মনে করি না। মাদ্রাসা শিক্ষিত আলিমরা হচ্ছেন বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির 'রোল মডেল'। অর্থাৎ এরাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার 'আদর্শ'। সুতরাং তাঁরা নিজেরাই যদি ইসলামী লেবাস তথা ইয়াহুদী-খৃস্টান ও অন্যান্য বিধর্মীদের কাপড়-ছোপড় পরা পরিত্যাগ করে নিষ্কলুষ সুন্নাতী পরিধেয় না পরেন, প্রতিটি ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাতে-মুয়াক্কাদা-সুন্নাত সঠিকভাবে আমল না করেন, এসব মৌলিক আক্বীদাগত বিষয়ে শৈথিল্য কিংবা বে-আমলী খাসলত প্রদর্শন করেন তাহলে, বৃহত্তর সমাজে তাঁদের আদর্শ বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হওয়ার গৌরব কতটুকু স্বার্থক হবে? সমাজে তাঁদের প্রভাব প্রতিফলিত হবে কি করে?

ইসলামী ঈমান-আক্বীদা রক্ষার্থে ও সমাজের অবক্ষয় রোধে বৃহত্তর সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন মহল অবশ্যই অবগত আছেন। ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌র যুগ ও তাঁর সংস্কার-কার্যের উপর প্রবন্ধের প্রথম পর্বে কিছুটা আলোচনা করে আমি এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, সেযুগে 'গ্রিক' দর্শনের অতিপ্রভাবে যেভাবে মুসলিম সমাজ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, আজও 'পশ্চিমা-দর্শন' একইভাবে বৃহত্তর উম্মাকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেযুগে মহাত্মন ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌র মতো ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি সারাজীবন ইলমী গবেষণা চালিয়ে এককভাবে যুগের সংস্কার-সাধন করে ইসলামী দ্বীন-দর্শন ও ঈমান-আক্বীদাকে কলুষমুক্ত করেছিলেন। তাঁর ইলমী প্রভাব সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজও বিদ্যমান।

আজকের পৃথিবীতে এসে আমরা সেযুগের মতো পশ্চিমা দর্শন দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। আমাদের মাঝে ইমাম গাযালী (রাহঃ) না থাকলেও তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বিদ্যমান। এগুলোর উপর

ব্যাপক গবেষণা চালালে আমরা অবশ্যই উপকৃত হবো। সুতরাং তাঁর ইলমী গবেষণাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে আসুন আমরা সবাই ঈমান-আক্বীদা রক্ষার্থে, নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত আমাদের মুসলিম সমাজকে বাঁচাতে, বৃহত্তর ঐক্য গড়ে সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একমাত্র হক্কানী আলিম-সমাজই এই মহান কার্যে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আমাদের সমাজে একাধিক গোষ্ঠি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে- যারা ইসলামের নামে দুনিয়ার স্বার্থের পরিচর্যা করছে। এরা আদৌ ইসলামের কোন লাভ করতে সক্ষম হবে না। বরং এদের দ্বারা বিরাট ক্ষতি হচ্ছে ও হবে। ঐক্য গড়তে গিয়ে এদেরকে যে কোন মূল্যে এড়িয়ে যেতে হবে। আক্বীদাগত ব্যাপারে কী কোনদিন আপোস চলে? সুতরাং আমি সবশেষে সবার প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি- যাঁরা ইসলামী চিন্তা-চেতনায় সজাগ আছেন, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির স্বার্থে দু'টি মাত্র আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে আসুন।

এক. নৈতিক চরিত্র-গঠনে ইসলামী ঈমান-আক্বীদা-দর্শন, তাহজিব-তামাদ্দুন, তাছাওউফ ও ইলমের সঙ্গে আ'মলের গুরুত্ব অনুধাবন ও সমাজে এগুলো প্রতিষ্ঠা।

দুই. বৈষয়িক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করে ব্যাপকভাবে সর্বত্র এর বিস্তার।

ইসলামী সমাজগঠনে এই দু'টি আদর্শের বিকল্প আমি কিছু দেখছি না। প্রথমটির উপর অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সমাজকে খাপ খাইয়ে প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে ঠিকে থাকা ও বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মানবজীবনের মানোন্নয়নের সম্ভাবনাকে উন্মোচন করা। সবশেষে আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদেরকে সাহায্যের আবদার করছি। এছাড়া এ লেখার মধ্যে যেটুকু ভুল-ত্রুটি হয়েছে তার জন্য প্রভুর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আ-মিন।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ
ইমাম গাযালীর জীবন ও দর্শন, আল্লামা শিবলী নোমানী, অনুবাদঃ কাওসার বিন খালেদ।
আল-মুনকিযু মিনাদ্দালাল, ইমাম গাযালী (রাহঃ), অনুবাদঃ ‘সত্যের সন্ধানে’ নামকরণে, মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন।
তাহাফুতুল ফালাসিফা, আল্–গাযালী, অনুবাদঃ আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দিন।
আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, আব্দুস সাত্তার, অনুবাদঃ মোস্তফা হারুন।
দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, সাইয়িদ মাহবুব রিয্ভী, অনুবাদঃ আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ও মাওলানা মুশতাক আহমদ।
ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

সিলেট, ১৭ জুলাই ২০০৫ ইং।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র জীবন ও কর্মঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

উপমহাদেশে আধুনিক যুগে হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র মতো স্বনামধন্য লেখক হয়তো আর কেউ জন্মেন নি। মুসলিম চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সাধারণ ও বিশেষকরে ইসলামের জ্ঞানান্বেষণে তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছে। প্রায় ১০০০ গ্রন্থের প্রণেতা এই জ্ঞানতাপস মুসলমানদের জন্য রেখে গেছেন ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডার। উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে এই জনপদের সঠিক ইসলামী ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে এই মহান জ্ঞানতাপসের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছি।

জন্ম ও শিক্ষা

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র পৈতৃক সূত্রে ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এবং মাতুল সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত আলী ইবনে আবুতালিব (রাঃ)। ভারতের যুক্ত প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলাধীন থানা ভবন গ্রামে ৫ই রবিউচ্ছানী ১২৮০ হিজরীর, ১৯ সেপ্বের ১৮৬৩ সালে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো আব্দুল হক। তিনি ফার্সী ভাষার একজন পণ্ডিত ছিলেন। তখনকার অনেক পত্র-পত্রিকায় তিনি ফার্সীতে প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেন। এছাড়া মীরাটের একজন ধনী জমিদার হিসেবে তাঁর সুপরিচিতি ছিলো। তবে ধনী হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানবীর। ধনকে সিন্দুকে ভরে রেখে আল্লাহর সৃষ্টি এবং পরকালের মুক্তির পথ রোধ করেন নি। রূহানিয়্যাত চর্চাও ছিলো তাঁর জীবনের সাধনা।

মাওলানা থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র এক ছোট ভাই ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো আকবর আলী। তাঁর আর কোন ভাই-বোন ছিলেন না। মাত্র ৫ বছর বয়সের সময় তাঁর মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হোন। ছোট থেকেই তিনি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করা শিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ ছিলো। এছাড়া অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচিতি মিলে। তিনি স্কুলের পাঠ সর্বদাই মুখস্থ করে নিতেন। বাল্য কালেই আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) পরহেজগারীর দিকে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেন। ১২ বছর বয়স থেকে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়া শুরু করেন। নামাযের প্রতি তিনি সেই অল্প বয়সের সময়ই কতটুকু অনুরাগী ছিলেন তা একটি ঘটনা থেকে জানা যায়।

একদা তিনি সঙ্গীদের সব জুতা সারিবদ্ধভাবে সাজালেন। এরপর সামনে এক জোড়া জুতা রেখে দিয়ে সমবয়সী সাথীদের ডেকে বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, জুতাগুলো জামাআতে নামায পড়ছে!"।

হযরত আশরাফ আলী থানভীর (রাহঃ) শিক্ষাজীবন মীরাট থেকেই শুরু হয়। এখানে থাকাকালীন তিনি প্রথমে পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেন। এরপর ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার্জন শেষে ১২৯৫ হিজরীতে (১৮৭৮ সালে) উচ্চ শিক্ষার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে চলে আসেন।

সুপ্রসিদ্ধ এই দারুল উলূম শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছিলো না। এটা ছিলো ভারতে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। হাজার বছরের মুজাদ্দিদ হযরত আহমাদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (রাহঃ) সংগ্রাম, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভীর (রাহঃ) সংস্কারমূখী বলিষ্ঠ লেখনী, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ্‌র বিপ্লবী চিন্তাধারা ও স্বপ্ন এবং জিহাদী উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলই ছিলো উপমহাদেশের এই প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব-দানকারী অনেকেই এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। একাধারে জিহাদী চেতনা, আধ্যাত্মিক চর্চা ও কলমের সংগ্রাম এই প্রতিষ্ঠান থেকেই একযোগে পরিচালিত হচ্ছিল। সুতরাং হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভীও এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে জগতখ্যাত লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মাত্র ৫ বছরের মধ্যে অপূর্ব মেধার অধিকারী আশরাফ আলী থানভী সাহেব ১৩০১ হিজরীতে দেওবন্দের লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। সুতরাং মাত্র ২০ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি মিশকাত শরীফ, মুখতাছারুল মাআনী, নূরুল আনোয়ার, মুল্লা হাসান, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে রিয়াযী (গণিত), ইলমে নহভ (বাক্য-বিন্যাস), ইলমে মাআনী, ইলমে আদব, ইলমে ফালসাফাহ (দর্শন) প্রভৃতি উচ্চতর শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন। 'হায়াতে আশরাফ' নামক তাঁর জীবনী-গ্রন্থে মোট ২২টি ভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি বিদ্যার্জন করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বের হয়ে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) কিরাআত শিক্ষার জন্য সুদূর আরব দেশে গমন করেন। সেখানে প্রখ্যাত ক্বারী আব্দুল্লাহ মুহাজির মক্কীর নিকট মক্কা শরীফে কিরাআত শিক্ষা করেন। তাঁর কুরআন পাঠ এতো সুন্দর ছিলো যে, প্রখ্যাত গ্রামোফন কোম্পানী 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' তা রেকর্ড করার ইচ্ছাপোষণ করে। কিন্তু থানভী সাহেব শরীয়তের বরখেলাফের ভয়ে এতে রাজী হন নি।

শিক্ষাজীবন শেষে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) নিজ বাড়ি থানা ভবনে ফিরে আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষকতার জন্য কানপুরের একটি মাদ্রাসায় তাঁকে ডাক দেয়া হলো।

শিক্ষকতা

মাসিক মাত্র ২৫ টাকা বেতনে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) কানপুরের মাদ্রাসায়ে ফয়ূযে আম-এ শিক্ষক হিসেবে ১৩০১ হিজরীতে যোগদান করেন। এখানে দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। অচিরেই শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়ার জন্য কানপুরের মাদ্রাসায় আসতে লাগলো। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি অতি জটিল কোন বিষয় সহজ-সরল উদাহরণ দ্বারা ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। এটা তাঁর একটা বিশেষ গুণ। তাঁর অসংখ্য বই পুস্তকেও এরূপ অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। মাসআলা-মাসায়িলসহ ফিকহ শাস্ত্রের বইগুলোতে তিনি পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে অহরহ বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন। এছাড়া

তাঁর প্রখ্যাত ‘বয়ানুল কুরআন’ (পরবর্তীতে ‘তাফসীরে আশরাফী’ নামে প্রকাশিত) গ্রন্থে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

কানপুরে ১৪ বছর অধ্যাপনার সময় হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লা্হ্র নিকট শিক্ষাগ্রহণ করে উপমহাদেশে অনেক স্বনামধন্য আলিম-উলামা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক বর্ধমানী (রাহঃ), মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রাহঃ), মাওলানা আহমাদ আলী ফতেহপুরী বারাবাংকী (রাহঃ), মাওলানা সাইয়্যেদ ইসহাক আলী কানপুরী (রাহঃ), মাওলানা মাজহারুল হক চট্টগ্রাম রামু (রাহঃ) ও হাকীম মুহাম্মদ মোস্তফা বিজনূরী (রাহঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ক’জনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

ইলমে তাছাওউফের অন্বেষায়

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) শিক্ষাজীবন শেষে ১৪ বছর শিক্ষকতার পরও কিন্তু জ্ঞানের তীব্র পিপাসা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। ইসলামের বাহ্যিক সব ক’টি শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কোথায় যেন অপূর্ণতা, একটি শূন্যতা তিনি অনুভব করছিলেন। এই অপূর্ণতা বা অভাব যে জ্ঞান দ্বারা মেটানো সম্ভব তা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হচ্ছে ইলমে তাছাওউফ। এই জ্ঞান হচ্ছে অলিখিত সত্যোপলব্ধি। এটা অর্জনে গুরু তথা মুর্শিদের প্রয়োজন। থানভী সাহেব এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই একজন কামিল মুর্শিদের খুঁজে তিনি ব্যকুল হয়ে উঠলেন।

সেযুগের শ্রেষ্ঠ এমন একজন কামিল ব্যক্তি ছিলেন যাঁর নাম হচ্ছে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ)। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সিপাহসালার ও গাজী যুগশ্রেষ্ঠ এই অলির কাছে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) বাইআত গ্রহণ করেন। হায়াতে আশরাফ গ্রন্থে এই বাইআত গ্রহণের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

থানভী (রাহঃ) তখন দেওবন্দে অধ্যয়নরত ছিলেন। একদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মাওলানা থানভীর পিতাকে পত্রযোগে জানালেন: “তুমি

এই বছরই হজ্জ পালনে এসো। সাথে তোমার বড় ছেলেকে নিয়ে আসতে ভুলিও না”। হাজী সাহেব অবশ্য থানভী সাহেবের পিতাকে জানতেন কিন্তু কোথা হতে তিনি থানভী সাহেবকে চিনতে পারলেন তা একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই জানেন।

এরপর থেকে থানভী সাহেব হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রাহিমাহুল্লা্হ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু আপাতত মক্কা শরীফে যাওয়া সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লা্হ্র দরবারে হাজির হয়ে বাইআত গ্রহণ করতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। কিন্তু ছাত্র-জীবনে বাইআত গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করলেন।

১২৯৯ হিজরী সনে মাওলানা গাঙ্গুহী (রাহঃ) তৃতীয়বারের মতো হজ্জব্রত পালনে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। হযরত থানভী (রাহঃ) তাঁর সঙ্গে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর (রাহঃ) নিকট একখানা পত্র লিখলেন। এতে তিনি লিখেন:

“জনাবওয়ালা! আমি মাওলানা রাহিমাহুল্লা্হ্র হাতে [অর্থাৎ গাঙ্গুহী সাহেবের হাতে] বাইআত হতে আরয করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাইআত করতে অস্বীকার করেন। আপনি দয়া করে তাঁকে বলবেন, তিনি যেন আমাকে বাইআত করেন। - আশরাফ আলী”

এই চিঠি পেয়ে গাঙ্গুহী (রাহঃ) ও হাজী সাহেবের (রাহঃ) মধ্যে কিসব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে এই চিঠির মাধ্যমেই হযরত আশরাফ আলী থানভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষক হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) হয়ে গেলেন। অবশ্য পরের বছরই (১৩০১ হিজরীতে) থানভী সাহেব তাঁর পিতার সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমায় গমন করে স্বীয় পীরের দরবারে হাজির হয়ে বাহ্যিকভাবেও বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর ১৩১০ হিজরী সনে তিনি আবার মক্কায় গমন করেন এবং প্রায় আড়াই মাস পীরের সান্নিধ্যে থেকে ফিরে আসেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই থানভী সাহেব ইলমে তাছাওউফের উচ্চ সোপানে আরোহণ করলেন। পীরের মাধ্যমে কিভাবে ইলমে মা’রিফাতের জ্ঞান হাসিল হতে পারে তার একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকাকালীন একদা হাজী সাহেব তাঁর এই প্রিয় শাগরিদকে (থানভী সাহেবকে) বললেন: “নাতী! (তিনি আদর করে তাঁকে নাতী বলতেন) তুমি আমার খাছ কুতুবখানা (লাইব্রেরী) থেকে যা ইচ্ছে উপহার হিসেবে নিয়ে যাও।” জবাবে থানভী সাহেব বললেন: “জনাবওয়ালা! এসকল কিতাবে আপনি কী রেখেছেন? এগুলোতে রূহানিয়্যাতের মুখোশ মাত্র। এর পরিবর্তে অনুগ্রহ করে আমার সীনায় কিছু দিয়া দিন।” বলাই বাহুল্য উত্তম শাগরিদের উত্তম প্রস্তাবে পীর সাহেব অত্যন্ত আনন্দবোধ করলেন। তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি খুশী হয়ে বললেন: “হ্যাঁ, সত্য বলতে কি? কিতাবে কি-ই বা আছে? সবই তো সীনায়।” এই ঘটনাটি মাওলানা থানভী প্রায়ই স্মরণ করে সাথে সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

“শত কিতাব শত পৃষ্ঠা অগ্নিদাহ করো।
হক্বের নূরে বিভোর নামে তব আত্মা ভরো।” [হায়াতে আশরাফ]

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) কানপুরে ১৪ বছর অধ্যাপনা শেষে ১৩১৫ হিজরী সনে থানা ভবনে ফিরে আসেন। এখানে খানকায়ে ইমদাদিয়ায় তিনি অবস্থান নেন এবং লেখালেখি ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল হোন। তবে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রাহঃ) তাঁকে দেওবন্দে শিক্ষকতার জন্য নিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না। স্বীয় পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লা্হ্র নির্দেশেই তিনি থানা ভবনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেনে গাঙ্গুহী সাহেবও আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

সাহিত্যকর্ম

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) গ্রন্থ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ১ হাজারের-ও অধিক ইসলামী বই-পুস্তকের প্রণেতা। অনেকের মতে উনবিংশ ও বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থকার হিসেবে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। ইসলামের এমন কোন বিষয় নেই যার উপর তিনি বই লিখেন নি। হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, তাছাওউফ, আকায়িদ, তাজভীদ, প্রভৃতি সকল দ্বীনি বিষয়ে তিনি অনেক বই-পুস্তক রচনা করে গেছেন।

হযরত থানভীর বিভিন্ন কিতাব বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, গুজরাটী প্রভৃতি অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনা তাঁর বই-পুস্তক প্রকাশ করে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করছে। এসব বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে স্বত্ত্ব হিসেবে মাওলানা থানভীর পরিবারবর্গ প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু মুসলমান ও ইসলামের প্রকৃত দরদী হযরত থানভী (রাহঃ) তাঁর রচিত সকল বই-পুস্তক ইসলামের কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওয়াক্ফ করে গেছেন। বিক্রয়লব্ধ কোন টাকা তিনি গ্রহণ করেন নি।

লেখালেখির ক্ষেত্রে মাওলানা থানভীর বিশিষ্ট কিছু গুণ ছিলো। যার কারণে তিনি এত বেশী পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হোন।

প্রথমতঃ তাঁর ছিলো ধর্মীয় ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান। কিন্তু সর্বোপরি তিনি আল্লাহ-প্রদত্ব জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া ইলমে তাছাওউফের উপর তিনি তাঁর মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর (রাহঃ) কাছ থেকে গভীর জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন হাজী সাহেবের খলীফা।

দ্বিতীয়তঃ আরবী, ফার্সী, হিন্দি, উর্দুসহ কয়েকটি ভাষায় তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিলো। ভাষার সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে কখনও বেগ পোহাতে হয়নি। তিনি অনর্গল লিখতে পারতেন। লেখাতে বসলে খুব তাড়াতাড়ি অনেককিছু লিখে ফেলতেন।

তৃতীয়তঃ লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ নেশা ছিলো। কোন বই লিখতে শুরু করলে তা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি শান্তিবোধ করতেন না। কোন কোন সময় সারারাত জাগ্রত থেকে তিনি লিখতেন। আল্লাহর অপূর্ব মহিমায় তিনি অত্যন্ত সুস্বাস্থ্য শরীর নিয়ে জীবিত ছিলেন। লেখালেখি করতে যেয়ে কখনও তনি অসুখ-বোধ করতেন না।

চতুর্থতঃ হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) সময়কে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন। কাজের ফাঁকেও তিনি লিখতেন। এছাড়া অল্প কথায় ও সহজে অনেক জটিল বিষয়ও তিনি উপস্থাপন করতে পারতেন।

আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র অসংখ্য সাহিত্য-কর্মের মধ্যে ক'টি গ্রন্থের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। এটা জেনে নেয়া দরকার যে, তাঁর রচিত সব বই-পুস্তকই অত্যন্ত মূল্যবান। পাঠকদের কাছে এগুলো সমাদৃত হয়েছে। এখনও তাঁর অনেক বই-পুস্তক মুদ্রিত হচ্ছে। কোন্‌টি তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান

বই, এ প্রশ্নের জবাবে আমার নিজের অভিমত হচ্ছে তাঁর রচিত কুরআনের তাফসীর ‘বয়ানুল কুরআন’-ই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কিতাব। আধুনিক যুগে এই তাফসীর গ্রন্থের মতো সহজ-সরল ভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যা তেমন বেশী প্রকাশিত হয়নি। যদিও হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লা্হ্‌র অন্যতম খলীফা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রাহঃ) রচিত তাফসীরে মা’আরিফুল কুরআন অনেকের মতে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের তাফসীর। অবশ্য ব্যাখ্যার ব্যাপকতার দিক থেকে মা’আরিফুল কোরআন অনেকটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। যা হোক, নিম্নে থানভী (রাহঃ) -এর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম তুলে ধরা হলো।

তা’লীমুদ্দীন, আ’মালে কুরআনী, হিফজুল ঈমান, ইসলাহ তরজমায়ে দেহলভীয়া, ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা, তা’লিমুত্তালিব, বেহেশতী জেওর, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন (তাফসীরে আশরাফী), ইমদাদুল ফাতওয়াহ, খেতাবুন্নাদওয়াহ, ইসলাহুন্নিসা, মালফুজাত, আদাবুল ইসলাম, কানদে দেওবন্দ, হায়াতুল মুসলিমীন, খুৎবাতুল আহকাম, শাজারাতুল মুরাদ, রূহুত্তারিক, রূহে তাসাওউফ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মাওলানা থানভীর (রাহঃ) অভিমত

হযরত আশরাফ থানভী (রাহঃ) যখন জীবিত ছিলেন তখন বিশ্ব রাজনীতিতে অস্থিরতা ও আমূল পরিবর্তন ঘটছিলো। সে সময়ে ভারতের অনেক উলামায়ে কেরাম সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। কিন্তু হাকিমুল উম্মত থানভী সাহেব অপেক্ষাকৃত নীরব ছিলেন। তাঁকে এই নীরবতার কারণ জানার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই প্রশ্নাবলী ও জবাবসমূহ এখানে ‘হায়াতে আশরাফ’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলো।

১. বৃটিশ সরকারের পক্ষ হতে কি আপনি কোন চৌথা পান?

জবাব: আমি ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে কোন বৃত্তি পাই না।

২. আপনি কি আপনার ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রাহিমাহুল্লা্হ্‌র সঙ্গে কোনরূপ বিরোধিতা করেন?

জবাব: আমার ওস্তাদ সম্পর্কে আমার বা আমার কোন মুতায়াল্লিকীনের কোনরূপ বিরোধ বা শত্রুতা নেই। তবে কোন কোন মাসআলায় ওস্তাদ-

শাগরিদের মতানৈক্য হওয়ার নজির ইসলামী ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন: ইমাম আবু হানীফার (রাহঃ) সঙ্গে তাঁর শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের (রাহঃ) বহু মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে।

৩. আপনি কি খিলাফত আন্দোলনের বিরোধী?

জবাব: খোদা না করুক, আমি খিলাফতের বিরোধী নয়। কেননা এটা একটি ইজমায়ী মাসআলা।

৪. আপনি কি ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস বা দুর্বল হওয়ায় খুশী হোন?

জবাব: আমি ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস বা দুর্বলে কখনও আনন্দিত নয়। যদি আমার হৃদয়ে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার পতনের কল্পনাও আসে, তাহলে আমার শিরা-উপশিরায় এর ব্যথায় দুঃখের অনল বয়ে যায়।

মাওলানা থানভী (রাহঃ) খিলাফত আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কিংবা কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করার কিছু কারণও দেখিয়েছেন।

পরলোকগমণ

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) ১৩৬২ হিজরী সনের ১৬ই রজব মুতাবিক ১৯৪৩ সনের ১৯শে জুলাই সোমবার ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁকে থানা ভবনেই দাফন করা হয়।

তখনকার দিনের প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়। অনেকে শোকবার্তা পাঠান। বিজনৌরের মদীনা নামক একটি পত্রিকার ১লা আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত এক বাণীতে লেখা হয়ঃ "হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী রাহিমাহুল্লাহ্‌র হৃদয়-বিদারক মৃত্যু যদিও দুনিয়ার প্রথানুসারে স্বাভাবিক কিন্তু চক্ষু কখনও তা শোকায়িত করতে পারবে না। একজন কামিল লোক সৃষ্টি হতে শত বছর কেন শত শত বছরের বেশী সময়ের দরকার। তাঁর মৃত্যুতে যতোই বুক-ফাটা শোক করি না কেন, তা খুবই কম হবে। খোদার অপার রাহমাতে তাঁর বয়স আশি হতে নব্বুইয়ের মধ্যে ছিলো। এটা আজকালের তুলনায় কম নয়। তবুও যেন খুব কম। ... ... তিনি ছিলেন ছান্দসিক কবি,

প্রতিভাবান, সাহিত্যিক, অতুলনীয় ফকীহ্, সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্সীর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথক, উচ্চমানের মুহাদ্দীস আবার তাছাওউফ তরীকতের স্বনামধন্য ইমাম। মোটকথা, তিনি ছিলেন আলো মীনারা। সবচাইতে তাঁর বড় গুণ ছিলো শক্রর প্রতিশোধ না লওয়া। ... ... তাঁর মহৎ ও পবিত্র জীবন ছিলো একটি মেশিন স্বরূপ। তিনি সারাজীবন আইনের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-নিদ্রায়; উঠা-বসায় তাঁর নির্দিষ্ট সময় ছিলো।" [আশরাফুস সাওয়ানেহ]

মাওলানা থানভীর (রাহঃ) অনুপম চরিত্র মাধুর্য

হাদীস শরীফে আছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও"। হাদীসের এই মহাবাণীর ভিত্তিতেই মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রাহঃ) চরিত্র গড়ে উঠেছিল।

তিনি ছিলেন ন্যায়বান, উদারচিত্ত, সুহৃদয় ও প্রতিশ্রুতিতে অটল। গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর মন সর্বদাই ক্রন্দন করতো। এজন্যে গরীবদের নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাঁর চলা-ফেরা, কথা-বার্তা এমন পছন্দনীয় ছিলো যে, মানুষ তাঁকে সহজেই ভালবাসতো এবং প্রিয়জন মনে করতো।

মাওলানা থানভী (রাহঃ) ছিলেন মুসলমানদের আদর্শ-পুরুষ। তিনি ধৈর্যাবলম্বন, ঔদার্যতা, দয়া, দানশীলতা, বিনয়, নম্র-ভদ্রতা, আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন, "যদি কেউ আমার সাথে কথা বলতে চায় আর আমি মুখ অন্যদিকে ফিরাই, তাহলে ঐ ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে" [কামালাতে আশরাফিয়া]।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রাহঃ) চারিত্রিক মাধুর্য একটি ঘটনা থেকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনাটি এই:

একদা তিনি জৌনপুরে ওয়াজ করতে গেলেন। কোন এক ব্যক্তি পত্রযোগে তাঁকে চারটি অশ্লীল বাক্য লিখলো- (ক) তুমি জোলা (তাঁতি), (খ) তুমি মূর্খ, (গ) তুমি কাফির এবং (ঘ) বুঝে-শুনে কথা বলো!

থানভী (রাহঃ) এসব আপত্তিকর কথাগুলো পাঠ করে মোটেই রাগান্বিত হলেন না। বরং ধীরে-স্থিরে প্রতিটি কথার জবাব লিখলেন এভাবে:

(ক) আমি যদি জোলাও হয়ে থাকি, তাহলে তো কোন ক্ষতি নেই। কেননা আমি তো এখানে কোন বিবাহ বা অন্য কোন আত্মীয়তা করতে আসি নি। শুধু আল্লাহ পাকের বাণী শোনাতে এসেছি। এতে বংশ বা কৌলীন্যের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ এটা আল্লাহ তা'আলার হাতে। এতে মানুষের কোন হাত নেই।

(খ) হ্যাঁ, আমি আমার মূর্খতা স্বীকার করি। শুধু তাই নয়, আমি একজন বড় মূর্খ! কিন্তু যাকিছু আমি আমার বুজুর্গানে দ্বীনের কাছে শুনেছি এবং যা কিতাবে দেখেছি তা বর্ণনা করি। যদি কোন কথায় ভুল হয়, তবে এর উপর আমল করবেন না।

(গ) কাফির হওয়া সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চাই না। আপনার সামনে এখনই আমি কালেমা শাহাদাত আবার পড়ে নিচ্ছি: আশহাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খোদা না করুন যদি আমি এর আগে কাফির হয়ে থাকি, তাহলে এখন মুসলমান হলাম।

(ঘ) সাবধানতার সাথেই আমি সর্বদা ওয়াজ করতে চেষ্টা করি। তবে দ্বীন-ইসলাম সম্বন্ধে আমি কোন লোকের খাতিরে আমার কর্তব্য হতে বিচ্যুত হই না। এরূপ করলে খেয়ানত করা হবে। [হায়াতে আশরাফ]

হযরত আশরাফ আলী থানভীর (রাহঃ) জীবনে এরূপ আরও আদর্শ কিছু ঘটনাবলীর প্রমাণ আছে। তাঁর চরিত্র মাধুর্য যে কতো উচ্চ পর্যায়ের ছিলো তা এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই সহজে অনুধাবন করা যায়। বাস্তবে এরূপ উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হলে কি সত্যিকার অর্থে মর্যাদার উচ্চাসনে আরোহণ সম্ভব? আর তিনি যে মর্যাদার উচ্চাসনে আরোহণ করেছিলেন সে-ব্যাপারে ভিন্নমত কেউ কোনদিন পোষণ করেনি। তাঁর সুন্দর কলুষমুক্ত জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমরা যতো বেশী জানবো ততো বেশীই আমাদের উপকার হবে।

সিলেট, ১৯ নভেম্বর ২০০৫।

একবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ও আল-কুরআন

(১)

আউ'যুবিল্লাহ হিমিনাশ শ্বাইতানির রাজীম।
বিছমিল্লাহ হিররাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন, আচ্ছালা-তু ওয়াচ্ছালামু আলা ছাইয়্যিদিনাল আম্বিয়া-য়ে ওয়াল মুরছালীনা ওয়া আলা-আলিহী ওয়া আসহাবিহী-আজমাঈন।

অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান দাতা ও দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নাম স্মরণ করে শুরু করছি।

যাবতীয় প্রশংসা শুধুমাত্র ঐ এক সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট, সমস্ত সৃষ্টি যাঁর উপাসনায় রত আছে। তিনি তাঁর অস্তিত্বে সকল প্রকার বন্ধন থেকে চিরমুক্ত। অনেক বিরাট মরতবার অধিকারী তিনি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যেই হচ্ছে সকল প্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহ, যিনি হচ্ছেন জগতসমূহ সৃষ্টির কারণ। এ পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধি। যাঁর জ্ঞানের উৎস অসীম জ্ঞানের অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ পাক পরওয়ার দিগারে আলম। আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীবের উপর, তাঁর বংশধর ও ত্যাগী সম্মানিত সাথীদের উপর রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। ইয়া আল্লাহ! এ গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির জন্য আমায় তাওফিক ও জ্ঞান দান করুন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিরসত্য মহান ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করার সাহস করাও এ নগণ্য আল্লাহর বান্দাহর জ্ঞানের অতীত। তথাপি জ্ঞান আহরণের পিপাসা নিয়ে সুদীর্ঘ কাল অনুসন্ধিৎসায় কাটিয়ে যেটুকু জানতে পেরেছি তা এ লেখার মাধ্যমে আপনাদের সকাশে তুলে ধরছি। সাধারণ মানুষ হিসেবে ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। যদি কারো চোখে এ লেখার মধ্যে কোন ভুল ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন। সর্বোপরি এর জন্য আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখার জন্যে সবার প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় পাঠক! অসীম জ্ঞানের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র রমযান মাসের শবে ক্বদর

রাতে এক শুভ লগ্নে সারা বিশ্বের আশীর্বাদ, নবী-কুল শিরোমণি দুজাহানের বাদশা আমাদের পেয়ারে নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, সম্মানিত ফিরিশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক প্রেরণ করেন। জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহাগ্রন্থের প্রথমে নাজিলকৃত ৫টি বাক্য হচ্ছে, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক্ব। খলাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব। ইক্বরা ওয়ারাব্বুকাল আক্রামুল্লাজি আল্লামা বিল ক্বালাম। আল্লামাল ইনসানা মা-লাম ইয়ালাম। (সূরা আলাক্ব ঃ ১-৫) অর্থাৎ, পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেনে মানুষকে রক্তবিন্দু হতে। পড়, তোমার প্রতিপালক মহামহিম, যিনি শিখিয়েছেন কলমের দ্বারা, শিখিয়েছেন মানবকে যাতে সে ছিল অজ্ঞ। মহান আল্লাহ পাকের এ প্রথম প্রেরিত ৫টি বাক্যেই সৃষ্টির মূল রহস্য লুকিয়ে আছে।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! লেখার নামকরণের দিকে একবার লক্ষ করুন। খৃস্টীয় একবিংশ শতাব্দিতে আমরা পদার্পণ করেছি। এ শতাব্দি হবে বিংশ শতাব্দির চেয়েও বেশী বিজ্ঞানের যুগ। একই সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর মানুষ অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলবে। এর প্রমাণ- গেল সেই বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে এসে পাওয়া গেছে। বিশ্বের ক'টি বড় ধর্মের মধ্যে একটি হচ্ছে খ্রিস্টবাদ। পৃথিবীর সর্বত্র এ ধর্মাবলম্বী লোকজন ছিটিয়ে-ছড়িয়ে আছেন। কিন্তু এদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে তাদের ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ ইদানিং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। মুখে ওরা খ্রিস্টান বললেও, বড়দিনে (ক্রিসমাসে) নাচ-গান-মদ নিয়ে বিভোর থাকলেও, অন্তরে কিন্তু সন্দেহের বীজ সর্বদাই বিদ্যমান বলে দেখা যায়। এর দু'টি বিশেষ কারণ আমি খুঁজে পাই ঃ- (১) খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে মানুষের রচনার সংযোজন ও (২) বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি। বিজ্ঞান যা বলছে, তারা তাদের পূর্বসুরীদের দ্বারা মানব রচিত উপাদান-সমূহ ও ঐশী জ্ঞানের মিশ্রণে রচিত, বর্তমান বাইবেলে খুঁজে পাচ্ছে না বা তা বাইবেলের বিপরীত বলে দেখা যাচ্ছে। এসব কথা আমার নয়, স্বয়ং খ্রিস্টান চিন্তাবিদরা এগুলো প্রমাণ করছেন।

এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি যে, একবিংশ শতাব্দিতে মানুষ আরও বহুগুণ বেশী বিজ্ঞানমনা হয়ে ওঠবে। যে কোন মতবাদ, ধার্মিক বিশ্বাস

প্রভৃতি একমাত্র বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই-বিবেচনা হবে। আর যেহেতু আগেই বলেছি বহু ধর্মাবলম্বীর লোকজন আজই তাদের নিজ ধর্মের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠছে, কাজেই এ শতাব্দির মধ্যেই এসব ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। নাস্তিকতাবাদ হবে তখন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু এ নাস্তিকতা বেশীদিন স্থায়ী হতে পারবে না। কারণ, সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিকেরও আছে অন্তঃকরণ, আছে আত্মা, আছে হৃদয়। আধ্যাত্মিকতার অভাবে আত্মার খোরাকের অন্বেষায় শেষ পর্যন্ত একটি কলুষমুক্ত ধর্মবিশ্বাসের জন্য মানুষ বেহুঁশ হয়ে খুঁজে বেড়াবে। তখন একমাত্র ইসলামই হবে তাদের সহায় সম্বল। কারণ, একমাত্র ইসলামই বিজ্ঞানসম্মত একটি সত্য ধর্ম হিসেবে তাদের সম্মুখে বাস্তব প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হবার যোগ্যতা রাখে। প্রিয় পাঠকমণ্ডলী! এ কথাটি বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোকে এ লেখার মাধ্যমে আমি প্রমাণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

(২)

পশ্চিমা মনন আজকাল বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে মহা গোলক-ধাঁধাঁয় পড়ে ঘোরপাক খাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের সম্মুখে স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইসলামের প্রতি ঝোঁকে পড়তে নারাজ, কারণ এটা তাদের কাছে কেমন যেন খটকা লাগে যে, সুদীর্ঘ ১৪০০ সাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম এরূপ নির্ভুল? তা বিশ্বাস কারা যায় না। অন্তঃকরণ মানতে রাজী হয় না। একজন নিরক্ষর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে নাযিল এমন একটা গ্রন্থ কিভাবে হলো, যার মধ্যে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথেও সামঞ্জস্য বিদ্যমান? বিজ্ঞানী হলে ঐশী বাণী ও ঐশী কথার ব্যাপারে সন্দিহান রাখতেই হয়!(?) তাছাড়া ইসলামকে এভাবে মেনে নিলে যে, পশ্চিমা সাধের সভ্যতার উপর কুঠারাঘাত পড়ে যাবে!

আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে, আজ পৃথিবীর বেশীরভাগ বিজ্ঞানীরা অমুসলিম। আগেকার দিনের মত যদি মুসলমানদের মধ্যে বেশী বিজ্ঞানী থাকতেন- যদি আল-খোওয়ারিজমী, আল-রাজি, ইবনে সিনা, উমর খৈয়াম, প্রফেসর সালাম, ড. কুদরতই খোদা, ড. ওয়াজেদ মিয়া বেশী বেশী থাকতেন তবে, বহুদিন পূর্বেই পশ্চিমা নাস্তিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত

সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে ইসলামের নূরে সমগ্র পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। একজন মুসলিম বিজ্ঞানী বাস্তবে আরও বেশী ঈমানদার হওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীর সম্মুখে বিশ্বের অজানা অনেককিছু উন্মোচিত হয়। সৃষ্টি রহস্যের লীলা দেখে তাঁর মনে ভাবের উদ্রেক ফুটে ওঠে। আর সে ভাবগম্ভীর মুহূর্তে যদি তিনি মু'মিন হয়ে থাকেন, এমনিতেই তাঁর মস্তক অবনত হয়ে স্রষ্টার পদতলে সিজদাবনত হয়ে পড়ে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য সহকারে। তাঁর হৃদয়পূরীতে শুরু হয় প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণের অপূর্ব স্পৃহা। আল্লাহর পবিত্র গুণাবলীতে যে, এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে তা এ বিজ্ঞজনের নিকট স্বচ্ছ পানির মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তখন মনে পড়ে কুরআনে পাকের পবিত্র আয়াতসমূহ ঃ- "তাবারাকাল্লাজী জাআ'লা ফিচ্ছামা-ই বুরুজাও, ওয়া জাআ'লা ফি-হা সিরাজাওয়্যা ক্বামারাম মুনিরাহ। ওয়াহুয়াল্লাজি জাআ'লাল্লাইলা ওয়ান্নাহারা খিল ফাতাল্লিমান আরাদা আইয়্যাজ্জাক্কারা আও আরাদা শুকুরা।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬১-৬৪) অর্থাৎ, মহান তিনি, (যিনি) আকাশে তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এবং তাতে প্রদীপ্ত সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র স্থাপন করেছেন। যারা গ্রহণ করতে চায় অভিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা তাদের জন্য দিন ও রাতকে পরস্পর পশ্চাদগামী (করে) সৃজন করেছেন। রাহমানের (আল্লাহর) দাস তারা, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে ও শুকরিয়া আদায় করে (আল্লাহর)।

প্রিয় পাঠক! অনুগ্রহ করে একবার আপনার চোখ দু'টি বন্ধ করুন। এবার আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখুন। এ সুবিশাল জগতটি কি সুন্দর, কি নিপুণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরকে এ সম্পর্কে বিজ্ঞান বলছে যে, কোনো এক সময়ে জগত বলতে কিছুই ছিলো না, তারপর কোনো এক অজানা কারণবশত একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে জগত সৃষ্টি হয়। একই সাথে স্বভাবের মৌলিক কিছু পদার্থের শক্তি (আইন) সৃষ্টি হয় (কেন হয়?)। এ আইনের ফল স্বরূপ আজকের জগতকে যেভাবে আমরা দেখছি সেভাবে আছে। সৃষ্টি মুহূর্তের পর থেকে কয়েকটি ভিন্ন ধাপে এ জগতটা বিস্তৃত হয়ে আজকের বিশাল আয়তন ধারণ করেছে এবং প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হয়ে চলছে। একদা এ বিস্তৃতির অবসান হয়ে আবার জগতের মধ্য-বিন্দুর দিকে [যেখান থেকে বিস্ফোরণ প্রথমে ঘটেছিলো]

বিশ্বটা ছুটে গিয়ে আরেক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য এ ঘটনা খুব শীঘ্র হবার নয়, বিজ্ঞানের মতে আরও ৫ বিলিয়ন (৫ হাজার মিলিয়ন) বছর বাকী আছে! সুতরাং চিন্তার কিছু নেই (?) [এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে আজকের বিজ্ঞানের জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিগ বেং থিওরী]। এখানে দু'টি ব্যাপারে গভীর চিন্তা করে দেখুন:

১. বিজ্ঞান বলতে পারছে না সৃষ্টির সুত্রপাত ঘটলো কেন? অর্থাৎ বিস্ফোরণের কারণ কি? কোন মহাশক্তি এর পেছনে ছিলো যার কারণে শূন্য থেকে এতো বড় এক বিশাল জগতের জন্ম হয়ে গেল?

২. সৃষ্টির মুহূর্তে যে চারটি মৌলিক শক্তি (মাধ্যাকর্ষণ, শক্তিশালী আনবিক শক্তি, দূর্বল আনবিক শক্তি ও ইলেট্রো-মেগন্যাটিক [বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয়] শক্তি) তাদের নিজ আইন-কানুন নিয়ে আবির্ভূত হলো জগতকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও বিবর্তন ঘটাতে, এগুলো কোত্থেকে এলো? এগুলো এভাবে না হয়ে অন্যভাবে কেন হলো না? বিজ্ঞান এর জবাব দিতে পারছে না।

এ দু'টি প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান কখনো দিতে পারবে না। কারণ, বিজ্ঞানের কাজ শুধু আল্লাহ প্রদত্ব বস্তুজগত ও এর শক্তিসমূহ নিয়ে গবেষণা করা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব শক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার করার পদ্ধতি উদ্ঘাটন করা। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। সময়ের শুরু (অর্থাৎ জগতসৃষ্টির মুহূর্ত) থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থান করে আছে বিজ্ঞান। তবে স্বভাবের অতীত ইতিহাস ও শক্তিসমূহের আইন-কানুন ও এর আপাতদৃষ্টিতে শাশ্বত কিছু প্রকৃতিগত আচরণ লক্ষ করে ভবিষ্যতের উপর প্রায় সঠিক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞান করতে সক্ষম। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৌরজগতের মধ্যে অবস্থিত যে কোন গ্রহের কথা বলা যায়; আজ থেকে ১০ বছর পরে যে কোন এক মুহূর্তে মঙ্গল গ্রহ মহাকাশে ঠিক কোথায় অবস্থান করবে তা বিজ্ঞান বলে দিতে পারবে। এ হিসেব বের করতে একটা অল্প মূল্যের কালক্যুলেটার আর দু'একটা অংকের ফরমুলাই যথেষ্ট। তবে এ ভবিষ্যদ্বাণী দিতেও কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট চারটি শক্তির একটিকে (এ ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ) কাজে লাগাতে হয়। মহাকর্ষের কবলে পড়ে গ্রহ-উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট গতিবিধির মাধ্যমে মহাকাশে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে

চলছে। মানুষ বিজ্ঞানের মাধ্যমে এ গতিবিধি আবিষ্কার করেছে। বস্তুত এ তথ্য না জানলে মহাকাশ ভ্রমণ সম্ভব হতো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ "অহুঅল্লাজী খালাক্বাল্লাইলা অন্নাহারা অশ্বামছা অলক্বামারা; কুল্লুন ফী ফালাকি ইয়াছবাহুন।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৩) অর্থাৎ, এবং তিনিই রাত দিন [পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন], চন্দ্র-সূর্যকে পয়দা করেছেন; সবকিছু [বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে] আপন আপন কক্ষপথে ভেসে বেড়ায়। এখানে আল্লাহপাক গ্রহ-উপগ্রহ ও জগতের সবকিছুই যে, মহাকর্ষের কবলে পড়ে চলমান আছে তা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন।

জগতের সবকিছু যে গতিশীল, এ তথ্য বিজ্ঞান গেল শতাব্দিতে এসে আবিষ্কার করেছে। অবশ্য ইতোপূর্বে কেউ বলতেন সূর্য ঘুরে পৃথিবী স্থির, আবার কেউ বলতেন পৃথিবী ঘুরে সূর্য স্থির প্রভৃতি। বাস্তবে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জগত সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকেই সবকিছু মহাকর্ষের কবলে পড়ে নির্দিষ্ট পথে ঘূর্ণমান অবস্থায় চলে যারতার অস্তিত্ব বজায় রাখছে। এ সত্য মহাকাশের তারা, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সকল বড় বস্তুর বেলাই শুধু সত্য নয়, প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রেও তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি সুন্দরভাবে এবং অল্প ক'টি কথায় এ সত্য তথ্যটি ব্যক্ত করেছেন- "কুল্লুন ফী ফালাকি ইয়াছবাহুন"। এ কথাটা জানতে মানুষের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা কেটে গেল, কোপারনিকাস, গ্যালিলীয়, নিউটন ও আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী দিনরাত গবেষণা করলেন। অথচ অসীম জ্ঞানের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দেড় হাজার বছর পূর্বে তা মানুষকে অবগত করেছে। শুধু কি তাই, কুরআনে পাকের প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞানসম্মত বলে আজ প্রমাণিত হচ্ছে।

আমাদেরকে ভাল করে চিন্তা করা দরকার। একবিংশ শতাব্দির চরম বিজ্ঞানের যুগ যেন আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিতে না পারে। অমুসলিম বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে সবার মনে সন্দেহের বীজ বপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এর কারণ হলো, তাদের হাতিয়ার আর কিছুই বাকী থাকে নি, যদ্বারা ইসলামের উপর আঘাত হানা যায়। আমরা যদি বিজ্ঞান কিসব বিষয় আবিষ্কার করছে তা ভাল করে জানতে না পারি, এবং একই সাথে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি বলছে তা

গবেষণা না করি, তবে এ ফাঁদে আটকা পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। বিজ্ঞান যে প্রভুর ঐশী বাণীর সম্মুখে বাস্তবে কোন চ্যালেঞ্জ নয় তা আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে জ্ঞানের আলোকে। বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনকে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে নতুন এক অপূর্ব জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত বিজ্ঞান যাকিছু সত্য (বিজ্ঞান কিছু অসত্যও আবিষ্কার করে থাকে!) উদ্ঘাটন করেছে ও করবে তা সবই কুরআন শরীফে আছে। আল্লাহর এ অসীম জ্ঞানের মহাগ্রন্থ থেকে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করে যাবে, একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি। মানব জ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সাথে পবিত্র কালামকেও বেশী করে বুঝার ক্ষমতা বাড়বে। আর যেহেতু আল্লাহর জ্ঞান অসীম তাই কুরআনের জ্ঞানও অসীম। সুতরাং, এ জ্ঞানের শেষ কখনো হবে না। অন্যদিকে মানুষের জ্ঞানের সূর্য এইমাত্র পূর্বাকাশে উদিত হয়েছে। বিজ্ঞানের আরোও অনেক অনেককিছু আবিষ্কার করার বাকী রয়ে গেছে। কুরআনের মধ্যে যে অসীম জ্ঞান লুকিয়ে আছে সে ইঙ্গিত আমাদের পিয়ারে নবীজী রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন; "আমাকে আল্লাহপাক এমন একটি কিতাব (আল-কুরআন) দান করেছেন যার মধ্যে অল্প কথা কিন্তু অর্থ ব্যাপক।" (আল-হাদীস)

(৩)

এ মুহূর্তে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত না করে পারছি না। একদা আমি নিয়্যাত করে কুরআন পাক নিয়ে আদবের সাথে বসলাম এ উদ্দেশ্যে যে, শুরু থেকে যাকিছু সম্ভব আয়াতমালা পড়ে এদের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করবো। কিন্তু মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআন পাকের প্রথম সূরার প্রথম আয়াত পড়েই আমি আর অগ্রসর হতে পারি নি! কারণ, যখন আল-ফাতিহায় আয়াত; "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন", পড়ে এটার অর্থের দিকে খেয়াল করলাম তখন আমি যেন এক অসীম সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এ ক'টি মাত্র পবিত্র কালামের অর্থ এতো ব্যাপক! যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি যাবতীয় জগতসমূহের প্রতিপালক। প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহপাক,

কারণ তিনিই দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সকল জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনাকারী, পালনকর্তা। আমার দেহ-মন-আত্মাসহ আলমে খালক [সৃষ্ট জগত], আলমে আরওয়াহ [রূহানী জগত], আলমে মালাকুত [ফিরিশতাদের জগত], আরশ-কুরসি-লাওহ-কলম, বেহেশত, দোযখ প্রভৃতি সবকিছুরই পালনকর্তা যিনি, তিনিই আল্লাহ পাক পরওয়ার দিগারে আলম। পালনকর্তা বলতে শুধু খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা বুঝাচ্ছে না, অণু পরমাণু থেকে যাবতীয় কিছুকে শক্তি ও আইনের আওতাভুক্ত করে অস্তিত্বশীল রাখছেন, আল্লাহপাক এ ব্যাপক অর্থে কথাটা বলছেন। বিজ্ঞানের আলোকে যখন আরো চিন্তা করলাম তখন দেখতে পেলাম যে, এ আয়াতটির মধ্যেই যাবতীয় রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন অসীম জ্ঞানের অধিকারী রাব্বুল আলামীন। বিজ্ঞান আজ যা কিছুই আবিষ্কার করছে তার পেছনে যে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি কাজ করছে তা ক্ষণকালের জন্য আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠলো। আল্লাহ যে বলেছেন আমার অজান্তে একটি বস্তুও নড়াচড়া করে না, তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় এ পবিত্র আয়াত দ্বারা।

এ পবিত্র আয়াতটি সেদিন অনেক্ষণ পড়েছি। কিন্তু এর পূর্ণ অর্থ আমার মতো এ নগণ্য গেণাহগারের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয় তা আমি জানি। সারা জীবন চেষ্টা করলেও পরবো না। আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা ঠিক এরূপই ব্যাপক।

অনেকেই বলবেন যে, কুরআন পাকের প্রথম সূরা আল-ফাতিহায় বিজ্ঞানের তেমন কিছু উল্লেখ হয়নি। কিন্তু আমার নিকট এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আসলে এ পবিত্র সূরায় বিজ্ঞানের যাবতীয় কথাই মহাজ্ঞানী আল্লাহপাক বলে দিয়েছেন। এখানে প্রথমতঃ সৃষ্ট জগতের প্রতিপালক বলে স্বভাবের সবকিছুর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ক যে তাঁরই গুপ্ত শক্তি তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আর বিজ্ঞান যা কিছু করছে তা এ বস্তু জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বভাবের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যাবতীয় কিছুই তাঁর দান এবং সর্বোপরি এগুলো আল্লাহর পালনকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

স্বভাবের মধ্যে কিছু মৌলিক শক্তি আছে যা সম্পর্কে ইতোমধ্যে বলেছি। এদের একটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ বলা হয়। এবার একটু ভাবুন। এ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি মানুষের তৈরী নয়, এমনকি এটা স্বভাবেরও সৃষ্ট নয়।

জগত সৃষ্টির সাথে সাথে এমনিতেই (?) এ শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এটা না থাকলে জগত ঠিকে থাকতো না এবং এখনো ঠিকে থাকতে পারবে না। এ কথাটি আমার নয়, বিজ্ঞানই এ তথ্য দিচ্ছে। এ মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ বিলুপ্ত হয়ে গেলে আমাদের এ পৃথিবীটা সূর্যের উপর পড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এবার কুরআন পাকের প্রথম আয়াতের দিকে খেয়াল করুন। আল্লাহ এখানে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আমিই জগতসমূহের পালনকর্তা (গুপ্ত, সুপ্ত যাবতীয় শক্তিকে নির্দিষ্ট আইনের আওতায় রেখেছি ও পরিচালনা করছি), কেন করছেন? দ্বিতীয় আয়াতে জবাব দিচ্ছেন, কারণ, আমি (মানুষসহ জগতের প্রতি) পরম দাতা ও দয়ালু।

আশাকরি বিষয়টি সবার নিকট এবার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে। আল্লাহপাক এ দু'টি পবিত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, হে মানুষ! তোমরা আমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ, অথচ তোমরা একটুও চিন্তা করো না যে, এ জগত পরিচালনা করার জন্য আমার সৃষ্ট মৌলিক শক্তিগুলোকে যদি এ মুহূর্তে আমি উঠিয়ে নিই তবে সাথে সাথেই জগত ধ্বংস হয়ে যাবে (যা এমনিতেই সৃষ্ট হতে পারে তা আবার এমনিতেই বিলুপ্ত হবার যথেষ্ট যুক্তিও আছে)। কিন্তু আমি যে জগত সৃষ্টি করে তোমাদেরকে এর উপর প্রতিষ্ঠিত করে ভালোবেসে ফেলেছি (যিনি পরম দাতা ও দয়ালু) তাই তোমাদের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি তা করছি না (শক্তি উঠিয়ে নিচ্ছি না)।

ফাতিহার এ পবিত্র দু'টি আয়াতের ব্যাপক অর্থ কি এসব কথা নয়? বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এরূপ অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মহান মেহেরবান এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি ইচ্ছা করেন তবে এ মুহূর্তে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারবেন। বিজ্ঞান আজ আবিষ্কার করেছে যে, স্বভাবের (নেচার‍্যাল) মূলে চারটি শক্তি কাজ করছে। এ নেচার‍্যাল শক্তিগুলোর ফলে যাবতীয় ফিজিক্যাল (পদার্থ, বিবর্তন, গতি প্রভৃতি) ক্রিয়া হচ্ছে জগত জুড়ে। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা পরিষ্কার হবে।

স্বভাবের চার শক্তির মধ্যে একটি অন্যতম শক্তি হচ্ছে, শক্তিশালী আনবিক শক্তি। ইংরেজীতে এটাকে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বলে। জগতের প্রতিটি জলন্ত তারা এ শক্তির ফলে উজ্জ্বল আলো ও উত্তাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে

দিচ্ছে। আমাদের নিকঠতম তারাটি হলো সূর্য। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, সূর্যের ভেতর এ শক্তিশালী আনবিক শক্তি কাজ করছে। অতি উচ্চ তাপমাত্রা থাকার ফলে সূর্যের মধ্যকার পদার্থ হাইড্রোজেন (যার মাত্রা হচ্ছে ৯৯%) নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে বদলে হিলিয়ামে (অন্য পদার্থে) রূপান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে আলো এবং তাপ বিকিরণ হচ্ছে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবে সূর্য হলো একটা বিরাট নেচার‍্যাল হাইড্রোজেন বোমা। সূর্যের এ প্রতিক্রিয়ার পেছনে কিন্তু শক্তিশালী আনবিক শক্তি কাজ করছে। এখন পাঠকবর্গ একটু ভেবে দেখুন। সূর্যটা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। সৌরজগত ঠিকে আছে ও যেভাবে চলছে ঠিক সেভাবে চলছে এই সূর্যের কারণে। এ সূর্য মানুষসহ পৃথিবীতে বৃক্ষ-তরু-লতা ও জীব-জন্তু বেঁচে থাকার জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, সূর্যের আলো এবং তাপ ছাড়া সমস্ত পৃথিবীটা ভীষণ ঠাণ্ডা ও চির-অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো। এর ফলে এ গ্রহে কোন প্রাণী কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারতো না। আল্লাহ পাক পরওয়ার দিগারে আলম এ কথাটি একটি পবিত্র আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ "আলহামদুলিল্লা হিল্লাজী খালাক্বাচ্ছামাওয়াতি অল আরদ্বা অজ্বাআলাজ জুলুমাতি অন্নুর"। (সূরা আনআম ঃ ১ [অংশ]) অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এখানে প্রভু দয়াময় পরিষ্কার করে বলছেন, প্রশংসা তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কার করবে? আমিই যে, মহাকাশের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছি থাকার উপযোগী এ পৃথিবী। আর এ পৃথিবীকে আলো দান করেছি (যা তোমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য) কাছেই একটি উজ্জ্বল উত্তপ্ত তারা, সূর্য দিয়ে। একই সাথে সৃষ্টি করেছি অন্ধকার, অপূর্ব একটি কৌশলে। প্রিয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন, আমাদের এ পৃথিবীটা যদি সদা সর্বদা সূর্যের উত্তপ্ত অংশুজালে নিমজ্জিত থাকতো তবে আমাদের কী দুর্দশাই না হতো। কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীটা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে যেত। পরম দয়ালু আল্লাহ এ দুরবস্থা থেকে আমাদেরকে কোন কৌশলে রক্ষা করেছেন তা বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে দিচ্ছে।

সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীসহ সৌরজগতের সবকিছু যারতার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে এক বছর সময় লাগে। কিন্তু এভাবে ঘুরার ফলেই দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে না। পৃথিবী তার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে (স্পিন করে)। আর যেহেতু পৃথিবীটা গোলকাকার তাই এ ২৪ ঘণ্টার ঘূর্ণনে তার এক অর্ধাংশ থাকে অন্ধকারে আর অপর অর্ধাংশ থাকে আলোর মধ্যে। অর্থাৎ, দিবালোক বা সূর্যালোক বলের (গোলক) মত পৃথিবীটাকে চক্কর দিচ্ছে, এবং একই সাথে অপরদিকে রাত্রিকালও চক্কর দিচ্ছে। এ কৌশলে আল্লাহপাক চির-আলোকিত সূর্যের অতি নিকটে আমাদেরকে রেখে অন্ধকার ও আলো দানের ব্যবস্থা করছেন, এবং দু'টাই আমাদের জন্য অপরিহার্য। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর এ অপার মহিমার শুকরিয়া আদায় করে কি শেষ করা যাবে?

ব্যাপারটা আরোও তলিয়ে দেখা যাক। এ সৌরজগতেও কোন কোন গ্রহ আছে যাদের উপরিভাগের তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রি থেকে মায়নাস ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। এসব গ্রহে কোন প্রাণী বেঁচে থাকার উপায় নেই। আমাদের এ পৃথিবীটাকে মহাকাশে এমন একটি স্থানে রাখা হয়েছে, যা প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য বেশ উপযোগী। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, এটার বাৎসরিক ও দৈনিক গতি, এক্সিস অব রটেশন বা মধ্যশলাকার ঘূর্ণনের তারতম্য- যার ফলে মৌসুম বা সিজনের উৎপত্তি, এটার মধ্যে জড়-পদার্থের মাত্রা-, যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও আবহাওয়া প্রক্রিয়ার জন্য একটি বায়ুমণ্ডলের জন্য যথেষ্ট, প্রভৃতি সবকিছুর ব্যবস্থা আল্লাহপাক যথার্থভাবে করেছেন। অবশ্য সন্দেহবাদীরা ও অবিশ্বাসীরা বলে থাকে, এ সব কিছুই স্বভাবের এ্যাকসিডেন্টাল কোইনসিডেন্ট বা দৈবক্রমের ফলাফল। হায়রে অন্তরাত্মায় তালা লটকানো জ্ঞানীরা! এদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহপাক ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "খাতামাল্লাহু আ'লা কুলুবিহিম ওয়াআ'লা ছামইহিম; ওয়াআ'লা আবছা-রিহীম গ্বিশা-অঁতুউ অলাহুম আজাবুন আজীম।" (সূরা বাক্বারা ঃ ৭) অর্থাৎ, আল্লাহ ওদের হৃদয়ে ও কর্ণে (তাদের অজ্ঞতা ও বিরোধিতা হেতু) তালাবদ্ধ মোহর মেরে দিয়েছেন- এবং ওদের চক্ষুপরি পর্দা রয়েছে, ওদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি।

বাস্তবে আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা অনুধাবন করার পুরো ক্ষমতা কোন বিজ্ঞানীর নেই। তাঁর দয়া ও করুণার বিস্তৃতি এতোই বেশী যে, কোন লেখক সারা জনম তা লিখেও শেষ করতে সক্ষম হবে না। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "কুল্লাউ কা-নাল বাহরু মিদা-দাল্লি কালিমা-তি রাব্বী লানা ফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বী অলাউ জ্বীনা- বি মিসলীহি মাদাদা।" [সূরা কাহাফ ঃ ১০৯] অর্থাৎ, বল, সমুদ্র যদি কালি হয় আমার রবের গুণাবলী লেখার জন্য, তবে তা লিখার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে- অনুরূপ আরেক সমুদ্র সাহায্যার্থে আনলেও।

(৪)

আগে বর্ণিত আয়াতে পাক [সূরা কাহাফ ঃ ১০৯] দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর অসীমত্ব বুঝাচ্ছে যা, আংশিকভাবে এ মহাবিশ্বে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, এটা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর গুণাবলী এ বিশ্ব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বাইরে অদৃশ্য জগতসমূহেও বিকশিত। আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে সবই তাঁর পবিত্র সিফাত বা গুণবাচক নামেরই বিকাশ। বিশাল এ মহাবিশ্ব ছাড়াও বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসি লাওহ-কলম প্রভৃতি আল্লাহর নির্দেশে সৃষ্ট হয়েছে। এসব অদৃশ্য জগতে বিজ্ঞানের বিচরণ কখনো হবে না। এগুলোর হাক্বিকাত (সত্যতা) বুঝতে হলে চাই ঈমানী শক্তি ও খোদার প্রতি ইশ্‌ক।

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে এমন একটা বস্তু যা মানুষকে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য- এটাতে আস্থা রাখা একান্ত করণীয়। এমনকি সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিকেরও এক ধরনের 'ঈমান' আছে। আর বিজ্ঞানী-তো যে কোন গবেষণা শুরুই করেন বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যে কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পূর্বে এটা যে অস্তিত্বশীল হতে পারে সে ব্যাপারে অগ্রেই বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি তা না হয়, এ প্রমাণ যাচাই করার প্রারম্ভেই-তো ভুল হয়ে গেল। আর ভুলের ওপর বহাল থেকে গবেষণার ফল ভুলই হয়।

পাঠকরা এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, নাস্তিক লোক কি কখনো আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে পারে? এ জন্যেই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ "জা-লিকাল কিতা-বু লা-রাইবা ফীহ, হুদাল্লীল মুত্তাক্বীন।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২) অর্থাৎ, এটা সে কিতাব যাতে কোন ভুল নেই, মুত্তাকীদের (ঈমানদারদের) জন্য পথ-প্রদর্শক। এখানে পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, কুরআন শরীফের জ্ঞান ঈমানদারদেরকে পথ দেখাবে। ঈমান প্রথমে এনে, তারপরে আল্লাহকে চিনতে হবে, তাঁকে খুঁজতে হবে। এ ঈমানের শক্তি যত বেশী মজবুত হবে তত বেশী আল্লাহর সাথে পরিচিতি ঘটবে। তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন এ জগত সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু হয়ে ওঠবে। এ জন্যেই আল্লাহর প্রিয়জনরা বলেছেন, সর্বাপেক্ষা বড় যিকির হলো ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। এ পবিত্র যিকির দ্বারা তালাবদ্ধ (বিশ্বাসহারা) অন্তঃকরণকে খুলে দিতে হয়। যত বেশী এ কালেমা পড়া হবে স্তরে স্তরে আবৃত হৃদয়ের পর্দা তত বেশী ফেটে যাবে এবং সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে হৃদয়টা উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। তখনই সে প্রশস্ত অন্তঃকরণ খোদার প্রতি শুধু দৃঢ়-বিশ্বাসীই হয় না, বাস্তবে তাঁর ইশ্কে পড়ে বিভোর হয়ে যায়। তার কাছে আর সন্দেহের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কারো প্রেমে কি কেউ কোনদিন পড়েছে, যার অস্তিত্ব নেই?

অবিশ্বাসীরা যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এখন ও ভবিষ্যতে ধর্মকে খণ্ডন করতে সচেষ্ট আছে ও হবে, তারা এ জিনিসটা একটিবার ভাবে না যে, প্রথমে ঈমান এনে তার পরই পরীক্ষা করে দেখা যাক এর সত্যতা। অথচ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই জ্ঞান-বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, তা তারা বুঝতে পারে না। বিজ্ঞানের যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হয় এভাবেঃ- প্রথমে বিজ্ঞানী তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও তথ্যাদির উপর কিছুটা নির্ভর করে একটা ধারণা (বিশ্বাস) করেন যে, এরূপ অবস্থার ফলাফল হয়ত সেরূপ হতে পারে? অর্থাৎ, তিনি এটা বিশ্বাস করেন, এভাবে হলে সেভাবে হবে। এর পরই এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটা হাইপথেসিস গড়ে তুলেন। এবার জানা বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারা ও সত্যকে কাজে লাগিয়ে তাঁর এ হাইপথেসিসকে প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্রত হন। তারপর তাঁর প্রাথমিক ধারণায় যদি ভুল না থাকে বা ভুলের মাত্রা কম থাকে, তবেই শেষ পর্যন্ত মূল ধারণার মধ্যে কিছুটা হেরফের

ঘটিয়েও একটা বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনিত হওয়া সম্ভব হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঈমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের ভিত্তি। কিন্তু একমাত্র ধর্মের ব্যাপারে অবিশ্বাসীরা এ জ্ঞান অর্জনে (অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে) বিশ্বাসকে ভুলে বা দূরে রেখে গবেষণা করতে চায়। এটা-তো বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি হলো না। আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা যাচাইয়ের পূর্বে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাই অপরিহার্য।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। মনে করুন আপনাকে কেউ বললো, অমুক পর্বতের চূড়ায় একজন লোক বসবাস করেন। তাঁর সাথে আপনি দেখা করতে পারেন, আমি নিজে ওখানে গিয়ে দেখা করে এসেছি। এখন, পাহাড়ের ওপর আরোহণ করতে আপনি অপারগ, আপনি পর্বতারোহী নন। যে লোকটি আপনাকে এ তথ্য দিয়েছে তার সম্পর্কে আপনি ভাল করে জানেন যে, সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না ও এ ব্যাপারে মিথ্যা বলার মধ্যে তার কোন স্বার্থও নেই। এখন যেহেতু আপনি নিজে ঐ পাহাড়ে আরোহণ করে ব্যক্তিটিকে স্বচক্ষে দেখতে পারছেন না, তাই বলে তার কথাটা আপনি কি উড়িয়ে দিতে পারেন? সে যে সত্যি বলেনি এর কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন? ঈমানের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। একজন সত্যবাদী (হুজুরে পাক [সাঃ]) নিজে দেখা করেছেন (বা আধ্যাত্মিকভাবে সাক্ষাৎ করেছেন), কথাবার্তা বলেছেন এক সত্তার সাথে (আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা)। তারপর বললেন, তোমরা এ সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, যদিও তোমরা আমার মতো পর্বতারোহী না হওয়ায় তাঁকে দেখতে পারবে না। তবে তিনি বার্তা (আল-কুরআন) পাঠিয়ে আমাকে বলেছেন, এই এই কার্যাবলী (নেক আমল) দ্বারা তাঁর কাছে যেতে সক্ষম হবে। আমি তোমাদেরকে কার্যে সব দেখিয়ে দিচ্ছি (আল-হাদীস) কিভাবে তোমরা চলবে।

এবার ভেবে দেখুন আল্লাহর ওপর ঈমান না রাখার কি কোন কারণ থাকতে পারে? অবিশ্বাসীরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে, অথচ এর পেছনে সে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিই-তো অনুপস্থিত। ওহীর জ্ঞান আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকতে পারে না। যদি তা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে, অবশ্যই ভুলটি বিজ্ঞানের

মধ্যেই। আর এর কারণ হলো, ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী এ তথ্য উপস্থাপন করেছেন, প্রাথমিক তাঁর ঐ হাইপথেসিসের (বা বিশ্বাসের) মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ বা ভুল বিদ্যমান ছিলো। এ কথা আমার নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে আলেকজান্দ্রার জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি বলেছিলেন, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। সূর্যসহ, গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকা জগত মহাশূণ্যে স্থির পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। হাজার বছরের বেশী কাল যাবৎ মানুষ টলেমির এ থিওরীকে বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দিতে এসে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রভাব ও অগ্রগতির অনুসরণে নিকোলাস কোপারনিকাস নামে এক বিজ্ঞানী বললেন, টলেমীর ব্যাখ্যা ভুল। আসলে সূর্যটাই মহাশূণ্যে স্থির আছে ও এর চতুর্দিকে পৃথিবীসহ যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ ঘূর্ণমান আছে। বিজ্ঞানের এ সত্য আরও বহুকাল মানুষ বিশ্বাস করে আসলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দির শুরুতে এটা আবার পাল্টে গেল। এবার আইনস্টাইন, হয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানী অংক কষে ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, আসলে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও সূর্যসহ সবকিছু মহাকাশে একটা বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করে গতিশীল আছে। এ গতি শুধু সৌরজগতের বেলাই সত্যি নয়, বরং গোটা বিশ্বজগৎই অস্থির, গতিশীল। বস্তুত, এ গতি থাকার ফলেই সবকিছু অস্তিত্ব বজায় রেখে ঠিকে আছে। এটা স্বভাবের একটা মৌলিক আইনও বলা চলে।

এবার নিশ্চয়ই পাঠকরা বুঝতে পেরেছেন, বিজ্ঞানের সঠিক স্বরূপ। এটা কখনও ফাইনেল সত্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছে তা দাবী করতে পারবে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছুটা ভুল-ক্রুটি বিজ্ঞানের যে কোন তথ্যে থাকাটা বাস্তব- এ সত্যটি আজ বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে।

একবিংশ শতাব্দিতে এসে আজকের বিজ্ঞান যদিও উপর্যুক্ত মহাবিশ্বের সবকিছু ঘূর্ণমান থাকার ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে জানতে সক্ষম হয়েছে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ডে, তথাপি এ তথ্য ইসলামের মহান আসমানী কিতাব, ঐশীগ্রন্থ কুরআনুল করীম মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে প্রায় পনর শত বছর পূর্বে ঃ "লাশ্বামছু ইয়ান্বাগ্বীলাহা- আনতুদ্রিকাল ক্বামারা

অলাল্লাইলু ছা-বিকুন্নাহার; অকুল্লুন ফী ফালাকি-ইয়াছবাহুন।” [সূরা ইয়া-সীন ঃ ৪০] অর্থাৎ, চন্দ্রকে ধরতে পারে না সূর্য, এবং রাতও দিবসের অগ্রগামী নয়; এবং প্রত্যেকেই (জগতে যাকিছু আছে) কক্ষপথে সন্তরণ করছে। সুবহানাল্লাহ! মহান প্রভু অল্প কথায় এ একটিমাত্র বাক্যে কী সুন্দর, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বছরের গবেষণার ফলাফল ব্যক্ত করে দিলেন। এ ঐশী বাণীর দ্বিতীয় অংশে জগতের সবকিছু মহাকর্ষের কারণে গতিশীল আছে তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথম অংশের তথ্য আমাদের সূর্য-পৃথিবী-চন্দ্র এ সিস্টেমের বেলা তাৎপর্যপূর্ণ। চন্দ্রকে ধরতে পারে না সূর্য বলতে এটাই বুঝাচ্ছে যে, চন্দ্রের ও সূর্যের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে। আর চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে একটা মহাকর্ষ বিদ্যমান আছে, যার ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের বেলা চন্দ্রের কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব যথাযথ করা হয়েছে। তারপর রাতও দিবসের অগ্রগামী নয় কথাটার মাধ্যমে পৃথিবীর আহ্নিক গতির দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ গতি না থাকলে ২৪ ঘণ্টায় রাত-দিনের আবর্তন ঘটতো না। আয়াতে করীমের দ্বিতীয় অংশে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা শুধু বিশ্বের যাবতীয় বৃহৎ জড়-সমষ্টি (গ্রহ, উপগ্রহ, তারা) ঘূর্ণমান বলেন নি, বরং অণু-পরমাণুও যে এ ঘূর্ণন থেকে মুক্ত নয়- এ কথাটির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, সৃষ্ট সবকিছুই গতিশীল হয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে আছে। আর এ গতিশীলতার কারণ হলো আল্লাহ প্রদত্ব প্রাকৃতিক আইন বা নেচার‍্যাল লো।

পবিত্র কুরআন শরীফের প্রথম দু'টি আয়াত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ। অবশ্য সবাইকে বুঝতে হবে, এই গবেষণা নতুন তাফসীর নয়। কারণ, তাফসীরের যোগ্যতা আমার নেই। তাফসীর করার জন্যে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি উলামায়ে কেরাম নির্দিষ্ট করেছেন, তা হলো নিম্নরূপঃ

১. ঈমানের উপর দৃঢ়তা।

২. আরবী ভাষার উপর দক্ষতা।

৩. কুরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিয়ষের উপর জ্ঞান (যেমন হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস প্রভৃতি)।

৪. কুরআন শরীফকে সঠিকভাবে বুঝার ক্ষমতা।

৫. নিছক অনুমান ও ধারণা থেকে বেঁচে থাকা।

৬. কুরআন দিয়েই কুরআনের তাফসীর শুরু করা।

৭. হুযুর (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার ও এ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা।

৮. সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- থেকে বর্ণিত তথ্যের উপর গুরুত্ব দেয়া।

৯. তাবিঈনদের বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা ও এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

উপরোক্ত নিয়ম-পদ্ধতির সবক'টির উপরই আমার নিজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা একান্ত দুর্বল। সুতরাং আমার এ প্রচেষ্টা কোন তাফসীর নয়। এটাকে কেউ তাফসীর হিসেবে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু এ থেকে সত্যিকার কোন তাফসীরবিদ যদি অনুপ্রেরণা পান তবেই আমার প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। আধুনিক এ যুগে বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে জানা এবং কুরআন শরীফের আলোকে এর গবেষণা সকলের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে স্থায়ী কল্যাণ। এছাড়া সার্বিকভাবে ধর্মবিশ্বাস- বিশেষকরে ইসলামের উপর, যুগের যে প্রচণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার সঠিক মুকাবিলাও সম্ভব হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হক্ব পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দ্বীন-ইসলাম ও এর শাশ্বত মহান শিক্ষাকে জগতব্যাপী বিস্তৃত করুন। আ-মিন।

সিলেট, ১৪/০২/০৬।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমাদের পূর্বসুরী জ্ঞানান্বেষীরা ও আমরা

"তিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না" [বাক্বারা : ২৩৯] জ্ঞানার্জন ছিলো কোন এক যুগে ইবাদাত। বলতে পারেন, এ যুগেও তো তা ইবাদাত। কথাটি ঠিক, তবে এখন জ্ঞানার্জন বা ইলম হাসিল বলতে শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষাকে বুঝায়। আর দ্বীনি শিক্ষা তো অবশ্যই ইবাদাত। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা ছাড়াও অনেক ধরনের জ্ঞান আছে যা অর্জনের মাধ্যমে ইহ-পরকালে মানুষের জন্য বিরাট উপকারী হতে পারে। আমি যে 'ইবাদাতের' কথা প্রথম বাক্যে উল্লেখ করেছি তা জ্ঞানার্জনের এই ব্যাপক অর্থকে বুঝাতে চেয়েছি। আগের যুগে আমাদের পূর্বসুরী মুসলিম মহাত্মনরা জ্ঞানার্জন করতে যেয়ে শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেন নি। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের ইঙ্গিত অনুযায়ী সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনকেই তারা ইবাদাতের অংশ মনে করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত এক অপূর্ব সভ্যতার জ্যোতি। এই জ্যোতির প্রভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক নবতর জাগরণ শুরু হয়। পশ্চিমা ইউরোপসহ পুরাতন বিশ্বসমাজ আমাদের পূর্বসুরী এসব জ্ঞানান্বেষী মনীষীর গবেষণা দ্বারা স্থায়ীভাবে উপকৃত হয়। এমনকি তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূল কারণও ছিলো মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান। আমাদের পূর্বসুরী মুসলমানদের বিরাট অবদানের কথা, সে সঙ্গে আমরা উত্তরসূরীদের বর্তমান দুরাবস্থা এবং সম্ভাব্য করণীয় ইত্যাদি ব্যাপার-স্যাপার এই প্রবন্ধে তুলে ধরার ইচ্ছা রাখি।

১.

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস শরীফ

প্রথমেই পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া হয়েছে সেদিকে একটু খিয়াল দিতে হবে। এ থেকেই স্পষ্ট হবে, কেনো আগের যুগের মহাত্মনরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাকে ইবাদাতের সমতুল্য ভাবতেন।

ইসলামের ভিত্তি মূলত জ্ঞানের উপর। কারণ আল্লাহর একত্বের জ্ঞান এবং সেসাথে ঈমান ও সঠিক ইবাদাতই মানুষকে মুক্তি প্রদান করতে পারে।

মানুষকে আল্লাহপাক যে বুদ্ধিক্ষমতা দান করেছেন তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানবান হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। বুদ্ধিক্ষমতার একটি মূল শাখা হলো চিন্তাশক্তি। জগতের অসংখ্য নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে নিশ্চয়ই আল্লাহর মাহাত্ম্য, একত্ব এবং সর্বোপরি তাঁর পরিচিতি মানব মনে মহাসত্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু কুরআন শরীফ নয়, হাদীস শরীফে অনেক জায়গায় জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাগিদ এসেছে। "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করো" এবং "অবশ্যই জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই নবীদের ওয়ারিস" ইত্যাদি হাদীস শরীফ থেকে এটা বুঝতে বাকী থাকে না যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁর এসব উক্তি বিফলে যায় নি। ইসলাম ও মুসলমানদের ১৪ শত বছরের ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ই পৃথিবী দেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত এক বিরাট সুসভ্য মুসলিম সাম্রাজ্য। প্রমাণ স্বরূপ প্রখ্যাত নগরীদ্বয় বাগদাদ ও স্পেনের কুর্দোভার কথা বলা যেতে পারে। এই শহরদ্বয়ের লাইব্রেরীতে ৪ লক্ষাধিক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিলো। আধুনিক যুগেও এতো অধিক সংখ্যক গ্রন্থে পরিপূর্ণ লাইব্রেরী খুব বিরল। এরূপ অনেক মুসলিম শহরে অসংখ্য বইয়ের দোকানও ছিল যেখানে সাধারণ জনতা পুস্তকাদি ক্রয় করতেন। সেযুগের সমাজে লেখক, বুদ্ধিজীবী, গবেষকদের সামাজিক অবস্থানও উচ্চে ছিলো। তাদের প্রতি পুরো সমাজ বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতো।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে। মানুষ ইতিহাসের শুরু থেকেই জগতকে সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। সুতরাং পুরাতন সভ্যতার লীলাভূমি মোসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত, চীন ও গ্রীসে ইসলামের আগমনের বেশ পূর্বে বৈজ্ঞানিক অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। মুসলিম খিলাফাত যখন দ্রুত বেড়ে উঠলো তখন ঐসব পুরাতন সভ্যতার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয় স্বভাবতই। মুসলমানরা সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মিশর এবং স্পেন জয় করে সর্বত্র ইসলামভিত্তিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেন। যেসব কেন্দ্রে পুরাতন সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিলো গ্রন্থাবলীতে সেগুলো মুসলিম বিশ্বের আয়ত্তে এসে

পড়লো। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া ছিলো শত শত বছরব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু বাইজান্টিয়াম (পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য) ও গ্রীকদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একদা বাইজান্টাইন কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত পাঠাগারটি পুড়িয়ে ফেলা হলে মহামূল্যবান অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। এরপরও আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষাণুরাগের ঐতিহ্য একেবারে মুছে যায় নি। তখনকার খ্রিস্টবাদীরা শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবর্তে অ্যান্টিওক ও এডিসা শহরকে বেছে নিয়ে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। এদিকে পারস্য সম্রাট শাপুর-১ জুনদিশপুর শহরকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললেন। শিক্ষার এই বিরাট কেন্দ্রে ভারত থেকেও অনেক গবেষক এবং শিক্ষক এসে যোগ দেন। এসবই ঘটছিলো ইসলামের আবির্ভাবের বেশ আগে।

উমাইয়্যা খিলাফতকালে বর্ণিত সকল কেন্দ্রই মুসলমানদের করতলগত হয়। তবে মুসলমানরা এসব শিক্ষাকেন্দ্রকে গণিমত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তারা বুঝতে পারলেন বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি পুরো বিশ্বের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ। এগুলোকে আরবীতে ভাষান্তরের মাধ্যমে পুরো উম্মাহ বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভেবে শুরু করলেন ভাষান্তরের যুগ। অধিকাংশ গ্রন্থাদি ছিলো গ্রীক, সিরিয়াক, পাহলভী এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইবনে ইসহাক, ইবনে মুকাফফাক প্রমুখ নেতৃস্থানীয় অনুবাদক কর্তৃক গ্রন্থাদি আরবীতে অনূদিত হতে লাগলো। অষ্টম শতকের শুরু থেকে নবম শতকের শেষ পর্যন্ত এই মহান ভাষান্তরের যুগ বিদ্যমান ছিলো। আব্বাসী খলীফা আল-মামুন বাগদাদ শহরে গড়ে তুললেন প্রখ্যাত 'বাইতুল হিকমাহ' বা জ্ঞানকেন্দ্র। এখানেই বেশিরভাগ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাদি অনূদিত হয়েছিল। বিশেষ করে এ্যারিস্টটল ও তার চিন্তা-চেতনা, প্লেটোর অধিকাংশ থিওরী, পিথাগোরিয়ান থিওরীসমূহ, টলেমীর আলমাজেস্ট, ইউক্লিডের ইলেমেন্টস, হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের গবেষণা ইত্যাদি এসময় আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে মুসলিম জ্ঞান-চর্চায় অনুপ্রবেশ করে। অপরদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও পারস্যে উদ্ভুত গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ঔষধের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পাহলভী ও সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবীতে অনূদিত হয়। তবে অবশ্যই মুসলমানরা

অন্ধভাবে এসব থিওরীর অনুসারী ছিলেন না। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবেও সংঘাতময় কোন চিন্তা-ধারণা-থিওরীকে তারা খুব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে বা উপেক্ষা করে গেছেন। সুতরাং এটা মোটেই সঠিক নয় যে, গ্রীক, ভারত ও পারস্যের পুরাতন দর্শন দ্বারা মুসলিম স্বকীয়তা, স্ব-ঐতিহ্য, ঈমান-আকীদায় স্থায়ী ক্ষতিসাধন হয়েছে।

বাস্তবে মুসলমানদের মধ্যে সে সময় একদল জ্ঞান-তাপসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে এগিয়ে নিয়েছেন। বাস্তবে জ্ঞানের জন্যেই পুরাতন বিশ্বের জ্ঞানার্জনে তারা আগ্রহী হন। কারণ ইসলাম মানুষকে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। সে সময় তারা মনে করেন নি যে, ওসব বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোতে কোন ক্ষতিসাধনের আশঙ্কা থাকতে পারে। হ্যাঁ, যেই মুহূর্তে এরূপ কোন আশঙ্কার আবির্ভাব দেখা দিয়েছে তখনই মনীষীরা দক্ষতার সাথে তা প্রতিহত করেছেন, ইসলামী ঈমান-আকীদাকে সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। ইমাম গাযালীর মতো মহাত্মন ব্যক্তিদের দ্বারা এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে যদিও অমুসলিমদের জ্ঞান থেকে উপকার খুঁজে বের করা হয়েছিল, একই সময় অপরদিকে খুব সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে করে ইসলামী মৌলিকত্ব সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত থাকে।

আরবী ভাষায় অতীতের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কর্মকাণ্ড অনূদিত হওয়ায় এবং একই সঙ্গে সে যুগের জ্ঞানচর্চায় মুসলিম মনীষীদের অগ্রগামিতার ফলে আরবী ভাষা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নততর এক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা, শিক্ষা ও চর্চা আরবী ছাড়া কল্পনাতীত ছিলো। আরবীর এই একচ্ছত্র অধিকার শত শত বছর যাবৎ স্থায়ী হয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় গবেষক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষীদেরকেও আরবী শিখতে হয়েছে। কারণ আজকের ইংরেজীর মতো আরবী ছিলো সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক ভাষা।

২.

গাণিতিক বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা

ইসলামের হৃদ-কেন্দ্রে আছে একত্ববাদ। মুসলমানরা সর্বদাই গাণিতিক গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন। ইসলামী একত্ববাদ ও গণিতের মধ্যে এর স্বরূপ খুঁজে দেখা একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং গণিত গবেষণায় অপর দু'টি সম্পূরক বিষয়ও উত্তরোত্তর উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা প্রাচীন ভারত, পারস্য ও গ্রীসে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যাবলীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিজেরা উন্নততর কর্ম সাধন করেন। টলেমির আলমাজেস্ট মূলত এর আরবী নাম। এটাকে মুসলমানরা ভালোভাবে গবেষণা করে এতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি ছিলো তা দূর করেছিলেন। বিশেষ করে টলেমির সৌরজগত সম্পর্কীয় থিওরীর উপর বিশেষ গবেষণা হয়েছে এবং পরবর্তীতে নাসির উদ্দীন তুসী ও তার অনুসারীরা থিওরীকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মুসলমানরা মহাকাশের উপর পর্যবেক্ষণমূলক সার্ভে করে অসংখ্য নতুন তারা আবিষ্কার করেন। আব্দুর রহমান সুফী কর্তৃক প্রণীত "বুক অব স্টারস" এখনও পঠিত হয়। এটা প্রথমে আলফোসনো সাবিও নামক এক ব্যক্তি স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। এখনও ব্যবহৃত বহু তারার নাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এগুলো মূলত আরবী নাম। যেমন সিরিয়াস, আলদেবারান, আলফাসেন্সুরী ইত্যাদি। মুসলমানদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে তথ্যমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকা যাকে আরবীতে 'জিয' বলা হয়। এরূপ এক প্রসিদ্ধ পর্যবেক্ষকের নাম ছিলো আল-বাতানী। তার অনুসরণে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির ব্যবহার করে শুরু হয় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বিপ্লব। এর ফলে তৈরী হয় প্রখ্যাত "আল-মামুনের জিয" (বাগদাদ), "হাকিমী জিয" (কায়রো), আল-যারকালীর "টলেডান জিয", নাসির উদ্দীন তুসীর "আল-খানী জিয" এবং "উলুগ বেগের জিয" (সমরকন্দ)। মধ্যযুগী ইউরোপিয়ান এ্যাস্ট্রনোমার টাইকো ব্রাহীর সময় পর্যন্ত এসব টেবিল সবার প্রিয় ছিল। এগুলো পুরো জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরাট প্রভাব ফেলে। এছাড়া মুসলমানরাই সর্বপ্রথম অবজারভেটরী বা মানমন্দির তৈরী করে একে বিজ্ঞান

গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। এই অবজারভেটরী পারস্যের মারাগাহ শহরে ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাসির উদ্দীন তুসী। এছাড়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একাধিক যন্ত্রপাতিও মুসলমানরা আবিষ্কার করেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ যন্ত্রটি হলো আস্ট্রলেব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর মুসলমানদের ব্যাপক গবেষণার ফলেই ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, ক্বিবলা নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধিত হয়। সর্বাপেক্ষা সঠিক সোলার ক্যালেন্ডার যা আজো ব্যবহৃত হয় তা ছিল জালালী ক্যালেন্ডার। এটা উমর খৈয়ামের নেতৃত্বে দ্বাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আফগানিস্তান ও ইরানে এর ব্যবহার আজো দেখতে পাওয়া যায়।

৩.

গণিত ও বীজগণিত

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি মুসলমানরা গণিত শাস্ত্রের উপর বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। সাধারণ আকর্ষণ ছাড়াও গণিতের ব্যবহারিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ- যেমন, উত্তরাধিকার হিসাব এবং জমির মাপজোখ ইত্যাদি। মুসলিম গাণিতিকদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত গণিতবিদ আল-খোয়ারিজমির নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন নবম শতকের সর্বপ্রধান বিজ্ঞানী। তারই গবেষণার ফলে আমরা বীজগণিত পেয়েছি। আরো পেয়েছি বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত সংখ্যা সিস্টেম। আজো তারই নামানুসারে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শব্দ 'আলগোরিথম' ইংরেজীতে এবং স্পেনিশ ভাষায় গোয়ারিসমো (অর্থ সংখ্যা) ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ্যামিতির উপরও মুসলমানদের অবদান ছিলো বিরাট। ইসলামী স্থাপত্যশিল্প ও ডিজাইনে জ্যামিতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূসা নামক এক ব্যক্তি তার ভাইকে নিয়ে জ্যামিতির উপর বিশেষ গবেষণা সেই নবম শতকে শুরু করেছিলেন। সমকালীন প্রখ্যাত গাণিতিক তাবিত ইবনে কুররা ক্যালকুলাসের উপর গবেষণা করেন যা অনেক পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের হতে এসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদিকে ইউক্লিডের জ্যামিতির উপর উমর খৈয়াম ও তুসী উচ্চতর গবেষণা করেন।

ত্রিকোণমিতি মুসলমানদের কর্তৃক গণিতের একটি আলাদা শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই গণিতের উপর বিশেষ অবদান রাখেন প্রখ্যাত

মুসলিম বিজ্ঞানী আল-বিরুনী। অপরদিকে মুসলিম গাণিতিক আল-বাত্তানী, আবুল ওয়া'ফা, ইবনে ইউনুস এবং ইবনে হাইছাম গোলকাকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম দেন। এই নতুন গাণিতিক শাখা দ্বারা অসংখ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

মুসলমানরা নাম্বার থিওরীতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আল-খুজানদি নামক এক গাণিতিক সে যুগে 'ফারমেটস্ শেষ থিওরেমের' মতো একটি সমস্যা আবিষ্কার ও এ নিয়ে গবেষণা করেন। ফারমেটের শেষ থিওরেমের ব্যাখ্যা হলো, $x^n + y^n = z^n$, এই সমীকরণে x, y, z এবং n যদি ইন্টেজার বা আস্ত রাশি হয় তাহলে একমাত্র $n = 2$ এর ক্ষেত্রে সত্য হবে। অর্থাৎ দু'টি স্কোয়ারের যোগফল আরেকটি স্কোয়ার হতে পারে। ব্যাপারটি খুজানদি উপলব্ধি করে "দু'টি কিউবকে যোগ দিলে আরেকটি কিউব হবে না" - অর্থাৎ উক্ত সমীকরণে $n >= 3$ হলে রাশিগুলো আস্ত হবে না। এদিকে আল-খারাজি নামক অপর এক গাণিতিক জিপি (জিওমেট্রিক প্রগ্রেশন বা জ্যামিতিক হার) ও এপি (এ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন বা - পাটীগাণিতিক হার) নিয়ে গবেষণা করেন। বিশেষ করে এই জিপি তারই আবিষ্কার: 1^3+2^3+3^3+...+n^3=(1+2+3+...+n)^2. প্রগ্রেশন নিয়ে গবেষণা আল-বিরুনীও করেছেন। এছাড়া গিয়াস উদ্দীন জমশেদ খাসানী নাম্বার থিওরীর উপর উচ্চতর গবেষণায় জড়িত ছিলেন।

বিজ্ঞানের অন্যান্য মূল শাখা যেমন পদার্থ, ব্যালান্স, মেকানিক্স এবং আলোকবিজ্ঞানের উপরও মুসলমানদের অবদান কোন মাত্রায়ই কম ছিলো না। পদার্থবিজ্ঞানে তিনটি ক্ষেত্রে মুসলমানরা সুদূরপ্রসারী অবদান রাখেন। এর প্রথমটি হলো বস্তুর স্পেসিফিক ওজন এবং ব্যালান্স। গ্রীক বিজ্ঞানী আরর্কিমিডিস এই ফিল্ডের উদ্ভাবক ছিলেন বটে কিন্তু তার থিওরীকে অনেক দূর এগিয়ে নেন মুসলমানরা। আল-বিরুনী ও আল-খাযিনী এই বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা করে লিখিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো মেকানিক্স গবেষণায় প্রজেকটাইল সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের মন্তব্যের উপর মুসলমানদের সমালোচনা। ইবনে সিনা, আবুল বারাকাত বাগদাদী, ইবনে বাজ্জাহ ও অন্যান্য গবেষক হলেন এসব সমালোচক। তাদের আলোচনা-সমালোচনাই ছিলো বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর

গবেষণার ভিত্তি। তৃতীয়ত আলোকবিজ্ঞানে মুসলমানদের গবেষণার তুলনা নেই। ইবনে হাইতাম ছিলেন এই বিজ্ঞানের উদ্ভাবক। এই বিষয়ের উপর কিতাবুল মানাযির নামক তার প্রখ্যাত গ্রন্থ পশ্চিমে "থিসোরাস অপটিকাস" নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। ইবনে হাইছাম আলোকবিজ্ঞানের অসংখ্য সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তিনি লেনসের উপর গবেষণা করেন। এছাড়া ক্যামেরার আবিষ্কারক তিনিই ছিলেন। দৃষ্টিশক্তির উপর উচ্চতর গবেষণা করে তা বুঝিয়ে দেন, চোখের বিভিন্ন অংশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সর্বপ্রথম বুঝিয়ে দেন কোন কারণে সূর্য এবং চন্দ্র উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় দেখতে অনেকটা বড়ো লাগে। দীর্ঘ দুই শতক পরে অপর দুই মুসলিম বিজ্ঞানী আলোকবিজ্ঞানের গবেষণাকে আরোও কয়েক ধাপ এগিয়ে নেন। এদের নাম ছিলো কুতুব উদ্দীন সিরাজী ও কামাল উদ্দীন ফারিসী। কেন এবং কিভাবে রঙধনু সৃষ্টি হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম কুতুব উদ্দীন দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট। যে কোন বিষয়ের উপর একান্ত যথার্থতা প্রমাণ করতে গেলে পরীক্ষাগারে টেস্ট করা জরুরী। বিজ্ঞান মূলত প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হতে পারে। নিছক যৌক্তিক গবেষণা কিংবা শুধুমাত্র বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার আদৌ সম্ভব নয়। আদি যুগেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব কম ছিলো না। তবে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌক্তিক গবেষণার উপরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রীক বিজ্ঞানীরা 'থিওরীটিক্যাল' বিজ্ঞান নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছেন। এর একটি কারণ ছিলো অধিকাংশ গবেষক দর্শন নিয়েও গবেষণা করতেন। আর দর্শন মূলত যুক্তিনির্ভর গবেষণা। বিজ্ঞানেও যুক্তির স্থান আছে- তবে এটাই যথেষ্ট নয়। এসাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা তথা পরীক্ষার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থিওরীকে 'প্রমাণিত' করা না হলে থিওরীর সত্যতা সর্বদাই সন্দেহজনক থেকে যায়।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ফিল্ডে মাপজোখ ও

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ট্র্যাডিশন গুরুত্ব সহকারে তারাই শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানমূলক কার্যাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে "এক্সপেরিমেন্টাল মেথড" নামক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখার জন্ম হয়।

৪.

চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসাশাস্ত্র লিখিত ইতিহাস শুরুর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, কথাটি সত্য হলেও এই শাস্ত্রকে একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা। এ হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্ভাবক মুসলমানরাই ছিলেন, এরূপ উক্তি অমূলক হবে না। বিষয়টির উপর মুসলমানদের এতো বেশী আগ্রহের পিছনে কারণ হিসাবে অন্যান্য অনেক ফেক্টর ছাড়াও হাদীস শরীফের বিভিন্ন ভাষ্য অনুপ্রেরণা যোগিয়েছিল এটা নিশ্চিত। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস শরীফের নির্দেশনা ছিলো সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত। এছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কতো কড়া ছিলেন তা সবার জানা। এমনকি তিনি বলেছেন, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অঙ্গ"। এসব হাদীস শরীফ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে পরবর্তীতে "আত্-তীব আন-নববী" নামক একটি অনুসরণযোগ্য প্র্যাকটিস মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এটা এখনও জোর গলায় বলা যায় যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়াদি যদি কোন ব্যক্তি অনুসরণ করে তাহলে সে অবশ্যই অনেক রোগশোক থেকে মুক্ত থাকবে। আর রোগ-প্রতিরোধই হলো সকল চিকিৎসার সার।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝতে আর বাকী থাকার কথা নয় যে, মুসলমান জ্ঞানবানরা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে হাদীস শরীফের অনুসরণ-অনুপ্রেরণা থেকে তখনকার দিনে প্রাপ্ত সকল সূত্র থেকে গড়ে তুলেন চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক উচ্চতর ডিসিপ্লিন। তারা অতীত সভ্যতা থেকে ধার করতে দ্বিধা করেন নি। তবে ধার থেকে বেশী অবদান ছিলো তাদের নিজেদের। একাধিক বিশ্বখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটে।

প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়াদি থেকে এটা স্পষ্ট যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগের যুগে মুসলমান গবেষকদের অবদান ছিলো বিরাট। তাদের জ্ঞানচর্চার ফলে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। সভ্যতা তাদের নিকট চিরঋনী।

সিলেট, ৩০ জুন ২০১৮।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

যুগের ফিতনা ও আমাদের কর্তব্য

ফিতনা একটি মারাত্মক ব্যাধি। ইতিহাসব্যাপী এই ভয়ঙ্কর রোগ হেতু পৃথিবীর বুকে কতো হৃদয়বিদারক, সমাজ-বিধ্বংসী, ধর্মদ্রোহী ও মানবতা-বিরোধী ঘটনা যে ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ও আমল-ঈমানের ক্ষেত্রে ফিতনা নামক এই মারাত্মক ব্যাধিটি আসলে কী এবং এ যুগের ফিতনাসমূহের পরিচিতি ও সেগুলো উৎখাতে আমাদের কর্তব্য-ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু। আমি আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

ফিতনার সংজ্ঞা

'আল-কামূসুল জাদীদ' নামক আরবী-বাংলা অভিধানে 'ফিতনা' (فتنة) শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছেঃ পরীক্ষা, যাচাই, বিপদ, মুসিবত; আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাস, গণ্ডগোল, ভয়, হতভম্বতা, দাঙ্গা। ইসলামের মৌলিকত্বের উপর আঘাত, বিদআত, আক্বাঈদ বিরোধী মতবাদ, পথভ্রষ্টতা, দ্বীনদারিত্বের বিরোধিতা ইত্যাদি হলো দ্বীন ও দ্বীনতারিত্বের ফিতনা। মোটকথা ইসলামের মৌলিকত্ব ও এর তাহজিব-তামাদ্দুন, আক্বাঈদ, সঠিক ধর্মকর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরাসরি যারা অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে বলা যায় 'ধর্মদ্রোহী'। আর যারা ধর্মের নামে ইসলামী মৌলিকত্ব, আক্বাঈদ ও আমল-ঈমানে পরিবর্তন আনয়ন করে দ্বীনের মূলকে উৎপাটনের কাজে নিয়োজিত আছে, তাদের কর্মের নাম 'ফিতনা' এবং তাদেরকে বলা যায় 'ফিতনাবাজ'। ফিতনার এই সংজ্ঞা দ্বারা আমরা এটাই প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, এরই মাধ্যমে সমাজে 'ধর্মদ্রোহিতা', 'অশান্তি', 'বিপদ', 'ভয়-ভীতি' ও 'হতভম্বতা' ছড়িয়ে পড়ে।

ফিতনা সৃষ্টিকারী

ধর্মকর্ম ও আক্বাঈদে ইসলামের ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টিকারীরা কয়েকটি বিশেষ কারণে এই মারাত্মক পথে পা বাড়াতে পারে। এই কারণগুলো

হলোঃ ১. দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার, ২. ধর্ম ও এর আক্বাঈদকে সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যর্থতা, ৩. নতুন মতবাদ সৃষ্টির 'নাফসানী' ইচ্ছা-প্রবণতা ও ৪. কাফির-বেঈমান-মুশরিক-মুনাফিকদের ইসলামবিরোধী কূটকৌশল। শেষোক্ত কারণটি ইসলামের ইতিহাসব্যাপী সক্রিয় ছিলো এবং তা আজো আছে। অত্যন্ত সুকৌশলে দুশমনরা ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাতের লক্ষ্যে মুসলমানদের দরদী কিংবা মুসলমান সেজে মুসলিম সমাজে বুদ্ধিভিত্তিক বিষ ঢেলে দেয়। ফিতনা সৃষ্টিকারী কোন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মধ্যে উপরোক্ত চারটি ব্যাপার একই সঙ্গেও ক্রিয়াশীল হতে পারে। এসব কারণে আত্মপ্রকাশ করেছে এমন কিছু দল ও ফিরকার, যাদের উপর এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মানুষ জন্মগতভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদ বিরোধী। কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থ একটি বিরাট ফেক্টর। এ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। এখানে দুনিয়ার স্বার্থ বলতে 'অন্যায় অবিচার' অবলম্বনে যে স্বার্থ উদ্ধার করা হয় তাকেই বুঝাচ্ছে। দুনিয়াবী স্বার্থের কয়েকটি রূপ আছে যেমনঃ ধন উপার্জন, যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, অতিলোভ, ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি। ইসলাম অবশ্য মানুষকে 'দুনিয়া বিরোধী' হতে বলে না। দুনিয়ার ধন-সম্পদের মালিক হওয়া কোন অন্যায় কাজ নয়- কিন্তু সে লক্ষ্যর্জনে অন্যায় পন্থাবলম্বন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যেহেতু মানুষ জন্মগতভাবেই অন্যায়-অবিচার বিরোধী তাহলে সে কেনো পরিণত বয়সে এই পথে অগ্রসর হয়? আমার ধারণা এই অধঃপতিত অবস্থার মূল কারণ হলো ধর্ম-বিশ্বাসে দুর্বলতা কিংবা বে-ঈমানী।

আমরা এ প্রবন্ধে যাদের নিয়ে আলোচনা করছি তারা হলো মুসলমান। সঠিক ঈমানদার কেউ কি কোনদিন জেনেশোনে অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে বলতেই হয়- হতে পারে না। কিন্তু সমাজে এর বিপরীত প্রবণতাই বেশী দেখা যাচ্ছে। আজকের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারে অন্যায়-অবিচার, পাপকার্য ইত্যাদি যে কোন উপায় অবলম্বনে মেতে ওঠেছে। তাহলে আমরা এই সমাজ-দৃশ্য থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হবো? মানুষের মধ্যে কী ঈমানী শক্তি এতোই দুর্বল হয়ে গেছে যে, সে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ঈমান-আক্বীদা

বিরোধী কার্য-কলাপে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করে না? বাস্তবে মানুষের জীবনটা তো এক পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় গুণাবলী প্রদান করেছেন। শুধু যদি ভালো গুণাবলী দ্বারা তাকে পয়দা করতেন, যেমনটি ফিরিশতাদের বেলা সত্য- তাহলে এই পৃথিবীতে আসার কোনো কারণ থাকে না। অপরদিকে শুধু যদি খারাপ গুণাবলী দ্বারা তাকে বানাতেন তাহলে তার প্রতি অবিচার করা হতো।

মানুষের মধ্যে যে খারাপ প্রবণতা বিদ্যমান তার মূলে আছে আলীম-উলামাদের ভাষায় 'নফসে আম্মারা' নামক এক শক্তিশালী বস্তু। অপরদিকে মানুষের রূহ বা আত্মার মধ্যে উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান। নফসে আম্মারা ও রূহের মধ্যে তাই একটি অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের নামই পরীক্ষা। যুদ্ধে আত্মার জয়লাভের পূর্বশর্ত হলো ঈমান বিল গায়েব। ঈমান যতো শক্তিশালী হবে যুদ্ধে জয়লাভ ততো সহজ-সাধ্য হবে। ইসলাম মানুষকে 'ঈমানী নূরে' দুনিয়ায় আগমনের এই পরীক্ষায় জয়লাভ করে আখিরাতের অনন্ত জীবনকে সুখময় করার পথ ও পাথেয় দেখিয়েছে। কিন্তু মানুষের খাহিশাত যদি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াতে পারে। নাফসানী এই স্বার্থনির্ভর প্রবল আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার। আর একদল মানুষ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত এই 'দুর্বলতাকে' কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, হতে চায় ক্ষমতা-যখ-খ্যাতির অধিকারী। এই লক্ষ্যর্জনে অবশ্য এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রথমে 'বুদ্ধিভিত্তিক' চিন্তা-গবেষণা করেন। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে তিনি দ্বীনের উপর উচ্চতর স্ট্যাডি করে নিজের নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার ভিত গড়ে তুলেন। এটা গড়তে যেয়ে ইতিহাস বিকৃতি, অতীতের জ্ঞানী-গুণীদের কঠোর সমালোচনা, তাঁদের গবেষণায় ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে বের করার প্রবণতা ইত্যাদি মারাত্মক পদক্ষেপ নিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় একদল চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ মুসলিম সমাজে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে আসছেন, যাদের দায়িত্ব হলো ইসলামকে তার মৌলিকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে যুগের ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া ও সীরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ় রাখা। এই মহাত্মন ব্যক্তিদের দ্বারাই আল্লাহ পাক তাঁর

মনোনীত দ্বীন ইসলামকে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন। সুতরাং যেই মুহূর্তে কোন মারাত্মক ফিতনা মুসলিম সমাজে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অপতৎপরতা কিংবা সরাসরি ভুল-ভ্রান্তি থেকে জন্ম নিয়েছে, তখনই ওসব গুণীজন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনমাফিক কর্ম-তৎপরতার মাধ্যমে তা উৎখাত করে দ্বীন-ইসলামের মৌলিকত্বকে সমুন্নত ও সুসংহত রেখেছেন। কিন্তু ফিতনারও শেষ নেই। যুগের পরিবর্তন ও কাফির-বেঈমানদের কূটচাল আর মুসলিম উম্মার অভ্যন্তরস্থ মুনাফিক, অতি-দুনিয়াদার, দুর্বল ঈমানদার কিছু মানুষের আবির্ভাব সর্বদাই হয়ে আসছে। এরাই নতুন নতুন ফিতনার জন্ম দিয়ে উম্মার মধ্যে সৃষ্টি করছে চরম মতানৈক্য ও দ্বীন পালনে মানুষের মধ্যে বিদআতী বিশ্বাস ও মারাত্মক কিছু উপাদান জড়িয়ে দিয়ে, পথভ্রষ্টতা ও দুনিয়া-আখিরাতে ভীষণ ক্ষতির পথ উন্মোচন করছে। এরূপ একটি মতবাদ আজ মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট অংশ তথা ভারত উপমহাদেশে খুব শক্তভাবে শিকড় গেড়ে নিয়েছে। এই মতবাদের নাম 'মওদূদীবাদ'। এ পর্যায়ে আমরা মওদূদীবাদের উপর আর কিছু বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না। আবুল আলা মওদূদী ও তার প্রতিষ্ঠিত 'নতুন ইসলাম' নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমার জানা মতে শতাধিক গ্রন্থ উর্দু ও বাংলা ভাষায় মওদূদীবাদের কুফল ও ভ্রান্তির উপর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় এই মারাত্মক ফিতনাটি আজো সমাজ থেকে উৎখাত হয় নি- বরং এদের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে! আল্লাহ পাক এদের খপ্পর থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

মওদূদী ফিতনার উপর এ প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, এর মূলে আছে আর্থ-রাজনীতিক স্বার্থ। আবুল আলা মওদূদী এমন একটি নতুন মতবাদ গড়ার চেষ্টা করেছেন যে, এরই মাধ্যমে সাধারণ থেকে শিক্ষিত সমাজের সবাই যেনো একথা অন্তরে বিশ্বাস করে নেয় যে, 'আমি যে আক্বীদা ও দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি তা থেকে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মালিক হতে পারবো এবং আখিরাতের জীবনও আমার সুখময় হবে'।

মওদূদী সাহেবের এই 'আধুনিক' চিন্তাধারায় চরম বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের মৌলিকত্ব, আক্বাঈদ, মাযহাব, তাসাওউফ, সুন্নাতের অনুসরণ ও হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত কুরআন শরীফের তাফসীর ইত্যাদি। সুতরাং এসব

ব্যাপার দ্বীন থেকে পাতলানো এবং প্রয়োজনে পাল্টানো ও এমনকি বাদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই! তাই তিনি নিজে ইসলামের ফিকহী জ্ঞানে অপরিপক্ক হয়েও শুরু করলেন অনধিকারচর্চা! তিনি নতুন ফিকহ্ রচনা করলেন। তাফহীমুল কুরআন নামক একটি মনগড়া 'কুরআনের তাফসীর' রচনা করতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে তার এই নতুন চিন্তা-চেতনা ও সংস্কারমূলক কার্যাদি গ্রহণযোগ্য করার দরকার। অন্যথায় সব বৃথা। তিনি তাই ইসলামের ইতিহাস বিকৃতি, সহীহ্ হাদীসকে নকল বলা, নবী-রাসূলদের মধ্যে ভুল-ক্রুটি অন্বেষণ (নাউযুবিল্লাহ্!), সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ভুল-ক্রুটি হয়েছে বলে কটুক্তি ইত্যাদি প্রকাশ-প্রচার করে পাঠকদের নিকট 'যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক, সংস্কারক, মুজতাহিদ' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। নাউযুবিল্লাহ্! মানুষ নাফসানী খাহিশাত অর্জনে এরূপ জঘন্য কাজ করতে পারে! নিজের প্রাণের ধর্মবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতেও দ্বিধাবোধ করে না! মওদূদী সাহেব যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন তা খৃস্টবাদের ক্ষেত্রে পাদ্রী মর্টিন লুথারের নতুন 'প্রটেস্টেন্ট খ্রীস্টবাদ' সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়। আধুনিক যুগের ফিতনা চতুষ্ঠয় তথা ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, মওদূদীবাদ ও সালাফীদের উপর গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধের লেখক তো ঠিক তা-ই মনে করেন: তার লেখার শিরোনাম হলো "প্রটেস্টেন্ট ইসলাম"! তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নব্য-আধুনিকতাবাদী তথাকথিত কিছু 'ইসলামী চিন্তাবিদরা' যা করার চেষ্টা করেছেন তাহলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটি নতুন ইসলামী মতবাদ তৈরী করা যা হবে পুরাতন ও সেকেলে 'মাযহাব', 'তাছাওউফ', 'তাক্বলিদ', 'ফিকহ' ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আবুল আলা মওদূদী সাহেবের 'ইসলামী গবেষণা' নামে মূলত ইসলাম-বিদ্বেষী ও সার্বিকভাবে উম্মার জন্য ক্ষতিকর লেখালেখির উপর আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। যে কোন বইয়ের দোকানে যেয়ে মওদূদীবাদের উপর লেখা যে কোন গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে মওদূদী কিংবা তার জামাআতের বিরুদ্ধে আমার কিছু নেই। আমি আসলে রাজনীতি করি না। সুতরাং কেউ ভাববেন না- রাজনৈতিক

রোষানলে আমি মওদূদীবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছি। বরং মওদূদীবাদ যে সত্যিই এ যুগের ‘মু’তাযিলী ফিতনা’ তা সকলকে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে জানিয়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলমানের কর্তব্য। অন্যথায় পথভ্রষ্টতার বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, মওদূদী মতবাদ যে কোন প্রতিষ্ঠিত মতবাদের মতো অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মতবাদের উপর অপরিপক্ক ব্যক্তি যদি অধ্যয়ন করে তাহলে অতি সহজেই সে তার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। সুতরাং সাবধান! আমরা কেউই ‘নফসে আম্মারার’ প্রবণতা থেকে মুক্ত নই। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আধুনিক যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আরো এক দু'টো শক্তিশালী ‘ফিতনা’ আত্মপ্রকাশ করে পুরো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ‘সালাফিয়্যাহ’ নামক একটি অত্যাধুনিক ফিতনা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই মধ্যপ্রাচ্য-ভিত্তিক নতুন ফিতনা এবং উপরে উল্লেখিত মওদূদীবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। বাস্তবে সালাফী মুভমেন্ট আর মওদূদীবাদ এবং ‘আহলে হাদীস’ ও ‘ওয়াহাবী’ চিন্তাধারার মূলে একই ফিলোসফি বিদ্যমান। আমরা একটু পরই এ ব্যাপারে আলোচনা করবো। তবে প্রথমে ‘সালাফী’ নামক অপেক্ষাকৃত নতুন এই ফিতনাটি কি তা আগে জেনে নিই।

সালাফী ফিতনা

‘সালাফী’ শব্দের অর্থ হলো ‘প্রাথমিক যুগের মুসলমান’। সুতরাং সালাফী শব্দের মধ্যে কোন ফিতনা নেই। কিন্তু আধুনিক যুগে একদল মুসলমান এই সুন্দর শব্দটি ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ অন্যান্য মুসলামদেরকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায় রত আছে। আর এখানেই ফিতনার জন্ম। ‘ফ্রিমেসন’ হিসাবে খ্যাত লা-মাজহাবী মিশরী আলীম মুহাম্মদ আব্দুহ (যিনি ছিলেন জামালউদ্দীন আফগানীর ছাত্র) ও তার অনুসারীরা এই ‘সালাফী’ নামকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। প্রায় শত বছরের পূর্বে এদের আবির্ভাব ঘটে মধ্যপ্রাচ্যে। অতীতের খারিজী, মু’তাযিলী, কারামাতিয়া, মুরযি’ঈ ইত্যাদি বাতিল ফিরকার মতো এদের মৌলিক বিশ্বাস হলো, ধর্মকে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন! অবশ্য তারা নিজেরা খুব বুঝতে পেরেছেন ঠিকই!

সালাফী মতবাদ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি হলেন 'সালাফী' যিনি সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় দ্বীনকে বেশী বুঝেন, তথা সালাফে সালিহীন মহাত্মনরা যেভাবে বুঝেছিলেন এবং আধুনিক যুগের কিছু উলামাও ঐ সালাফে সালিহীনদের মতো। অবশ্য এরূপ কৌশলগত ভ্রান্ত দাবী মূলত ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ ১৪০০ বছরব্যাপী মুসলিম সমাজে অসংখ্য আলীম, যুগ সংস্কারক, মুজাদ্দিদ এবং ইমাম পর্যায়ের মহাত্মন এরা সবাই 'দ্বীনকে ভুল বুঝেছেন', এরূপ উদ্ভট কথা নিশ্চয়ই কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না! কিন্তু সালাফীরা তাই মনে করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হচ্ছে মুজতাহিদ (স্বাধীনভাবে শরীয়তের যাবতীয় মাসআলা মাসাঈল পবিত্র কুরআন-হাদীস চয়ন করে বের করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি) না হলে- সাধারণ মুসলমান, আলীম-উলামা তো অবশ্যই এমনকি ইমাম পর্যায়ের সবার জন্য 'তাক্বলিদ' তথা কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা 'ওয়াজিব'। সালাফীরা এই আক্বীদায় বিশ্বাসী নয়। তারা নিজেরা 'সবাই মুজতাহিদ'! কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু আমাদের নিকট সংরক্ষিত তাহলে 'মাযহাবকে অন্ধভাবে অনুসরণ' কেনো করবো? তাদের এই প্রশ্ন থেকেই ফিতনার জন্ম নিয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়, তথাকথিত 'ইজতিহাদ' করার স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতে ভাবতে অতীতেও অসংখ্য বড় বড় আলীম পথভ্রষ্ট হয়েছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করছি।

তবে আসলে মজার ব্যাপার হলো তারাও তাক্বলিদ করে। কিন্তু চার মাজহাবের ইমামরা তাদের জন্য তাক্বলিদের যোগ্য নন! (নাউযুবিল্লাহ্)। তারা তাক্বলিদ করে পরবর্তী যুগের কিছু 'আধুনিকতাবাদী' লা-মাযহাবী আলিমদেরকে। এদের মধ্যে শীর্ষে আছেন: ইবনে তাইমিয়্যাহ (৬ষ্ঠ হিজরীর ব্যক্তিত্ব), ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী (ঈসায়ী অষ্টম শতকের ব্যক্তিত্ব), আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মদ আব্দুহ, জামাল উদ্দীন আফগানী, শেখ উসাইমিন এবং শেখ নাছির উদ্দীন আলবানী (সবাই বিংশ শতকের

আলীম)। এই লিস্টে একজনও 'সালাফী' নন বরং সবাই 'খালাফী'। সুতরাং তারা খালাফী হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা তাদেরকে ও নিজেদেরকে সালাফী হওয়ার বুলি আওড়াচ্ছেন। জমহুর আলিমদের মতামত অনুযায়ী সত্যিকার সালাফী তারা, যারা হিজরী প্রথম চার শতকের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

উপরোক্ত দাবী সালাফীদের কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তক থেকে জানা গেছে। গত শতকের ১৯৯৩ ঈসায়ী সলে যুক্তরাজ্যের ইপসূইচ নামক শহরে প্রতিষ্ঠিত তাদের 'দাওয়া' অফিস থেকে এই বুকলেট বের হয়। বুকলেটের নামকরণ করা হয়, 'জমিয়তে ইহইয়া মিনহাজুস সুন্নাহ'। অবশ্য সালাফীরা ইবনে তাইমিয়্যার (রাহঃ) ছাত্র ইবনে কাইউম যাওজিয়াকেও (রাহঃ) তাদের ইমাম মনে করেন।

কেনো সালাফী মতবাদ ভ্রান্ত

সালাফীদের আক্বীদাগুলো মুসলিম বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড়ো দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একমাত্র মাযহাব প্রশ্নে তাদের বিশ্বাস বিপরীত হওয়ায় এদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের তথা সুন্নী মুসলমান হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সকল সুন্নী মুসলমানই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী। দ্বিতীয়ত এরা তাছাওউফকে মানে না। এখানেও দেখা যাচ্ছে বর্তমান ও অতীতের অসংখ্য মহাত্মন আলিম-উলামা, ফকীহ, পীর-মাশায়িখ, সুফি-দরবেশ, সালাফে সালিহীন, মুহাদ্দীসিন, ইমাম ও মুজতাহিদরা সবাই এই তাসাওউফকে শুধু মানতেন না, এটা অনুসরণের মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। ইসলামে তাসাওউফ অর্থই হলো রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতা। ইহসান অর্জনের পথ হলো তাসাওউফচর্চা। যে তাসাওউফ মানলো না সে ইহসান অর্জন করলো না, রূহানিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হলো। কিছু কিছু উচ্চ পর্যায়ের আলীমের মতে তাসাওউফ চর্চা ফরযে আইন।

তাফসীরে মাযহারীতে আছেঃ "সুফি বুযুর্গগণ যে শাস্ত্রকে লাদ্দুনী বলেন, তা অর্জন করা ফরযে আইন। কেননা এই শাস্ত্রের ফল হচ্ছে গাইরুল্লাহর জিকির থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে অন্তরের মশগুল

হওয়া, কুচরিত্র থেকে আত্মশুদ্ধি, যেমন অহমিকা, অহঙ্কার, হিংসা, অতি সংসার-প্রীতি, অতি জাঁকজমক-প্রীতি, ইবাদতে অলসতা, অন্যায় কামবাসনা, রিয়া, খ্যাতিলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। এর আরও ফল হচ্ছে সচ্চরিত্রতা গুণে গুণান্বিত হওয়া, যেমন গুনাহ থেকে তাওবাহ করা, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, নিয়ামতের শোকর করা, বিপদাপদে সবর করা ইত্যাদি। এতে সন্দেহ নেই যে, এসব বিষয় মু'মিনের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ থেকেও অধিকতর কঠোর হারাম এবং নামায, রোযা, যাকাত অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কেননা, যে কোন ইবাদত খাঁটি নিয়ত থেকে খালি হলে তা নিষ্ফল। নিয়ত খাঁটি হওয়ার নামই তাসাওউফ" (তাফসীরে মাযহারী; আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (রাহঃ) প্রণীত 'দালাইলুস সুলুক' এর মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত 'ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ' নামক বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৯-২০]।

"(অন্যান্য শাস্ত্র যেমন ফরয) অনুরূপভাবে সুলূক শাস্ত্রও ফরয যা অন্তরের অবস্থাসমূহের শাস্ত্র, যেমন 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর উপর ভরসা করা), খাশিয়ত (খোদাভীতি) এবং রেযা বিল কাযা (আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা)" [তা'লিমুল মুতাকাল্লিমীন, 'ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২০]।

ইমাম গাযালীর সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, তাসাওউফ শাস্ত্র অর্জন করা ফরযে আইন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও (রাহঃ) তাসাওউফ শিক্ষাকে ফরযে আইন সাব্যস্ত করেছেন। (আত্তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতি তাছাওউফ) [ইসলামী তাছাওউফের স্বরূপ, পৃঃ ২০]

তাসাওউফের উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা কি তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দীসে দেহলভী (রাহঃ) বলেনঃ "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেন্দ্রবিন্দু শরীয়ত ও তরীকত। তারা এই দু'টি বিষয়কেই বুজুর্গির উৎস মনে করেন।" (তুহফা ইছনা আশারিয়া) [ইসলামী তাছাওউফের স্বরূপ, পৃঃ ২১]

সুতরাং যে তাসাওউফ শাস্ত্র ছাড়া মানুষের নফসের ইসলাহর কোন সুযোগ নেই, সেটিকে বিদআত বলা কিংবা একে নিয়ে টাট্টা-বিদ্রূপ যারা

করে তাদেরকে কোন মতেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত বলে সাব্যস্ত হতে পারে না।

ফিতনা চতুষ্ঠয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য

উপরে বর্ণিত ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, মওদূদীবাদ ও সালাফী এই চার ফিতনার মধ্যে আশ্চর্য ধরনের মিল বিদ্যমান। এগুলো যে একটা আরেকটা দ্বারা প্রভাবিত তা তো স্পষ্ট। এই সামঞ্জস্যের প্রমাণ হিসাবে তাক্বলিদের কথা বলা যেতে পারে। বর্ণিত ফিতনা চতুষ্ঠয়ের আক্বীদা হলো তাক্বলিদকে অস্বীকার করা। এরা সবাই লা-মাজহাবী। দ্বিতীয়ত এদের সকলেই ইসলামী রূহানিয়্যাত তথা ইলমে তাসাওউফকে অস্বীকার করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই আশআরী কিংবা মাতুরিদী কালাম শাস্ত্রের উপর বিশ্বাসী। হানাফী ও মালিকী মাজহাবের অনুসারীরা সাধারণত ইমাম মাতুরিদীর (রাহঃ) কালাম শাস্ত্রের উপর আস্থাশীল। অপরদিকে ইমাম আশআরী (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশআরী কালামের উপর শাফিঈ ও হাম্বলী মাহজাবপন্থীরা বিশ্বাসী। কিন্তু ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, মওদূদী ও সালাফীরা এই উভয়টির একটিও মানে না। আমল-ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তাদের একে অন্যের মধ্যে মিল দেখতে পাওয়া যায়।

সুতরাং প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় আমি সবাইকে আবারো হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, আজকের যুগের 'নব্য-খারিজী' এই বাতিল ফিরকা চতুষ্ঠয়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আমাদের সবার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে 'নফসে আম্মারা' নামক এক দুশমন এবং তার সখ্যতা বিদ্যমান শয়তানের সঙ্গে। সুতরাং দুনিয়াবী নাফসানী খাহিশাত থেকে উদ্বুদ্ধ উপরোক্ত ফিতনা চতুষ্ঠয়ের প্রচার থেকে কেউই আমরা নিরাপদ নই। তাদের আপাতদৃষ্টিতে 'যুক্তিভিত্তিক' প্রলেপ দ্বারা যে কোন মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হতে পারে। তাদের এই যুক্তির একটি নমুনা এখানে পেশ করে প্রবন্ধের ইতি টানছি।

প্রশ্ন: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে অনুসরণ করেন নাকি 'ইমাম আবু হানীফার' দ্বীনকে অনুসরণ করেন?

এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট এক প্রতারণা। আপনি তো জবাব দিতে বাধ্য যে, আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

দ্বীনকে অনুসরণ করি। তখন ঐ ভ্রান্ত আক্বীদার লোকগুলো আপনার অন্তরে বিষ ঢেলে দিয়ে বলবে: তাহলে মাযহাব অনুসরণ করবেন না- কুরআন-হাদীস অনুসরণ করুন। মাযহাব অনুসরণ মানে ইমামের অনুসরণ যা শিরক!!

দেখলেন তো তাদের কূটতর্কের নমুনা! তবে হ্যাঁ, আপনি যদি মাজহাবের অর্থ কি তা কিছুটা হলেও জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারবেন: আরে মিয়া, তোমারও কী ক্ষমতা আছে দ্বীনের সবকিছু পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে বের করে সঠিকভাবে অনুসরণ করার? আমার ইমাম আমাকে কুরআন-হাদীস থেকেই সবকিছু বের করে দিয়ে গেছেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত আমার মাতো কোটি কোটি মুসলমান দ্বীনকে সহজ এবং সঠিকভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হন। তোমার মতো আমি 'ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনে জাওজিয়্যাহ, আফগানী, আলবানী, বিন বায, উসাইমিন, বিলাল ফিলিফসদের ইত্তিবা বা অনুসরণ করি না। কারণ এরা সবাই খালাফ ও নন-মুজতাহিদ! আমি যাকে অনুসরণ করি তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ, মুজতাহিদ, অলিআল্লাহ, সালাফে সালিহীনের অন্তর্ভূক্ত ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রাহঃ)। তিনি দ্বীনকে তুমি ও তোমার ঐ আধুনিকবাদী আলীমদের থেকে ঢের বেশী বুঝতেন। আমি মাযহাবী আর তুমি হলে লা-মাযহাবী। লা-মাযহাবী মানে পথভ্রষ্ট! ঘোমরাহ্ এমনকি বোকা বললেও কটুক্তি হবে না!

প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে পাঠকদের প্রতি একটি আবেদন জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সবাই যদি উক্ত দলসমূহের নিকট থেকে লিখিত বা বক্তৃতায় প্রাথমিক যুগের মহাত্মনদের বিরুদ্ধে কোন কিছু শ্রবণ করি, তাহলে আমরা একটি মূল নীতি অনুসরণ করতে পারি। ফিতনা সৃষ্টিকারী ওসব ভ্রান্ত গোষ্ঠি প্রায়ই তাদের চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদাকে সমর্থনযোগ্য করার লক্ষ্যে বলে থাকে, 'কুরআনের এই আয়াতে এরূপ বলা হয়েছে কিংবা এই হাদীসে এটা লিপিবদ্ধ আছে অথবা এই হাদীস গরীব, জাল ইত্যাদি'। তারা এভাবে 'দলীল' উপস্থাপন করলে আমাদের উচিৎ জবাবটা এভাবে দেওয়া: 'দেখুন ভাই, খাইরুল কুরুনের সময়কার মহাত্মন সাহাবায়ে কেরাম, তা'বিঈন, তাবে তা'বিঈন তথা সালাফে সালিহীনদের সম্মুখেও আপনার বর্ণিত ঐসব

আয়াত ও হাদীস শরীফ মওজুদ ছিলো। তাঁরা যেভাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন সেভাবে আপনি আসলে বুঝতে পারেন নি। গণ্ডগোলটা এখানেই। সুতরাং কুরআন-হাদীসকে দলীল বানিয়ে আপনার নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন না।' এ সম্পর্কে দু'টি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এখানে তুলে ধরলে ব্যাপারটি সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাহ:) [৬১/৬৩ - ১০১ হি.] এর নিকট তাক্বদীরের উপর অবিশ্বাসকারী একদল লোক এসে বললো, দেখুন- কুরআন শরীফের এই এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখা আদৌ জরুরী নয়। তিনি এর জবাবে বলেছিলেন:

لقد قرأوا ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كلّه بكتابٍ وقدرٍ

অর্থাৎ: সাহাবী ও তাবিঈনগণ পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াতও পড়েছেন যা তোমরা পড়েছো। কিন্তু তাঁরা সেগুলোর মর্ম বুঝেছেন, আর তোমরা বুঝো নি। তাঁরা সে সকল আয়াত পড়েও তক্বদীরের স্বীকৃতি দিয়েছেন। [দরসে কুরআন সিরিজ, খণ্ড ৩০, মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ, পৃ: ৩৪৪-৩৪৫]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রাহ:) [৯৭১-১০৩৪ হি.] একটি চিঠিতে বলেন:

"হে সত্য পথের পথিক! মনে রেখো, কুরআন-হাদীসের আলোকে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস দুরস্ত করা জরুরী। হক্কানী আলিম সমাজ কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে তা থেকে যে পদ্ধতিতে আক্বীদা-বিশ্বাস আহরণ করেছেন, আমাদেরকে সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মনে রেখো আমাদের বুঝা যদি তঁদের বুঝার বিপরীত হয়, তাহলে আমাদের বুঝ গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত বিদআতপন্থী ও গোমরাহ লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তি আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাককে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্যে কুরআন-হাদীসেরই বরাত দেয়। অথচ সেগুলো কুরআন-হাদীস থেকে বহু দূরে।" [মাকতুব নং ১৫৭ - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৩৪৫]

সবশেষে আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আবারো আকুল আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেনো আমাদেরকে আধুনিক 'প্রটেস্টেন্ট ইসলামপন্থী', লা-মাজহাবী, পথভ্রষ্ট এসব নব্য খারিজীদের খপ্পর থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

সিলেট, ২০/৬/১০ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফিরে যেতে হবে আমাদের মূলে

উনবিংশ শতাব্দিতে একদল আধুনিকতাবাদী 'খ্রিস্টান' পাদ্রী ধর্মভিত্তিক 'আধুনিকতাবাদ' মুভমেন্টের জন্ম দিয়েছিলেন। সমসাময়িক আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, থিওরী ও বস্তুবাদী দর্শনের চাপের মুখে খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসকে নতুন ধাঁচে সাজানো ছিলো এই মুভমেন্টের মূল উদ্দেশ্য। ১৯০৭ সালে তখনকার পোপ পায়াস-১০ এই মুভমেন্টের নামকরণ করেছিলেন 'মডার্নিজম'। ইউরোপের শক্তিশালী মূল খ্রিস্টান শক্তি হলো 'রোমান ক্যাথোলিক চার্চ'। খ্রিস্টধর্মের মৌলিক কিছু বিশ্বাস বা আক্বীদায় আগে থেকেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে আসছিল। এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মকালেও ঈসা (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ও বিশেষ করে ঐশীগ্রন্থ বাইবেলে অনেক মানব-রচিত উপাদান অনুপ্রবেশ করে বসেছিল। বর্তমান যুগের কিছু খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ এটা প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মোট লেখার অন্তত ৬০ শতাংশ মানুষের মনগড়া উক্তি। এক কথায় হক্বকে মুছে সেখানে বাতিলকে ঢুকানো হয়েছে। ফলে সেই দেড় হাজার বছর আগে থেকেই খ্রিস্টধর্মে বিভিন্ন যুগের চাপে আক্বীদাগত পরিবর্তন একরকম বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যথায় একটি ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টবাদ ঠিকে থাকতে পারতো না। আমি এই প্রবন্ধের শুরুতে খ্রিস্টবাদের উপর অনেক কথা বলার বিশেষ কিছু কারণ আছে যা একটু পরই পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হবে।

খ্রিস্টান আধুনিকতাবাদী মুভমেন্টের ফলে ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে। এ থেকে বৈষয়িক দিকে পুরো পশ্চিমা বিশ্ব উপকৃত হয়েছে তা বলার কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। যা হয়েছে তাহলো, ঐশীধর্ম হিসাবে অত্যল্প যেটুকু মৌলিকতা খ্রিস্টধর্মে অবশিষ্ট ছিলো তা-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। কোন সত্যধর্মের উপর বিজ্ঞান ও প্রযৌক্তিক উন্নয়ন সহায়ক শক্তি হতে বাধ্য। ক্ষতির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ক্ষতি তখনই হবে যদি সেই ধর্মের মূলে বিজ্ঞান-দর্শন-যুক্তিবাদ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে

আঘাত হানা হয়। পাঠকরা এখনই বুঝতে পারবেন, খ্রিস্টবাদের বারোটা বাজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে কেন এতোক্ষণ আলোচনা করেছি। খ্রিস্টান ওসব আধুনিকতাবাদীদের অনুসরণ ও প্রভাবে পড়ে একদল 'মুসলমান' চিন্তাবিদ ইসলামকে অনুরূপভাবে আধুনিক ধাঁচে সাজানোর চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন। এরা মনে করেন, যদি ইসলামী ঈমান-আক্বীদায় ইজতিহাদী পরিবর্তন করা হয় না, তাহলে একুশ শতকে একটি ধর্ম হিসাবে ইসলাম ঠিকে থাকতে হিমশিম খাবে। খ্রিস্টান ওসব চিন্তাশীলদের মতো এরাও তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের কল্পিত চাপ ইসলামের উপর পতিত হচ্ছে মনে করে এমন দরদী সেজেছেন। কিন্তু প্রকারান্তরে এদের এই ধারণায় মৌলিক কিছু গড়বড় আছে যা তারা স্বেচ্ছায় না হয় অনিচ্ছায় উপেক্ষা করে যাচ্ছেন।

যে কষ্টিপাথরে স্বর্ণকে যাচাই করা হবে, আগে দেখতে হবে সেই কষ্টিপাথর কতটুকু সঠিক বা যথার্থ। বিজ্ঞান ও দর্শনের দোহাই দিয়ে মুসলিম আধুনিকতাবাদীরা ইসলামী আক্বাঈদের উপর ইজতিহাদ করবেন ও নতুন যুগের সাথে তাল-মিলিয়ে নতুনভাবে সাজাবেন। কিন্তু যে বিজ্ঞান ও দর্শন এই মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ, সে-ই বিষয় দু'টো ও এর দিকনির্দেশনা কতটুকু যথার্থ তা-কি তারা তলিয়ে দেখছেন? অর্থাৎ কষ্টিপাথর সঠিক কি না তা আগে জানার প্রয়োজন নয় কি? বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, উভয় জ্ঞানান্বেষা মৌলিকভাবে পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের অনেক তথাকথিত 'ফ্যাক্টস' বা সত্য অনেক যুগ পর্যন্ত 'বিশ্বাস' করার পর বিজ্ঞানীরাই নতুন আবিষ্কার ও থিওরী প্রতিষ্ঠার ফলে ওগুলো 'মিথ্যা' বা নির্ভুল নয় বলতে আজ বাধ্য হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ গাণিতিক স্যার আইজাক নিউটনের মহাকর্ষ থিওরীর কথা বলা যায়। তিনি ১৬৮৭ সালে 'ম্যাথেমেটিক্যাল প্রিন্সিপাল্স অব নেচারেল ফিলোসফি' নামক গ্রন্থে মহাকর্ষের থিওরী প্রকাশ করেন। তিনি অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিলেন মহাকর্ষ কী জিনিস। সেই থেকে বিংশ শতাব্দির শুরু পর্যন্ত দীর্ঘ চার শতাধিক বছর যাবৎ নিউটনের থিওরীকে বিনাপ্রশ্নে সাধারণ মানুষতো বটে, সকল বিজ্ঞানীও মেনে নিলেন। কিন্তু ১৯১৬ সালে জার্মান ইয়াহুদী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন 'জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি' প্রকাশ করে

জানিয়ে দিলেন যে নিউটনের থিওরী মৌলিকভাবে সঠিক নয়! তার এই ‘দুঃসাহসিক’ পদক্ষেপ সাধারণ মানুষ থেকে পুরো বিজ্ঞানমহলে বিরাট চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি করলো। কিন্তু দেখা গেল, তার এই থিওরী নির্ভুল। পাঠকরা হয়তো ভাবছেন, আইনস্টাইনের থিওরী তাহলে চুড়ান্ত সত্য! মোটেই নয়। কারণ, আজ থেকে আরো ৫০০ বছর পর আরেক বিজ্ঞানী এসে এই থিওরীর মধ্যে ভুল বের করবেন না বলে কোন নিশ্চয়তা নেই।

আমরা উপরে দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাকর্ষ থিওরীর কথা বলেছি মাত্র। অবশ্যই বিজ্ঞানের অন্যান্য সব ফিল্ডে অনুরূপ পরিবর্তনশীলতা বিদ্যমান। আজো এমন কোন থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয় নি- যা সবদিক থেকে ‘এবস্যুলুট ট্রুথ’ বা মহাসত্য বলা যায়। তাহলে এটা সহজেই বুঝার ব্যাপার যে, বিজ্ঞান মূলত একটি ডাইনামিক বা পরিবর্তনশীল জ্ঞানকে বুঝায়। আর ধর্মের মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে এই অচেনা কষ্টিপাথরের উপর নির্ভর করে ‘পরিবর্তন’ আনয়ন শুধু ক্ষতিকর নয়- বিরাট বিপজ্জনক হবে এটা নিশ্চিত। দুঃখের বিষয়, ওসব ‘আধুনিকতাবাদী’ মুসলমানদের অপরিপক্ক চিন্তা-গবেষণা ও প্রচারের ফলে পুরো মুসলিম উম্মায় বিরাট প্রভাব পড়ে ইতোমধ্যেই সর্বনাশের মাত্রা অনেকদূর চলে গেছে। আমি অবশ্য অবশ্যই একথা বলছি না যে, ধর্মীয় স্বকীয়তা রক্ষার্থে বিজ্ঞান ও বিশেষকরে প্রযুক্তিকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করতে হবে। বরং আমি মনে করি আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আকড়ে ধরা আমাদের জন্য ফরযে আইন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে আমাদের ধর্মবিশ্বাসে কোন আমূল পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন তা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের আক্বাঈদের সঙ্গে মোটেই সংঘাতময় নয় বরং যতো দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আর এটাতো স্বাভাবিকই। কারণ, যারা বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন মুসলিম স্বর্ণযুগে শত শত মুসলমান বিজ্ঞানীদের হাতেই এই বিষয়টি চরম উৎকর্ষলাভ করে। সে যুগে বিজ্ঞানের অনেক থিওরীই নির্ভুল ছিলো না একথা স্বীকার করেও ইতিহাসের প্রমাণ যে, ইসলামের সঙ্গে ওসব অপেক্ষাকৃত ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিও সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। সুতরাং এ যুগে এসে বিজ্ঞানের অনেক থিওরী নির্ভুলের

কাছাকাছি হয়ে কিভাবে মহাসত্যের ধর্ম ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে? কখনও নয়।

বিজ্ঞান থেকেও আরো বেশী পরিবর্তনশীল 'যুক্তিবিদ্যা' নির্ভর আরেক জ্ঞানান্বেষার নাম হলো দর্শন। মানবিক যুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। মূলত লজিক বা যুক্তি নামক ব্যাপারটি আসলে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন 'থিওরীর' উপর নির্ভরশীল নয়। বলা হয়, লজিকের ভিত্তি কতগুলো উক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন বিশেষ উক্তি যদি সত্য না হয় তাহলে ফলাফল বা কনক্লুশন যুক্তিসম্মত হয়েও অসত্য হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত: "সকল স্তন্যপায়ী জন্তু চতুষ্পদী; সকল মানুষ স্তন্যপায়ী; সুতরাং সকল মানুষ চতুষ্পদী!"; এটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি কিন্তু ভুল ফলাফল। লজিকের এই মৌলিক নির্ভুলহীনতাই মানবিক যুক্তির সীমাবদ্ধতাকে প্রমাণ করে। সুতরাং যে বিদ্যার মূলেই বিশুদ্ধতার অভাব সেটির উপর নির্ভর করে আমরা কিভাবে আমাদের ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সংস্কার করতে দুঃসাহস দেখাতে পারি?

দর্শনের ক্ষেত্রে এটা ছাড়াও আরো একটি মৌলিক ব্যাপার আছে যা উপরে বর্ণিত বিজ্ঞানের ডাইনামিজম এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেরূপ ইতিহাসব্যাপী তার রূপ পরিবর্তন করে আসছে ঠিক তদ্রূপ দর্শনও তার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই রদবদল করে থাকে। এক কথায়, দর্শনও একটি ডাইনামিক বা পরিবর্তনশীল জ্ঞানের নাম। ধ্রুব সত্য কোন দর্শন আজো কেউ উপহার দিতে পারে নি। আমরা নিশ্চিত জানি ইতিহাসব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে অপরের বা আগের এক বা একাধিক দার্শনিকের মতামত ও থিওরীকে খণ্ডন করেছেন। এই আধুনিক যুগে এসে বার্টরান্ড রাসেলের মতো বড়ো একজন দার্শনিকের একটি উক্তি থেকে কথাটি প্রমাণিত হবে। রাসেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্টরী অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি' এর ৭০১ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "Even if (as I myself believe) almost all Hegel's doctrines are false, ..."। অর্থাৎ, "যদিও আমি (যা আমি বিশ্বাস করি) হেগেলসের প্রায় সবগুলো মতবাদ ভ্রান্ত, ..." পাঠকদের

অবশ্য জানা আছে হেগেল ছিলেন 'ভাববাদী' দার্শনিক আর রাসেল সম্পূর্ণ নাস্তিক 'বস্তুবাদী' দার্শনিক। কলমের এক খোঁচায় হেগেলের মতো দার্শনিকের সব গবেষণা ভুল বলে তিনি উড়িয়ে দিলেন। দর্শনের ক্ষেত্র ও দিকনির্দেশনা এরূপই নড়বড়ে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রাণের বিশ্বাস-আক্বীদাকে জলাঞ্জলি দেবো - তা কী কখনো যুক্তিসম্মত হতে পারে? মোটেই নয়।

একটি সাধারণ প্রবন্ধের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যিকার স্বরূপ বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয়- তথাপি, পাঠকদেরকে এটুকু বলার চেষ্টা করছি যে, এই উভয় জ্ঞানান্বেষায় সর্বদাই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। মোটকথা যে কোন মুহূর্তে এই উভয়বিদ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা এদের কিছু 'থিওরীর' কারণে দ্বীনের মৌলিক বিষয়বস্তুর সংস্কার প্রয়োজন মনে করা আসলে বাতুলতা মাত্র। আসলে এখন আমদেরকে 'ডেমেজ লিমিটেশন' নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের নিকট-পূর্বসুরী ও সমসাময়িক কিছু ইসলামী চিন্তাশীল ঐ উনবিংশ শতকের পাদ্রীদের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের চাকচিক্যের ধান্ধা হেতু মারাত্মক ভ্রমে পড়েছিলেন এবং আছেন। এদের ক্রিয়াকলাপ হেতু আজ পুরো মুসলিম উম্মায় বিপর্যয় নেমে এসেছে ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে। চৌদ্দশত বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী আক্বায়ীদের উপর মানুষের অটল-অবিচলতার মধ্যে ভাটা পড়েছে এসব দরদীদের লেখা ও কার্যকলাপের দরুন। আমাদের চতুর্দিকে আজ কি হচ্ছে একটু তলিয়ে দেখলেই কথাটি স্পষ্ট হবে।

মুসলিম উম্মাহর করুন চিত্র বুঝিয়ে বলার উপেক্ষা রাখে না। আজকের সুশিক্ষিত মুসলিম সমাজের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে। কলেজ-ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে-আসা ছাত্র-ছাত্রীদের আপাদমস্তক তলিয়ে দেখুন। এদের লেবাস সম্পূর্ণ ইয়াহুদী-খৃষ্টান-নাস্তিকদের মতো তো আছেই- কিন্তু এরচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো এদের ঈমান-আমলে দারুণ ঘাটতি- এমনকি তা নিভু-নিভু অবস্থা! অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী 'দর্শন' পড়ে ডিগ্রী দিয়ে থাকেন। আর যে দর্শন তাদের পড়ানো হয় তা ঐ পশ্চিমা সদা-বিবর্তনশীল চরম যুক্তিবাদী নাস্তিকদের মনগড়া দর্শন। বলতে পারেন, এই দর্শনে অনেক ভালো নীতি-নৈতিকতার বিষয় আছে যা থেকে শিক্ষার্থীরা

উপকৃত হতে পারে। আমিও এ কথার উপর একমত। কিন্তু যে দর্শন মূলেই ধর্মবিরোধী চরম বস্তুবাদ ও প্রকৃতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তা থেকে যতোই সুন্দর সুন্দর নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে উত্তম কথা বেরিয়ে আসুক না কেন, এতে তেমন সুফল পাওয়া যাবে না। এর কারণ হলো, অতি সাধারণ কোন মানুষকে যদি ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কথা বলা হয়- তাহলে সে-ও তা অনায়াসেই সনাক্ত করে দিতে পারবে। সুতরাং নীতি-নৈতিকতা শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে অনেক ক্লেশ-কষ্ট-অর্থের বিনিময়ে ভার্সিটিতে পাঠিয়ে পশ্চিমা নাস্তিকদের সৃষ্ট মনগড়া দর্শন শেখানোর মধ্যে কী-বা সুফল থাকতে পারে? এসব ব্যাপার তো আমাদের সত্যধর্ম ইসলামই শিক্ষা দেয়। শুধু তা-ই নয়, ইসলামী চরিত্রদর্শন সর্বোৎকৃষ্ট দর্শন বলে স্বীকৃত।

মানবজীবনকে স্বার্থক ও সফল করতে যেয়ে ইসলামী চরিত্র দর্শনের অনুসরণের চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারে না। এই দর্শন দ্বারা শুধু দুনিয়ায় নয় আখিরাতের অনন্ত জীবনকেও পরম সুখময় করা সম্ভব। আর সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা হলো, ধর্ম-দর্শন থেকে শিখে ওসব নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা 'এ্যথিক্স' বা নীতিশাস্ত্র গড়ে তুলে সুন্দর-সুন্দর কথা বলেন সত্যি কিন্তু নীতি-বহির্ভূত পন্থায় কেউ তার জীবন পরিচালনা করলে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে বললেও, আখিরাতে যেয়ে এর জবাবদিহি করতে হবে সেকথা তারা বলেন না। সুতরাং এসব ব্যাপার শিখেও শিক্ষার্থীরা চরম নীতিবিরুদ্ধ জীবন-যাপন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এর কারণ কি? কারণ হলো ঐ শিক্ষিত ব্যক্তিও অভ্যন্তরীণ অনেক খারাপ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত হন নি। কারণ তার দর্শন তাকে এটা বলেনি কিভাবে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে হয়। এটা ইসলাম ও ইসলামী তাছাওউফ শিক্ষা দেয়। ভালো নীতি-নৈতিকতার কথা বলার সাথে সাথে তা অনুসরণের উত্তম পন্থাও ইসলাম শিক্ষা দেয়- শিক্ষা দেয় এটাও, এই দুনিয়ায় খারাপ কাজ করে সেরে গেলেও, পুলিশ, র‍্যাব আর বিচার-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলেও, আল্লাহর দরবারে শেষ বিচারের দিন রেহাই নেই।

সুতরাং ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পশ্চিমা এসব বাজে জিনিস অধ্যয়ন শেষে আমাদের সোনার ছেলেমেয়েদের মন-মস্তিষ্কে ঈমান-আক্বীদা অনড়

অপরিবর্তিত অবস্থায় অক্ষুণ্ন থাকবে, তা কী আশা করা যায়? প্রশ্ন হচ্ছে এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের পথ আছে কী? আমি যেহেতু সর্বদাই 'আশাবাদী' তাই বলবো, পথ নিশ্চয়ই আছে। আমাদেরকে আমাদের মূলে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর মূলে যাওয়ার অর্থ, প্রাথমিক তিন সর্বোত্তম যুগের (খাইরুল কুরুনের) প্রতি ফিরে তাকানো ও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা। অনেকে এই কথাটুকু 'বেকওয়ার্ড' উক্তি মনে করতে পারেন। কিন্তু ইসলামের মৌলিক ঈমান-আক্বাঈদকে শক্ত করে ধরে ইলমে তাছাওউফের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মশুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন পথে আমাদের জীবন, দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণকর করে তোলার কোন উপায় নেই। আর যারা ভাবেন, খ্রিস্টান ঐ মর্ডানিস্টদের মতো ইসলামী ঈমান-আক্বাঈদে ইজতিহাদী পরিবর্তন জরুরী তারা বিরাট ভ্রান্তিতে আছেন।

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।
১৬ জুন ০৯ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞান ও পুনর্জাগরণ

মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

দর্শন ও বিজ্ঞান দু'টি একক স্বতন্ত্র বিষয়। তবে বর্তমানে এ দু'টোকে কোনো কোনো দর্শনে আলাদা করে দেখা হয় না। প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বজনীন যে মতবাদটি আজ শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে মানুষের মননে স্থান করে নিয়েছে তা হলো 'যুক্তিবাদ'। যুক্তিবাদের মূলে কিন্তু বিজ্ঞান। এ কারণে এই দার্শনিক মতবাদটি বিজ্ঞানসম্মত বলা হয়। যুক্তিতর্ক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মানদণ্ডে জ্ঞানার্জনকেই যুক্তিবাদ বলা চলে। ভাব বা ইমোশন থেকে উদ্ভূত কোনো 'ধারণা' (তা যতোই সত্য বলে মনে হউক না কেন) যুক্তিবাদে গ্রহণযোগ্য নয়।

যুক্তিবাদের দু'টি শাখা আছে। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যেহেতু সিস্টেমেটিক (সাংশ্রয়িক বা প্রণালীবদ্ধ) লজিক (যৌক্তিক) ও গাণিতিক উপায়ে অর্জিত, তাই এটা যুক্তির মানদণ্ডেও আসে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত থিওরীকে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান হওয়ায়, যুক্তিবাদী দর্শনের আওতাভুক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মানবীয় নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক-বৈষয়িক প্রগতি প্রভৃতি যুক্তির মানদণ্ডে উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত করাও যুক্তিবাদের একটি বড় লক্ষ্য। যুক্তিবাদ যদি তা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শনের সাথে কতটুকু মিল বা অমিল বিদ্যমান? এ প্রশ্নের জবাবে বলবো, যুক্তিবাদের বিজ্ঞানসম্মত দিকটির সাথে ইসলামী দর্শনের কোনো সংঘাত নেই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জতগকে জানা-চেনা মূলতঃ ইসলামই পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার, সমৃদ্ধি, উৎকর্ষ ও জনপ্রিয় করেছে। এ কথাটি কোনো ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো সংঘাত নেই। তাই জোর করে এটা বলা যায়, যুক্তিবাদের বৈজ্ঞানিক শাখা ইসলামকে কোনো ক্রমেই ক্ষতি করে নি, বা করতে পারবে না। মূলত ইসলামই যুক্তিবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠায় এ শাখাটিকে সংযুক্ত করতে

সহায়ক ছিলো। সপ্তদশ দশকে আধুনিক যুক্তিবাদের (রেশনালিজম) প্রতিষ্ঠাতারা তৎপূর্বে ইসলামী বিজ্ঞান হতে প্রভাবিত পশ্চিমা রেনেসাঁ থেকেই খোরাক গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তি, লজিক, গণিত ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে জাগতিক জ্ঞানার্জন করার সঠিক পদ্ধতি তখনকার মুসলমানরাই পৃথিবীকে শিখিয়েছিলেন। এ সত্য শত শত বছর অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত থাকলেও, আজ আর তা গুপ্ত নয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে শত শত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কথা আজ আমরা জানতে পারছি। মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও কেউ কেউ বলতেন, ইসলামে কোনো দর্শন নেই! আর এই প্রবক্তারা সবাই অমুসলিম ছিলেন না।

ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। পবিত্র কুরআন শরীফে এমন কোনো তথ্য নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে। এ থেকেই কুরআনের ঐশীসূত্র অমুসলিমরা পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যুক্তিবাদে বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করা ইসলামী দর্শনের সাথে কোনো সংঘাত সৃষ্টি করবে না। তবে এর অপর শাখার সাথে অমিল আছে বৈ কি।

বিজ্ঞান মানুষকে নৈতিকতা, জীবনের মূল্যবোধ প্রভৃতি মানবীয় অপরিহার্য গুণাবলী শেখায় না। এটা শিক্ষা দেওয়া বিজ্ঞানের কাজও নয়। যুক্তিবাদও এ ক্ষেত্রে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তির মানদণ্ডে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ভালো ও মন্দকে আলাদা করা হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মন্দটি পরিহার করা এবং ভালোটি গ্রহণ করে মানবিক উত্তম চরিত্র-গঠনের সঠিক পদ্ধতি যুক্তিবাদ দ্বারা স্থাপিত হয় না। যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, সেক্যুলার সমাজ প্রভৃতি আধুনিক যুগের বুদ্ধিভিত্তিক জোয়ার এবং ইসলামী দর্শনের সাথে সংঘাত ও সামঞ্জস্যতার ইতিবৃত্ত এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করবো। তারপর একবিংশ শতকে ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে দর্শনে ইসলামী ভাবধারা, আকীদা ও ঈমানী বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

(ক) রেশনালিজম বা যুক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

রেশনালিজমের জন্ম অনেক আগে। বলতে গেলে দর্শনের জন্মের সময়ই এ থিওরীটি চিন্তাশীল মনীষীদের মননে ক্রিয়া করেছে। জগত, সমাজ, মানবজীবন সম্পর্কে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই ও চিন্তা করা মানুষের একটি মৌলিক স্বভাব। সুতরাং মানবেতিহাসে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, যে কোনো অবস্থার কারণ ও পরিণতি বিবেচনা করা ও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ সর্বদাই বিদ্যমান ছিলো। তবে আধুনিক যুগে (চতুর্দশ শতাব্দির শুরু থেকে) এই 'যুক্তিবাদ' একটি নতুন রূপ ধারণ করে। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। এই একই সময় খ্রিস্টান (রোমান ক্যাথোলিক) চার্চের শক্তি ও প্রভাব ছিলো প্রচণ্ড। ইসলামী দুনিয়া থেকে আগত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের রৌশনীকে খ্রিস্টান চার্চ শত শত বছর যাবৎ পাশ্চাত্য জগতে প্রতিবিম্ব হতে দেয় নি।

শেষ পর্যন্ত মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) নামক জার্মানীর এক সাহসী পাদ্রি প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনি ক্যাথোলিকদের অনেক মৌলিক বিশ্বাসকে উৎখাত করতে অগ্রসর হলেন। বিশেষ করে তখন প্রচলিত ধর্মের নামে একটি জঘন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। আর এ দুর্নীতিটি ছিলো খ্রিস্টান কনফেশনের (পাপের অপরাধ স্বীকারোক্তির) মধ্যে। যে কোনো লোক টাকার বিনিময়ে একজন পাদ্রির কাছে এসে জীবনের সব পাপের কথা প্রকাশ করে স্বর্গের সার্টিফিকেট নিয়ে যেতো! এতে চার্চের অর্থের ভাণ্ডারে বিরাট অঙ্কের টাকা জমা হতে থাকে। জার্মানির একটি শহরের প্রধান পাদ্রিরা (আর্চবিশপ) এই সার্টিফিকেট দানের প্রচার শুরু করলেন। এমনকি এগুলো 'বিক্রি' থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য জোহান টেজেল (১৪৬৫-১৫১৯) নামক এক পাদ্রিকে নিযুক্ত করা হলো। এ পাদ্রি শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্বর্গের সার্টিফিকেট দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা আরম্ভ করলেন। টেজেল যখন সেক্সোনী নামক এলাকায় আসলেন তখন মার্টিন লুথার তাঁর প্রখ্যাত 'নোটিশ' শহরের প্রাসাদের চার্চে টাঙ্গিয়ে দেন। এ নোটিসে লুথার রোমান ক্যাথোলিক চার্চের বিরুদ্ধে ৯৫টি অভিযোগ

উপস্থাপন করেন। এ ঘটনা **৩১** অক্টোবর **১৫১৭** সালে সংঘটিত হয়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে এ তারিখ থেকেই প্রটেস্টেন্ট চার্চের সূচনা হয়েছিলো।

নোটিসে বর্ণিত অভিযোগগুলো দ্রুত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্যাথোলিক চার্চের চিন্তা-চেতনায় এক বৃহৎ হৈচৈ ও বিতর্ক শুরু হয়। মার্টিন লুথারের মৃত্যুর পর থেকেই পশ্চিমা সমাজে প্রটেস্টেন্ট চার্চ শক্তিশালী হতে থাকে। একই সময় মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা ইউরোপে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে এবং রেনেসাঁর জন্ম দিতে সহায়ক হয়।

ইউরোপে রেনেসাঁর জন্মদাতা হিসেবে যার নাম বেশী শোনা যায় তিনি হচ্ছেন পোলিশ (পোল্যাণ্ডের অধিবাসী) জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)।

কোপারনিকাসের জন্মের সত্তুর বছর পর তাঁর কালজয়ী বৈজ্ঞানিক থিওরী "অরবিটাম সেলেস্টিয়াম" প্রকাশিত হয়। এ থিওরীতে তিনি এতো-কাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত সৌরজগতের পৃথিবী-কেদ্রিকতা উড়িয়ে দেন। তিনি সূর্যকেই সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রমাণ করেন ও পৃথিবীসহ সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ এর (সূর্যের) চতুর্দিকে ভ্রমণ করে বলে দেখিয়ে দেন। নতুন এ থিওরী তৎকালীন চার্চের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ চার্চ বিশ্বাস করতো এ পৃথিবীর চতুর্দিকে শুধু সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহ নয়, সমগ্র নভোমণ্ডলের যাবতীয় তারারাও ঘুরে বেড়ায়। চার্চের বিশ্বাস ছিলো, পৃথিবীটাই জগতের কেন্দ্রবিন্দু! বলাই বাহুল্য এরূপ কোনো ধারণা মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলো না।

কোপারনিকাসের মতো থিওরী সরাসরি কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীর কাছ থেকে না আসলেও (এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য এখনো জানা যায় নি) মুসলিম কোনো বিজ্ঞানী কোনোদিন বলেন নি, সৌরজগতের ব্যাপারে চুড়ান্ত জ্ঞান অর্জিত হয়ে গেছে। বিশেষ করে ইসলামের ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক যে কোনো ব্যাপারেই ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে চুড়ান্তভাবে বিশ্বাস করা ইসলামী চিন্তা-চেতনায় কখনো ভিত্তি স্থাপন করে নি। পক্ষান্তরে খ্রিস্টবাদে পৃথিবীকেন্দ্রিক

বিশ্বের ধারণা ছিলো অপরিবর্তনীয়। এর বিরুদ্ধে কোনো মতবাদ ছিলো অচিন্তনীয়, এমনকি ধর্মদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত। কোপারনিকাসের থিওরীর বিরুদ্ধে খ্রিস্টান পাদ্রিদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চিরতরে খণ্ডন করতে চার্চ ব্যর্থ হয়। এর কারণ হলো থিওরীটি সম্পূর্ণ বাস্তব বিরোধী ছিলো না। এর মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকলেও কিছু বিষয় ছিলো যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গণিতের মানদণ্ডে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ থিওরী থেকেই পশ্চিম ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় জোহান্স কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) প্রমুখ বিজ্ঞানী চার্চের সাথে সংঘাত যাতে না হয়, সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে বিজ্ঞানচর্চা করেন। পরবর্তীতে প্রেটেস্টেন্ট চার্চের শক্তি বৃদ্ধির সাথে বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রকাশ্যে শুরু হয়। অবশ্য অনেকে এ কারণে চার্চের ক্ষুব্ধতা থেকে রেহাই পান নি। গ্যালিলিও গ্যালিলাই এর মতো বিজ্ঞানীও জীবনের শেষ বছরগুলো ঘরবন্দী অবস্থায় কাটিয়েছেন। মধ্যযুগের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক মুক্তচিন্তার বিকাশের সাথে সাথে পাশ্চাত্যে দর্শনেরও ভাবধারা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ইসলামী জ্ঞানতাপসদের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রিক দার্শনিকদের (বিশেষ করে সক্রেটিস (মৃ. খৃ,পূ. ৩৯৯), এ্যারিস্টটল (খৃ,পূ. ৩৮৪-৩২২), প্লেটো (খৃ,পূ. ৪২৮-৪২৩)) চিন্তা-চেতনায় রদবদল, সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন শুরু হয়।

প্লেটোর মৃত্যুর কয়েক শতক পর নিওপ্লেটোনিজম থেকে এ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা), স্কেপটিসিজম (সংশয়বাদ), এ্যাপিকিউরিয়ানিজম (ভোগবাদ), পানথেজিম (সর্বেশ্বরবাদ) প্রভৃতির উপর দার্শনিকদের অক্লান্ত চিন্তা-চর্চার পর শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় নবজাগরণের সুবাদে, আধুনিক যুগের শুরুতে এসে দার্শনিকরা ধর্মবিরোধী মতবাদ প্রকাশ করতে থাকেন।

তবে এর আগেকার অর্থাৎ রেনেসাঁর পূর্বেকার ও প্রাচীন যুগের দর্শন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি, আধুনিক চিন্তাবিদরা। বিশেষ করে গ্রিক দর্শন ও পরবর্তীতে ইসলামী দর্শন তাঁদেরকে প্রভাবিত করে।

ষষ্ঠদশ শতকের শেষে ও সপ্তদশ শতকের শুরুতে নতুন বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল মতবাদ তৈরির চাপ পড়ে দর্শনের উপর। এসময় ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ও দার্শনিক রেনি দেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০) নতুন ধারণা প্রকাশ

করেন। তিনি বলেন, 'পরিষ্কার ও আলাদা ধারণার প্রয়োজন'। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁর প্রখ্যাত মন্তব্য করলেন, 'আই থিংক, দেওয়ারফোর আই এম'- অর্থাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি। এ মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে দেকার্ট মন (মাইণ্ড) ও মেটার (বস্তু) এর নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর এসব কথা থেকেই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম হয়। মূলত তাঁকে আধুনিক রেশনালিজমের জন্মদাতাই বলা চলে। দেকার্টের পর বারুচ স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), গটফ্রিড লেইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬), প্রমুখ রেশনালিস্টরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর অবিশ্বাসী না থাকলেও প্রভু সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা থেকেই শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতাবাদের জন্ম হয়। কারণ, তাঁরা সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ্‌কে মেনে নিয়েছিলেন সত্য (দৃষ্টান্তস্বরূপ দেকার্টের কথা বলা যায়, তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন একজন অনুরক্ত খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী খ্রিস্টান হিসেবে), কিন্তু মুক্তবুদ্ধির প্রতি তাঁদের ঝোঁক ছিলো প্রবল। এ প্রবলতা থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু দার্শনিকরা আল্লাহ্‌র বিশ্বাস থেকেও বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হন এবং নাস্তিকতার অভিশাপে নিমজ্জিত হয়ে যান।

সপ্তদশ শতকে ইউরোপের কেন্দ্রতেই শুধু দার্শনিক বিপ্লব চলছিলো না, বৃটেনেও কিছু কিছু দার্শনিকরা নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) (অভিজ্ঞতাবাদ), জন লোকি (১৬৩২-১৭০৪), বিশপ বারকেলি (১৬৮৫-১৭৫৩) (ভাববাদী-অহংবাদ), ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) (কার্যকারণবাদ) প্রমুখ দার্শনিকদের কথা উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা ও জ্ঞানচর্চা নিয়ে এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত বলা আদৌ সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁদের ধারণা ও দার্শনিক বাদ-প্রতিবাদ-মতবাদ থেকেই শেষ পর্যন্ত সর্বাধুনিক মতবাদগুলোর জন্ম হয়। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, এসব চিন্তাশীলদের মধ্যে বিজ্ঞানের সাথে সংঘাতপূর্ণ খ্রিস্টবাদের বিশ্বাস ও ডগমা (ধর্মান্ধ-বিশ্বাস) বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। যার ফলে সবাই এমন একটি দর্শন সৃষ্টি করতে আগ্রহী হোন, যেটি হবে খ্রিস্টধর্ম সমূলে ধ্বংস না করেই বিজ্ঞানসম্মত একটি মতবাদ এবং ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক

তথ্যের সাথেও তা সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু 'সাপও মরবে লাঠিও বাঁচবে'- এ পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত ফেল করলো।

প্রভুবিশ্বাসী রেশনালিজম বা যুক্তিবাদ অত্যাধুনিক নাস্তিক দার্শনিকদের হাতে এসে প্রভুবিরোধী বা ধর্মবিরোধী হয়ে জগতে আবির্ভূত হলো। যেসব নাস্তিকদের হাতে এ কার্য সম্পাদিত হয় এদের মধ্যে জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), ফ্রিডরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) (ডায়ালেক্টিক-দ্বান্দ্বিকতা) এবং সর্বোপরি ধর্মবিরোধী কার্ল মার্কস্ (১৮১৮-১৮৮৩) (ডায়ালেক্টিক মেটেরিয়েলিজম- দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব দার্শনিকদের হাতে যুক্তিবাদে নতুন সংযোজন হলো। অর্থাৎ এখন থেকে যুক্তিবাদ বা রেশনালিজমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকলো না। এদের মননে তথাকথিত সম্পূর্ণ ফ্রি মুক্তচিন্তা এতটুকু বৃদ্ধি ও তার প্রভাব বিস্তারলাভ করলো যে, 'মুক্তচিন্তা' ও 'যুক্তিবাদ' বলতে বলতে তারা সম্পূর্ণ নাস্তিকতাবাদের পথ ধরে পৃথিবীর বুকে জঘন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাদ-মতবাদ ছড়িয়ে দিলো। কিন্তু এসব মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও সত্যধর্ম ইসলামকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি।

তবে আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়- মুসলমানদেরকে উপর্যুক্ত বাদ-মতবাদসমূহ চরমভাবে বিভ্রান্ত করেছে, এমনকি অনেককে নাস্তিকতার অভিশাপে পর্যন্ত নিমজ্জিত করে ছেড়েছে। ইসলামী উম্মাকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ইসলামী চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস-দর্শন নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ ব্যর্থতার কারণ কি? কারণ অনেকটি থাকতে পারে তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মূলে হলো ইসলামের চিরন্তন ও চির-শাশ্বত ঐশী বাণী আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষিত সুন্নাহ। রেশনালিজমের প্রভাবশীল ফোর্সে পৃথিবীর প্রায় সবকটি ধর্মবিশ্বাসই নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা হতে যাচ্ছে, কিন্তু ইসলাম মৌলিকভাবে এর প্রভাব থেকে মুক্ত। বাহ্যিক দিক থেকে খোদা-বিরোধী যুক্তিবাদ ইসলামী দুনিয়াকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে বলে মনে হলেও, ভেতরের মৌলিক দিক থেকে এর চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা ইসলাম সহজেই করতে সক্ষম এবং করেছেও।

(খ) ইসলামী দর্শনের ইতিবৃত্ত

ইসলামে কোনো দর্শন নেই, এরূপ মন্তব্য যারা করেন তাদের উচিত বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১), আলী ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৩), আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০), আলী ইবনে রুশ্‌দ (১১২৬-১১৯৪), ইবনে আরাবী (১১৬৫-১২৪০), মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (১২০৭-১২৭৩) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীদের জীবন ও কর্মের উপর অধ্যয়ন করা। এ মনীষীরা সাবাই ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁদের দর্শন যুগে যুগে মুসলিম দুনিয়া এবং পাশ্চাত্য জগতকেও প্রভাবিত করে আসছে। এদের কারো কারো কালজয়ী গ্রন্থসমূহ আজো বিশ্বব্যাপী পঠিত হচ্ছে। বিশেষকরে ইমাম গাযালী ও জালালুদ্দীন রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার একাধিক গ্রন্থ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে আজো মুদ্রিত হতে দেখা যায়। সুতরাং ইসলামে কোনো দর্শন নেই, এরূপ মন্তব্য শুধু উদ্ভট নয়, যারা একথা বলে তারা দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রেখে বলছে কি না সন্দেহ আছে।

দর্শনের ইতিহাসে মুসলমানদের মৌলিক অবদানের কথা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলিম দার্শনিকরা এমন কিছু কালজয়ী দর্শন সৃষ্টি করে গেছেন যে, যা আজো কেউ অতিক্রম করে যেতে পারছে না। ইমাম গাযালীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিশকাতুল আনওয়ার, ইহিয়া উলূমুদ্দীন, তাহাফুতুল ফালাসিফা, মাকাদিসুল ফালাসিফা, কিমিয়ায়ে সাআদাত প্রভৃতি গ্রন্থগুলো পৃথিবীর সর্বত্র স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য আজো করে যাচ্ছে।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) শুধু দার্শনিক ছিলেন না, ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম- ইসলামের নিদর্শন বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তাঁর সময় গ্রিক রেশনালিস্ট দর্শন ইসলামে অনুপ্রবেশ করে স্থায়ী ক্ষতিসাধন করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তিনি সফলভাবে যুক্তিবাদকে ইসলামী আকীদা ও ঈমানের মানদণ্ডে উপস্থাপন করে সে সম্ভাবনা প্রতিহত করেন। অপরদিকে সুফিতত্ত্বেও আকীদা ও শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ

ঢোকার এক প্রবণতা দেখা দেয়। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ক্ষেত্রেও ইসলামের সঠিক সুফিতত্ত্বকে (ইসলামী আধ্যাত্মিকতাকে বা তাসাওউফকে) অক্ষুণ্ন রেখে এ থেকে ইসলামী শরিয়ত ও ঈমান-আকীদা বিরোধী উপাদানসমূহ সফলভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হোন। তাঁর মতো চিন্তাশীলের জন্ম না হলে পরবর্তী যুগের ইসলামের ইতিহাস কিরূপ হতো তা বলা মুশকিল। মধ্যযুগে তাঁর ধর্ম-দর্শন পশ্চিমা জগতে প্রভাব সৃষ্টি করে। ত্রয়োদশ শতকে ইতালির প্রখ্যাত খ্রিস্টান দার্শনিক সেন্ট থমাস এ্যকুইনাসের (১২২৫ বা ১২২৭-১২৭৪) মতো চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দর্শন থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

ইসলামী দর্শনের মূলে হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ধারার মতবাদ পরিলক্ষিত হলেও, এ মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারো মধ্যে সন্দেহের কোনো লেশমাত্রও দেখা দেয় নি। তবে বলাই বাহুল্য অনেকেই গ্রিক দর্শন থেকে প্রভাবিত হোন।

ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথমেই যার কথা আলোচনা করতে হয় তিনি হচ্ছেন আল-ফারাবী। আলী ইবনে সিনার পূর্বে ইসলামের প্রভাবশীল দার্শনিক ছিলেন এই মনীষী। তিনি এ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর একাধিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধও রচনা করেন।

আল ফারাবী তুর্কিস্তানের ফারাব এলাকার কাছে ওয়াসিজ নামক একটি গ্রামে ৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইরানের অধিবাসী। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন ফারাবেই সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে তিনি বুখারা এবং বাগদাদে গমণ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। দর্শন, বিজ্ঞান ছাড়াও ফারাবী কয়েকটি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমত তিনি কাজী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষকতা করে জীবন কাটান। তিনি ৮০ বছর বয়সে দামেস্কোতে ৯৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

দর্শনে ফারাবী বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে নিওপ্লেটোনিক বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। তবে তিনি দর্শন ও ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রিক দার্শনিক

এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাভাবনার মধ্যে একটি সংশ্লেষণ বা সিনথেসিস সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। আল ফারাবীর অবদান এতোই প্রভাবশালী ছিলো যে, পরবর্তীতে তাঁকে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়- এ্যারিস্টটল হলেন প্রথম জন। তবে এ আখ্যাটি অমুসলিম প্রতিচীর মানুষই দিয়েছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা বড় এবং সব শিক্ষকের শিক্ষক। তিনিই একমাত্র মানুষ এবং একই সাথে আল্লাহ্‌র নবী যাঁর মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিলো। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায়ই তিনি পূর্ণতা অর্জন করেন সরাসরি প্রভুর মাধ্যমে। স্বয়ং বিশ্বপ্রভু ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত 'ইনসানে কামিল'।

ইসলামী দর্শনের ভিত্তি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও শিক্ষা থেকেই এসেছে। ইসলামী দর্শন ইসলামের মৌলিক আকীদা ও এর প্রবর্তক ছাড়া কি কখনো সম্ভব? সুতরাং আল ফারাবীকে দ্বিতীয় শিক্ষক ও এ্যারিস্টটলকে প্রথম শিক্ষক একমাত্র অমুসলিমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। আর বাস্তবে এ উপাধিটির পেছনে অমুসলিমরাই ছিলো। কিন্তু ইসলামী দর্শনের প্রবর্তকরা সবাই ছিলেন পরহেজগার মুসলমান। এ তথ্য তাঁদের জীবনী থেকে পাওয়া যায়। অমুসলিমরা এই দার্শনিকদের জীবনচরিত রচনায় গ্রিক দর্শনের প্রভাবের কথাই উচ্চবাচ্যে প্রকাশ করেন। অথচ তাঁদের ইসলামী চিন্তা-চেতনা পরহেজগারী এমনকি আল্লাহ্‌র অলি হওয়ার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে আতঙ্কবোধ করেন। তা কেনো করেন সেটা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এখানে সেদিকে যেতে আদৌ ইচ্ছে বা প্রয়োজনও নেই।

আল ফারাবী লজিক বা যুক্তিবিদ্যাকে দু'টি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেন। এর একটি হচ্ছে ধারণা (আইডিয়া) আর অপরটি হলো প্রমাণ (প্রুফ)। আল ফারাবীর দর্শনের প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম হলো 'ফুসুল হিকাম'। এ গ্রন্থটি এখনো পঠিত হয়। ইসলামী রাজনৈতিক বিজ্ঞানের উপর তাঁর লেখা গ্রন্থটি হচ্ছে 'আরাহাল মাদীনাল ফাদ্বীলা'- বা আদর্শ শহর। আল ফারাবীর চিন্তাধারায় সুফিতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণ ছিলো সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীতে এর প্রভাবে ইবনে সিনা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এছাড়া অনেক পরে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ' থিওরী প্রতিষ্ঠায়ও আল ফারাবীর ধারণা লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ইমাম গাযালীও (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল ফারাবীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না।

ফারাবী পরেই মুসলিম বিশ্বে আরেক প্রখ্যাত চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন আবু রায়হান আল বিরুনী।

আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বিরুনী কিভা শহরে (উরুল পর্বতাঞ্চলে) ৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের আরেক স্বনামধন্য চিন্তাশীল ইবনে সিনার সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। প্রখ্যাত মুসলিম বীর সুলতান মাহমুদ গজনী আল বিরুনীকে নিজের দরবারে নিয়ে যান। এসময় তাঁর বয়স বেশী ছিলো না। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আল বিরুনী একাধিকবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এর ফলে তখনকার ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে। আল বিরুনী সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং ভারতে ভ্রমণকাহিনীর উপর 'কিতাব আল হিন্দ' নামক একটি প্রখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এ পুস্তক থেকে তখনকার ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আল বিরুনীর ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো এতোই সুদূরপ্রসারী ছিলো যে, বাদশাহ্ আকবরের সময় আবুল ফজলের 'আইনী আকবর' গ্রন্থেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ আবুল ফজলের এ পুস্তক রচনার ৬০০ বছর পূর্বে আল বিরুনী এ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন।

আল বিরুনী বিজ্ঞানের উপর যে প্রখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা হলো 'কানুন ই-মাসুদী'। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলের উপর তিনি 'আল আতার আল বাক্বিয়্যা' নামক একটি বৃহৎ গ্রন্থ লিখে যান। দর্শনের উপরও আল বিরুনীর অনেক অবদান আছে। সত্যের সন্ধানকে যদি দর্শনের প্রধান লক্ষ্য বলা হয়, তবে আল বিরুনীর জীবন এ সত্যের সন্ধানেই কেটে গেছে। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ সর্ব-জ্ঞাত, সুতরাং সেই আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানুষ অজ্ঞ থাকবে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানের প্রতিটি প্রধান শাখায়ই তাঁর প্রতিভা ছিলো অপরিসীম।

তাঁর চিন্তা-চেতনা মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীতে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আবু আলী আল হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা এক অনন্য প্রতিভার নাম। বুখারার কাছে আফসানায় ৯৮০ সালে তাঁর জন্ম হয়। বুখারায়ই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি কুরআনের হাফিজ হোন। পরবর্তীতে তিনি গ্রিক ও ইসলামী দর্শনের উপর আবু আব্দুল্লাহ নাতালী নামক এক দার্শনিকের কাছে দর্শনের উপর অধ্যয়ন করেন। এছাড়া মেডিসিনের উপর তাঁর গভীর জ্ঞান অল্প বয়সেই অর্জিত হয়। তিনি বুখারার সুলতান নূহ ইবনে মানসুরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেন, অথচ সমকালীন বহু ডাক্তার-কবিরাজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারেন নি। সুলতানকে আরোগ্য করে তোলায় ইবনে সিনার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

সুলতান আরোগ্য লাভ করে তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে। ইবেন সিনা জবাবে বললেন, জাহাঁপনা! আমার কোনো টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তির প্রয়োজন নেই। আপনার তালাবদ্ধ পাঠাগারটি যদি ব্যবহার করার অনুমতি দান করেন তবে সবকিছু পাওয়া হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা থেকে বুঝা যায় ইবনে সিনা কত বড় জ্ঞানান্বেষী ছিলেন।

মেডিসিনের উপর ইবনে সিনার কালজয়ী পুস্তকটি হচ্ছে, ‘আল কানুন ফিত্তিব’। প্রায় ১০ লক্ষ শব্দ-সম্বলিত এই বিরাট বিশ্বকোষ শত শত বছর যাবৎ ইউরোপসহ সমগ্র মধ্যযুগীয় বিশ্বে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দর্শনের উপর তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম, ‘কিতাবাশ্ শিফা’। এতে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর গভীর আলোচনা করেন। তিনি জ্ঞানের কয়েকটি শাখা আলাদা করে এভাবে ব্যক্ত করেন: ১. থিওরীটিক্যাল জ্ঞান, যথা: গণিত, পদার্থবিজ্ঞান (ফিজিক্স) ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স)। ২. প্রেকটিক্যাল জ্ঞান, যথা: নীতিবিদ্যা (এ্যথিক্স), অর্থনীতি ও রাজনীতি।

ইবনে সিনা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপর্যুক্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা করেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর দর্শনে এ্যরিস্টটলের প্রভাব ছিলো। তবে এতে এ্যরিস্টটেলিয়ান সংশ্লেষণ (সিনথেসিস), নিওপ্লেটোনিক

প্রভাব ও ইসলামী ধর্মজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে। মূলত অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকদের মতো ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা সৃষ্টিই ছিলো তাঁর অভিপ্রায়। এতে তিনি সফলভাবে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও আকীদাকে অক্ষুণ্ন রেখে মুক্তভাবে দার্শনিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন। কিতাবাশ্ শিফা ছাড়াও দর্শনের উপর তাঁর আরো দু'টি গ্রন্থের সন্ধান মেলে। এগুলো হলো, 'কিতাবান্ নাযাত' ও 'কিতাবাল ইশারাত'।

মুসলিম দর্শন ও জ্ঞানচর্চায় সাহাবা (রাঃ), তাবিঈ ও তাবে তাবিঈনদের যুগ পরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, প্রভাবশালী ও সুদূরপ্রসারী যে মনীষীর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ইমাম আল-গাযালী (রাহঃ)। তাঁর প্রভাব পূর্ব-প্রাচ্যে সর্বত্র আজো অপরিসীম। তবে তাঁর পরই যিনি দুনিয়ার বুকে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন, তিনি হচ্ছেন আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশ্দ। আল গাযালীর দর্শন ও জ্ঞানচর্চার উপর আলোচনা সঙ্গত কারণেই এ প্রসঙ্গে সবশেষে করবো।

ইবনে রুশ্দ বিশেষকরে দর্শনে ইসলামী ইতিহাসে আমার মতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। আল-গাযালীর পরই তাঁর স্থান। যদিও আল-গাযালীর প্রভাব ইউরোপে প্রতিফলিত হয়েছিল, কিন্তু ইবনে রুশদের মতো এতোটা ছিল না। আবার ইবনে রুশদের প্রভাব মুসলিম বিশ্বে তুলনামূলকভাবে কম পড়ে। আর এর আসল কারণই ছিলেন আল-গাযালী (রাহঃ)। ইবনে রুশ্দই একমাত্র দার্শনিক যিনি ইমাম গাযালীর দর্শনকে সমালোচনা করেছিলেন। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে তাঁর প্রভাব অনেকটা খাটো হয়ে যায়। সে সময় অনেকে তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে এরূপ বলা যে ভুল ছিলো তা প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলিম স্পেনের কুর্দভায় ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে ইবনে রুশ্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ম জীবনে কাজী (জজ) ছিলেন। সেকালের অনেক জ্ঞানতাপসদের মতো ইবনে রুশ্দও মেডিসিন শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। দর্শনের উপর তাঁর সর্বমোট ৮৭টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া ২০টি পুস্তক মেডিসিনের উপরও রচনা করেন। তিনি এ্যারিস্টটলের 'এ্যানিমা' ও 'পলিটিক্স', প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং ইবনে ফারাবীর 'লজিকে'র উপর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করেন।

যদিও দর্শনের উপর ইবনে রুশদের আলোচনা থেকেই মূলত ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো, কিন্তু তাঁর নিজস্ব দর্শনের উপর কয়েকটি প্রখ্যাত গ্রন্থ মৌলিকভাবে ইসলামী দর্শনে উৎকর্ষ সাধন করে। এ গ্রন্থগুলো হচ্ছে, ফাস আল-মাক্বাল (সুস্পষ্ট গবেষণা), আল-কাশফাল মানাহিযুল আদিলাহ্ (প্রমাণ ব্যাখ্যার পদ্ধতি) এবং তাহাফুতুত্ তাহাফুত (অসংলগ্নতার অসংলগ্নতা)। শেষোক্ত গ্রন্থটিতেই তিনি ইমাম আল-গাযালীর তাহাফুতুল ফালাসিফা গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেন। প্রথম দুটি গ্রন্থে ইবনে রুশ্দ আশারিয়াদের ইসলাম ধর্ম-তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পুস্তক-দ্বয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে যুক্তির মাধ্যমেও ধর্মকে উপস্থাপন করা সম্ভব। বিশ্বাস ও যুক্তি একীভূত হতে পারে।

আল-গাযালীর (রাহঃ) দর্শনের মধ্যে তিনি কিছু ফাঁক খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন এবং ইসলাম ও এ্যারিস্টটলের দর্শনের মধ্যে মিল সন্ধান করেন। ইবনে রুশ্দ তাঁর পূর্বসুরী আল কিন্দি, আল ফারাবী ও ইবনে সিনার মতো ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো অমিল দেখেন নি। কারণ তাঁর সময়ে ধর্মকে রেখে দর্শন নিয়ে ভাবনা মূলত অচিন্তনীয় ছিলো। ইসলামের তাওহিদ ও এ্যারিস্টটলের একেশ্বরবাদে নীতিগতভাবে কোনো পার্থক্য ছিলো না। ইসলামের বিশ্বাস ও আকীদা অক্ষুণ্ন রেখেও মুক্তভাবে জ্ঞানচর্চা সম্ভব। ইবনে রুশ্দ প্রমুখ সেকালেই এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এটা একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বিশ্বাস ও আকীদার মধ্যে মানবীয় বাহ্যিক ও গুপ্ত দু'টি দিকই সম্পূর্ণ কল্যাণময় ও বিজ্ঞানসম্মত বলে সে সময়েই প্রমাণিত হতে থাকে। তাই আজ এই সত্য (বিজ্ঞানসম্মত হওয়াটা) আরো পরিষ্কার হওয়ায় এটা সহজেই অনুমেয় যে, দর্শন যেহেতু মানব-কল্যাণ ও মহাসত্যের সন্ধানে ব্রত আছে- সুতরাং সে কালে এবং এ কালেও এই ইসলামই হবে দর্শনের মূল ভিত্তি, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ইবনে রুশ্দের সময়ের দার্শনিকরা তাই ইসলামের সুদূরপ্রসারী মহাসত্য উপলব্ধি করেই জ্ঞানচর্চায় ইসলাম ধর্মদ্রোহী কোনো উপাদান খুঁজে পান নি। ইসলামের ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনই তো মুক্তভাবে জ্ঞানচর্চার নির্দেশ

দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যবাদীরা 'মুক্তচিন্তার' কুফরী সংজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন। তারা মনে করেন মুক্তচিন্তা মানে হচ্ছে ধর্মমুক্ত চিন্তা তথা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান না রেখে চিন্তা করাই হচ্ছে 'মুক্তচিন্তা'। অথচ তাদেরই ভাষ্য মতে, দর্শনের জনক নামে খ্যাত সেই এ্যারিস্টটলও ইশ্বরবাদী মুক্তচিন্তা করে জীবন কাটিয়েছেন।

ইসলামী দর্শনে মুক্তচিন্তা আছে কিন্তু 'ধর্মমুক্ত' কুফরী মুক্তচিন্তার স্থান নেই। এ কারণেই আমরা যুগ যুগ ধরে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে ধর্ম ও দর্শনে তারতম্য দেখতে পাই কিন্তু মৌলিক ক্ষেত্রে- অর্থাৎ প্রভু বিশ্বাস বা নিষ্কলুষ একত্ববাদের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো দ্বিমত খুঁজে পাই না। ধর্ম, দর্শন ইসলামী উপাসনা পদ্ধতি ফিকহ, কিয়াস, ইজমা প্রভৃতি জটিল বিষয়ে আমরা বহু তারতম্য দেখতে পাই। এ থেকে ইসলামে যে মুক্তচিন্তা বিদ্যমান তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। তবে যে কেহ মৌলিক আকীদা, রাসূল (সাঃ)-এঁর দেখানো সহীহ্ রাস্তা (সুন্নাহ) এবং সর্বোপরি আল কুরআন সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছে অথবা অবিশ্বাসের লেশমাত্র দেখিয়েছে, সে সাথে সাথে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অবিশ্বাসী, মুশরিক, মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। দর্শনেও যদি কুরআন বিরোধী কোনো একটি কথাও পরিলক্ষিত হয় তবে সে দর্শন আর ইসলামের কাছে দর্শন হিসেবেই গণ্য নয়।

তবে একটা কথা এখানে পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো সময় সুদূরপ্রসারী মুসলিম জ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনাকে না বুঝেও অনেকে ধর্মচ্যুত, ধর্মদ্রোহী বলে তাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে এরূপ বহিষ্করণ ছিলো ভুলের। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। ইবনে রুশ্‌দও এরূপ ভুলের শিকার হন। এক পর্যায়ে স্পেনের স্থানীয় আলীমরা, বিশেষকরে গাযালীর (রাহঃ) ফালাসিফার বিরোধিতা করায় ও ঈর্ষাজনিত কারণে তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলতেও দ্বিধা করেন নি। অথচ তিনি ছিলেন একান্ত অনুরক্ত একজন মুসলমান। তিনি ইসলামের প্রতিটি রুকুন সতর্কতার সাথে পালন করতেন। অবশ্য আলীমদের এই ভুল অচিরেই ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ তারা তুলে নেন। ইবনে রুশ্‌দের ধর্মবিশ্বাসের উপর দৃঢ়তার সাক্ষী মেলে তাঁর এ মন্তব্য

থেকে- তিনি বলেছেন, "নবীদের মাধ্যমে যে শরীয়া (উপাসনা ও জীবনচলার সঠিক পদ্ধতি) প্রতিষ্ঠিত হয় তা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে অনেক উন্নতমানের ও পবিত্র।" তবে ইবনে রুশ্‌দ বিশ্বাস করতেন দর্শন ও গভীর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে জগত ও ঐশীবাণী সম্পর্কে জানা সে কালের অনেক ফিকহ্‌বিদ ও মুতাকাল্লিমদের চেয়েও উন্নতমানের ছিলো। এ মন্তব্যের কারণে তিনি কিছু আলীম সমাজের রোষানলে পড়েন।

ইবনে রুশ্‌দ জ্ঞানান্বেষণের জন্য তিনটি পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেন। যথাঃ ১. বুরহান (যৌক্তিক প্রমাণের পদ্ধতি), ২. জাদাল (ডাইলেক্টিক্যাল- ন্যায়শাস্ত্র-ভিত্তিক) ও ৩. খাতাবা (ভাষা, কূটতর্ক ও কৌশলমূলক)।

ইবনে রুশদের মতে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে দর্শন ও দার্শনিকদের রাস্তা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আলীম উলামা বা ধর্ম শাস্ত্রের শাখা এবং শেষোক্তটি দ্বারা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা। বক্তৃতার কৌশল অবশ্যই একটি জরুরী প্রভাব-সৃষ্টির পদ্ধতি। এ উপায়ে কোনো কোনো সময় বক্তা অসত্য তথ্য দিয়েও শ্রোতাকে, তথা সমগ্র সমাজকে পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে পারে। আবার একই কৌশলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সত্য, সঠিক, সুন্দর সমাজগঠনের পথেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বক্তব্য দ্বারা একটি জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করা এমনকি বিপ্লবী তৈরী করা একটি মানবিক গুণ। এ গুণটি যে যতো বেশী ব্যবহার করতে পেরেছে সে 'নেতা' হিসেবে ততো বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। আধুনিক যুগে এটা আমরা অহরহ দেখছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ মানবীয় মৌলিক গুণ বা মেধাকে ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মবিরোধী, নাস্তিক, বেঈমান, মানবতা-বিরোধী, স্বৈরাচারী 'নেতারাও' ব্যবহার করে। এতে সমগ্র সমাজ পথভ্রষ্ট হতেও বার বার দেখা যায়। আধুনিক যুগে গেল শতকের ত্রিশের দশকে হিটলারের নুরেমবর্গ র‌্যালী নিয়ে গবেষণা করলে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হিটলার বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে একান্ত সংগোপনে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কথা ও ভঙ্গিমা দ্বারা কিভাবে দর্শক-শ্রোতাদের নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব সে ট্রেনিং নিতেন।

ইবনে রুশ্‌দ ইউরোপে 'গ্রেট কমেন্টেটর' হিসেবে পরিচিত। তাঁর দর্শন ও জ্ঞানচর্চা মানবজীবনে স্থায়ী প্রভাব রাখে। বিশেষ করে আক্বল (যুক্তি) ও

নাক্বল (কৃষ্টি) এই দু'টিকে তিনি ধর্ম ও দর্শনের মানদণ্ডে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুক্তিও যে ধর্মেরই আওতাভুক্ত তা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে গিয়েছেন। যে যুক্তিবাদ ইসলাম ধর্মবিরোধী হয় তা ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। কারণ ইসলামের ঈমান ও জীবনচলার পদ্ধতি থেকেই যুক্তিবাদ সুদৃঢ় হয়েছে। সুতরাং যুক্তিবাদ দিয়ে ইসলামকে উড়িয়ে দেওয়া মূলত সূর্যকে পশ্চিমাকাশে উদিত করারই নামান্তর, যা কখনো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইসলামী ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে ইবনে রুশ্দ থেকেও শতগুণ বেশি প্রভাবশালী যে জ্ঞানতাপস হাজার বছর পূর্বে এ ধরায় আগমন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন, হুযুর পাক (সাঃ), সাহাবা (রাঃ), তাবিঈ, তাবে তাবিঈনদের পরের যুগের যুগশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্ তুসী আশ্ শাফিঈ আল-গাযালী (রাহঃ)।

ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে ইসলামী জগতে যে নামটি সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত সেটি হচ্ছে আল-গাযালী (রাহঃ)। ১০৫৮ সালে ইরানের খোরাসানে এ প্রখ্যাত জ্ঞানতাপসের জন্ম। অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। নিশাপুর ও পরে বাগদাদে তিনি লেখাপড়া করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর অপরিসীম মেধার পরিচিতি মিলে। তিনি ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনকে কিছুদিনের মধ্যেই আয়ত্ব করে নেন এবং বাগদাদের নিযামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখনকার যুগে এ বিদ্যাপীঠ ছিলো মুসলিম জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র।

তবে ইমাম গাযালীর শিক্ষকতার উপর মন বসে নি। কিছুদিন পরেই তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে জাগতিক সব মোহ ও আকর্ষণ পরিত্যাগ করে যাযাবর জীবন কাটাতে লাগলেন। এসময় তিনি ইলমে মা'রিফাতের উপর কঠোর সাধনা করেন। শিক্ষকতায় আবার ফিরে আসলেও তিনি তা পুনর্বার পরিত্যাগ করে একাকী জীবন কাটাতে অগ্রসর হলেন। এসময় থেকে তিনি লেখালেখির উপর গভীর মনোনিবেশ করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যান। ১১১১ সালে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম গাযালী (রাহঃ) তাঁর সংক্ষিপ্ত (৫৪ বছর) জীবনে যতো বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন, তা আজকের যুগেও কেউ আশি বছর জীবিত থেকেও লিখতে পারবেন কি না সন্দেহ। আর যদি লিখতে সক্ষমই হোন, তবে তাঁর মতো একাধিক কালজয়ী গ্রন্থ রচনা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। কিমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থের অনুবাদক মাওলানা নূরুর রহমান বলেছেন, 'ইমাম ছাহেব মাত্র ৫৪/৫৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে শৈশবকাল ও পাঠ্য জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৩৫ বৎসর কাল তিনি গ্রন্থাদি রচনার সময় পাইয়াছিলেন। এই সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি ছোট বড় প্রায় ৪০০ (চারি শত) গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'জাওয়াহারুল কুরআন' নামক একখানা তাফসীরুল কুরআন ৫০ জিল্‌দে সমাপ্ত হইয়াছে। ... ইমাম সাহেবের দ্রুত কলম চালনা সম্বন্ধে আল্লামা নববী বলিয়াছেন ঃ আমি ইমাম গাযযালীর আয়ুষ্কাল ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা হিসাবান্তে গড় করিয়া দেখিলাম, তিনি প্রত্যহ গড়ে ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছিলেন' [কিমিয়ায়ে সাআদাত, মাওলানা নূরুর রহমান অনূদিত, ৮ম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১৭]।

ধর্ম, দর্শন ছাড়াও সূফীতত্ত্বে (ইলমে তাছাওউফে) ইমাম গাযালীর বিরাট অবদান রয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে একাধিক মুসলিম দার্শনিকরা তখন গ্রিক নিওপ্লেটোনিক ভাবধারা এত বেশি গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন যে, এগুলো কিছু ইসলামী মৌলিক আকীদার সাথে সংঘাতময় হয়ে উঠছিলো। ইমাম গাযালী এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে তাছাওউফ এবং দর্শন থেকে এসব অসামঞ্জস্যতা সফলভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হন। তবে তিনি স্বয়ং দর্শনকে পরিত্যাগ করেন নি।

দর্শনের ভেতর যেসব বাজে কথা অনুপ্রবেশ করেছিলো, তিনি তা উৎখাত করেন যুক্তির মাধ্যমে। অপরদিকে সুফিতত্ত্বের উপরও অনৈসলামী কিছু প্রভাবে চাপ সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রসার থেকেই সুফিতত্ত্বে এসব ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশ করেছিলো। প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয়, চীনা ও পারস্য দর্শন থেকে অনেককিছু ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় মিশ্রিত হয়ে অনেককে ইসলামী মৌলিক আকীদা থেকে বিচ্যুত করার উপক্রম করে। ইমাম গাযালী তা উপলব্ধি করে সুফিতত্ত্বে তাঁর নিজস্ব অগাধ জ্ঞান থেকে ইসলাম বহির্ভূত উপাদানসমূহ নির্মূল করতে সক্ষম হন। তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিকতার

নতুন সংজ্ঞা দেন এবং একই সাথে এর গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সুফিতত্ত্ব ও দর্শনে মৌলিক সংস্কার করে তিনি ইসলামী দর্শন ও তাছাওউফের আসল স্বরূপ পৃথিবীতে স্থাপিত করে যান।

দর্শনে গাযালী (রাহঃ) অংক শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা ব্যক্ত করেন এবং এ্যারিস্টটলের লজিক ও নিওপ্লেটোনিক ধারণার সংস্কার সাধন করেন। তিনি সাফল্যের সাথে কট্টর রেশনালিজমকে (যুক্তিবাদকে) ইসলামী দর্শন থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তাঁর মতে ‘সবকিছু’ যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যুক্তিবাদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা ও স্বয়ং প্রভুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা আদৌ সম্ভব নয়। আবার যুক্তিবাদ দ্বারা তা অ-প্রমাণিত করাও অসম্ভব। সুতরাং যারা মনে করে, আগে প্রভু আছেন কি না, তা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করবো এবং এরপর তাঁর প্রতি ঈমান আনবো, এরা মূলত ভ্রান্ত। আসলে প্রভুবিশ্বাস একমাত্র ঈমানের ব্যাপার। ঈমান শক্তিশালী হলেই প্রভুর সন্ধান মেলে। ঈমান ছাড়া ‘আল্লাহ্ আছেন কি না?’, এরূপ প্রশ্ন হচ্ছে কুফরীর আলামত। কুরআনে পাকে তাই ঈমানহীনদেরকে অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যে মূলেই অন্ধ, সে কিভাবে আসল সত্যকে জানতে পারবে? ঈমানহীনদের জ্ঞান ও দর্শন তাই বাহ্যিক জগতে সীমাবদ্ধ- মূলত অপূর্ণ, আসল সত্যবিচ্যুত।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) মতে, যুক্তি দ্বারা চুড়ান্ত সত্য এবং অসীমত্বতা বোধগম্য নয়। যুক্তি সসীমকে অতিক্রম করে যেতে অপারগ। যুক্তি তাই প্রত্যক্ষ-দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় জ্ঞানার্জন অসম্ভব। মূলত যুক্তি হচ্ছে রিলেটিভ বা আপেক্ষিক। বাহ্যিকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তির মাধ্যমে একই সত্য ভিন্নভাবে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে। তবে চুড়ান্ত সত্য ভিন্ন হতে পারে না। বলাই বাহুল্য ইমাম আল-গাযালীর এরূপ কথা আমাদেরকে আধুনিক যুগে আইনস্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘রিলেটিভিটি’ বা ‘আপেক্ষিকতাবাদ’-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বৈজ্ঞানিক থিওরী থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো ঘটনা চুড়ান্তভাবে ‘অবলোকন’ করা আদৌ সম্ভব নয়। সবকিছুই একমাত্র আপেক্ষিকভাবে দেখা, মাপা সম্ভব। আমরা যা কিছু অবলোকন করি তা সবই আমাদের গতি ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষক

একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে দেখবে। বলতেই হয়, ইসলামের মহান জ্ঞানতাপস ইমাম গাযালীই (রাহঃ) আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম আবিষ্কারক। আইনস্টাইন বিংশ শতকের শুরুতে গণিতের মাধ্যমে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রমাণ দিয়েছেন।

ইমাম আল-গাযালী সময় বা কালের ব্যাপারেও মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সময়ে দার্শনিকরা মনে করতেন, জগতটি ছিলো সীমিত কিন্তু সময় ছিলো অসীম। গাযালী (রাহঃ) এটা গ্রহণ না করে বললেন, সময়কে অসীম হতে হলে অসীম জগতেরও প্রয়োজন। সুতরাং সসীম জগতে অসীম 'সময়' থাকা অসম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মিল আছে। বিজ্ঞান এখন বলছে সময় ও স্থান মূলত একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। স্থানের জন্মের সাথে সময়েরও জন্ম। স্থানের (স্পেইসের) মৃত্যু হলে সময়েরও মৃত্যু হবে।

ইমাম আল-গাযালী ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে একটি ব্যালান্স সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর অগাধ জ্ঞান ও মেধার মাধ্যমে এ দু'টোর পরিধি নির্ণীত করেছেন। ধর্মের ও ধর্মজ্ঞানের বিস্তৃতি সসীম থেকে অসীমে। অপরদিকে যুক্তিবাদী দর্শন সীমিত ও আপেক্ষিক। দর্শনের আপেক্ষিকতার প্রমাণ আমরা এর ইতিহাস থেকেই পাচ্ছি। কারণ সক্রেটিস, এ্যরিস্টটল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো চুড়ান্ত দর্শন কেউ খুঁজে পান নি। এটা আসলে সময়ের সাথেও আপেক্ষিক। স্থান-কাল ও যুগের পরিবর্তনে এর পরিবর্তন হচ্ছে। আধুনিক জগতে স্বয়ং যুক্তিবাদও ভীষণ চাপের সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে একঝাঁক দার্শনিক 'রেশনালিজমের' সম্পূর্ণ বিপরীত এক দর্শন সৃষ্টি করতে সচেষ্ট আছেন। এটা হচ্ছে 'পোষ্ট মর্ডানিজম'।

বাংলায় 'পোষ্ট মর্ডানিজম' এর তরজমা দাঁড়ায় 'আধুনিকোত্তরবাদ'। বলাই বাহুল্য এই মতবাদটি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সরাসরি দার্শনিক রূপ। এ দর্শনে কোনোকিছুই আর যুক্তি দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়! সবকিছু মৌলিকভাবে যুক্তির বাইরে। বলা যায়, অলৌকিক। আর প্রতিটি ঘটনা যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে তা পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আর মানুষের চিন্তা-চেতনাও প্রভুর অজান্তে হয় না। মূলত এ জগতের যাবতীয় প্রচলন,

ঘটনাবলী, মানবীয় উত্থান-পত্তন সবকিছু অলৌকিক থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়ে লৌকিকে অবতরণ করে। আধ্যাত্মিক জগত ও বাহ্যিক জগতের মধ্যে সর্বদাই মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারেকশন) হচ্ছে। যদি কেউ এ দু'জগতের রহস্য সম্পর্কে অবগত হয় তবে তাঁর কাছে এ সত্য স্পষ্ট। আর এরাই হচ্ছেন সূফী, দরবেশ ও আল্লাহ্‌র অলি।

ইমাম গাযালীর প্রভাব মুসলিম বিশ্বে বিরাট ও স্থায়ী। ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে আমার মতে তাঁর পরে সমপর্যায়ের আর কারো জন্ম এখনো হয় নি। অবশ্য মাওলানা রূমী (১২০৭-১২৭৩), জালালুদ্দীন সুয়ূতী (১৪৪৫-১৫০৫), মুজাদ্দিদে আলফেসানী (১৫৬৪-১৬২৪) এবং আধুনিক যুগে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (১৯১৩-১৯৯৯), অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯) এবং আরোও অনেকে ইসলামী জ্ঞানচর্চায় বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা মুসলমানদেরকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করে যাচ্ছে। কিন্তু কেউই জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আল-গাযালী রাহিমাহুল্লাহর মতো বিচরণ করেন নি বলে আমার বিশ্বাস। একই সময় তিনি ছিলেন ফিকাহবিদ্‌, মুফাস্‌সীর, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। আর এই প্রতিটি বিষয়ে যে দক্ষতা তিনি দেখিয়ে গেছেন, তাঁর পরে অন্য কেউ এতটুকু করেছেন কি না সন্দেহ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইমাম গাযালীর (রাহঃ) প্রভাব আরো বহুকাল স্থায়ী থাকবে এবং তাঁর জীবনী, দর্শন ও জ্ঞানচর্চাকে যতো বেশি আমরা জানতে পারবো ততো বেশি আমাদের উপকার হবে। উপকার হবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র।

(গ) ইসলামী দর্শনে জ্ঞানের সংজ্ঞা

মুসলিম দার্শনিকরা দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'জ্ঞান' সম্পর্কে সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে প্রচলিত জ্ঞানের সংজ্ঞার সাথে বেশ অমিল বিদ্যমান।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইলম' এর সঠিক অর্থ ইংরেজী শব্দ 'নলেজ' বা এমনকি বাংলা অর্থ 'জ্ঞান' থেকেও ব্যাপক। 'জ্ঞান' বা 'নলেজে'র মাধ্যমে আমরা যা বুঝি তা ইলমের পূর্ণ অর্থবোধক নয়। ইলমের ব্যাপকতা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত। আর সুনির্দিষ্টভাবে

ইসলামের আধ্যাত্মিকতা বা তাসাওউফ এই ইলমের আওতাভুক্ত। ইলমের বিস্তৃতি এতোই ব্যাপক যে, ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ তাওহিদ, ফিক্হ, কালাম প্রভৃতি হতেও এর পরিধি ও অর্থ অনেকগুণ বড়। ইসলামের কোনো কোনো চিন্তাশীলরা 'ইলম মানেই ইসলাম' বলেও উল্লেখ করেছেন। ইলমকে রেখে ইসলাম ও ইসলামী চেতনা পরিপূর্ণ হতে পারে না। এটাও বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে সত্য ইলমের আঁধার। মূলত ইসলাম ছাড়া সত্য ইলম অর্জিত হতে পারে না। 'ইলম মানেই ইসলাম আর ইসলাম মানেই ইলম'।

পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে ইলমের গুরুত্ব এতো বেশি দেওয়া হয় নি, যা ইসলামে দেওয়া হয়েছে। ইলমের গুরুত্ব যে কতটুকু তা ইসলামের মহান ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। পবিত্র কুরআন শরীফে ১৪০টি স্থানে 'ইলম' ও ২৭টি জায়গায় 'আ'লীম' শব্দ এসেছে। ৭০৪টি আয়াতে করীমে ইলম ও এর সাথে সম্পৃক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়। জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন উপায়-উপরকরণ যেমন বই, কলম, কালি প্রভৃতির উপরও কুরআনে পাকে অসংখ্য জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। 'কালাম' শব্দ দু'টি স্থানে এসেছে এবং কিতাব শব্দ ৮১টি আয়াতে পাওয়া যায়। লেখালেখির উপর ৩১৯টি আয়াতে সরাসরি ইঙ্গিত আছে। এছাড়া ইলমের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় যে কথাটি তাহলো, কুরআন নাজিল হওয়ার প্রথম শব্দ 'ইক্বরা'। পড়ার মাধ্যমেই তো জ্ঞানার্জন হবে। সুতরাং ইলমের গুরুত্ব যে কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে উসূল আল-কাফী গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মূসা আল-কাযীম থেকে বর্ণিতঃ 'ইলম হচ্ছে তিন প্রকারঃ (ক) আয়তুন মুহকামা বা আল্লাহ্‌র অকাট্য দৃষ্টান্ত, (খ) ফরীদাতুন আ'দিলা বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং (গ) সুন্নাতুল ক্বা'য়িমা বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান, দর্শন, আইন, নৈতিকতা, রাজনীতি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ইলমের আওতাভুক্ত। আর ইলম একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অর্জন করা হলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

ইসলামের প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস আল-গাযালী (রাহঃ) ইলমের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, এক ধরনের জ্ঞান আছে যা উপকারী এবং অপর আরেক ধরনের আছে যা অপকার সাধন করে। অনেক জ্ঞান আছে বাহ্যিকভাবে তা উপকারী মনে হলেও আসলে সেটি মানুষের জন্য অপকারী। এক্ষেত্রে বৈষয়িক উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত জ্ঞানচর্চা (যেমন কিভাবে কোন্ কৌশলে কাজ করলে বেশি টাকা রোজগার হবে - এ চিন্তা হেতু জরুরী ধর্মকর্মকে উপেক্ষা করা) মূলত মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বাহ্যিক দিক থেকে এটা ভালো মনে হলেও ধার্মিক জীবন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, পরকালের প্রতি আকর্ষণ, ইবাদত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ, মৃত্যুর ভাবনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মানুষ ভুলে যায়। এরফলে সে হয়ে উঠে দুনিয়াদার, দাম্ভিক, দুনিয়ার ভালোবাসা তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখে দেয়। অথচ দুনিয়াবী উৎকর্ষ সাধনের জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে কোনো দোষ নেই, তা যদি সঠিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের এতো অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়, যার মাধ্যমে এ ধান্ধাই হয়ে যায় মানবজীবনের লক্ষ্য। সমৃদ্ধ, অভাবমুক্ত সমাজগঠন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অতিরিক্ত ধনতন্ত্রবাদকে ভালোবেসে নয়। জাগতিক প্রয়োজনের খাতিরে এমন কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে হবে যা ধর্ম থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত না করে। মোটকথা ধর্মকর্ম ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে ব্যালান্স থাকতে হবে। ইবাদত ও ধর্মকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এরূপ অতিরিক্ত বাহ্যিক জ্ঞান নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) তথ্যে (ইনফরমেশন)- এর অর্থ হলো অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, (খ) প্রাকৃতিক জ্ঞান- অর্থাৎ বিজ্ঞানের মাধ্যমে জগতের পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং (গ) ধারণাভিত্তিক জ্ঞান- এটাকে হাইপোথিসিস বলা হয়। প্রথম দু'টো মানুষের জন্য উপকারী কিন্তু তৃতীয়টির মাধ্যমে সত্যে উপনিত হওয়া সম্ভব, তবে এটি স্বয়ং নিজে উপকারী নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের সন্ধান ধারণা থেকে উদ্ভূত হতে পারে, আর সন্ধানের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এটা কোনো উপকারী ধারণা নয়।

ইসলামে ইলমের উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে মা'রিফাত। এটা অর্জনের পদ্ধতি সুফিতত্ত্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য জগতে হিকমত বা উইজডম হচ্ছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর। ইসলামের মা'রিফাতের মধ্যেই কিন্তু এই হিকমত নিহিত। বাস্তবে ইলম শব্দ মা'রিফাতের সাথে সমার্থবোধক। জ্ঞান আসে আক্বল ও ইলমে লাদুনী এ দুই পদ্ধতিতে। প্রথমটি মানুষ তাঁর আক্বল (চেষ্টা তদবির) দিয়ে অর্জন করে। দ্বিতীয়টি অর্জিত হয় স্বয়ং প্রভুর ইচ্ছার মাধ্যমে। ইলমে লাদুনী সুফিতত্ত্বের একটি মৌলিক উপাদান। একমাত্র তাছাওউফের পথেই এই সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন সম্ভব। অবশ্য এটা জানা থাকা দরকার যে, কুরআন এবং সুন্নাহকে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে জ্ঞানার্জন করা সর্বাপেক্ষা জরুরী। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত মহাসত্য জ্ঞান। প্রদত্ত এই জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে কোনো ধরনের জ্ঞানই অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঈমান, আকীদা, শরীয়ত, ইবাদত ও কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অন্তত মৌলিক জ্ঞান ছাড়া কেউ যদি ইলমে মা'রিফাত বা তাছাওউফের পথে পা বাড়ায় তবে পথভ্রষ্ট হওয়ার ভীষণ আশঙ্কা আছে। ইসলামী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের ইমামদের ফায়সালাকে মুসলমানরা গ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক অপরিহার্য ইসলামী জ্ঞানের জন্য সূত্র হচ্ছে এই ইজতিহাদ।

বুদ্ধি বা আক্বল ইসলামে বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। বুদ্ধির উপর ভিত্তি করেই সব ধরনের জ্ঞানার্জন সম্ভব। আগেকার মুসলিম দার্শনিকরা সবাই এর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে, বুদ্ধির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যকে (বা হাক্বিকাতকে) আবিষ্কার করতে শিক্ষা দেয়। মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা এটা অর্জন করতে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। দার্শনিকরা বিজ্ঞান ও যুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছেন। অপরদিকে সুফিরা তাছাওউফের মাধ্যমে হাক্বিকাত অর্জন করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এখনো আছেন। তবে আগেকার দিনের একাধিক দার্শনিক বিশেষ করে ইমাম গাযালী, আল-ফারাবী ও ইবনে সিনা সুফিদের পথও অবলম্বন করেছেন। তাঁদের লেখায় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আমরা দেখতে পাই।

পূর্বোল্লিখিত তিনজন দার্শনিক ছাড়াও হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (১০০৯-১০৭২/৭৭) "কাশফ আল মাহযুবে" খবর (তথ্য) ও নাযার (গবেষণামূলক চিন্তা) এ দু'টোকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্যেও মুসলিম দার্শনিকদের প্রভাবে 'নলেজ অব দ্যা ডিভাইন' বা ঐশীজ্ঞান এবং 'যুক্তি-জ্ঞান' নামে জ্ঞানের দুটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে ইসলামের ইলমের আওতাভুক্ত রয়েছে এ দু'টিও। ইলম অর্জনে ঐশীজ্ঞান ও যুক্তি এবং বাহ্যিক উপায়ে (বিজ্ঞানসহ) প্রাপ্ত জ্ঞান এ উভয়টিরই প্রয়োজন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, অনৈসলামিক বিশ্বে যেখানে নলেজ (জ্ঞান) ও উইজডম (উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান) এ দু'টোকে ভিন্ন ও আলাদা মনে করা হয়, সেখানে ইসলামী দর্শনে উভয়টিকেই একীভূত করে ইলমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। মূলত দু'টির সমন্বয়েই অর্জিত হতে পারে প্রকৃত হাক্বিকাত বা মহাসত্য। নলেজ ও উইজডম এককভাবে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ইসলামে নলেজ আক্বল বা বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং উইজডম অর্জিত হয় ধর্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে। ইসলামের আধ্যাত্মিকতার মূলে আছে তাওহীদ ও খোদাপ্রেম। আল্লাহ্‌র একত্বের স্বীকৃতি ছাড়া তাওহীদ হাসিল হয় না আর তাওহীদ ছাড়া উইজডম আয়ত্তে আসে না।

ইসলাম তাই সঠিক জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি শিখিয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে একদিকে ইসলামের তাওহীদ, ধর্মবিশ্বাস, আকীদা, শরীয়ত এবং অপরদিকে আক্বল ব্যবহার করে বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং যারা ধর্ম ছেড়ে আক্বল দ্বারা জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হয়েছে তারা প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং যারা ধর্মকে ধরে আক্বলকে ছেড়ে দিয়েছে, বাহ্যিক জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। প্রথম পদ্ধতি জঘন্য, আর দ্বিতীয়টির মাধ্যমে জাগতিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানাভাবে দারিদ্র্যতা আসে, উন্নতি সাধনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মূলত ধর্ম ছাড়াও যেমন হবে না, তেমনি শুধু ধর্ম নিয়েও হয় না। ইসলামের ইলম তো এ দু'টোর সংমিশ্রণেই শুধু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে। বুদ্ধির মাধ্যমে জগতকে জানা, চেনা ও ব্যবহার করতে হবে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে হাক্বিকাত অর্জন করতে হবে। আর ধর্ম ও মা'রিফাতের সূত্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সুন্নাহ। এর বাইরের কোনো তাত্ত্বিকতা পথভ্রষ্টতার উপাদান যোগাবে।

যে বুদ্ধি ও দর্শনে ধর্মদ্রোহিতা বিদ্যমান তা ইসলামে কখনো ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। ইসলামী দর্শনে ইলম মানেই হলো আক্বল (বুদ্ধিভিত্তিক বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান) ও মা'রিফাত (ধর্মের আওতাভুক্ত আধ্যাত্মিকতা)।

(গ) পুনর্জাগরণের অপরিহার্যতা

দর্শনের উপর ইতোমধ্যে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে এ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এ বিষয়টি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যুক্তিবাদ নিয়ে আমরা আজ বেশ চিল্লাচিল্লি করি ও এর সূত্র ধরে অনেকে ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে প্রগতিবিরোধী, বেকওয়ার্ড প্রভৃতি বলতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু যুক্তির চেতনা থেকেই যে যুক্তিবাদ জন্ম নিয়ে মুসলিম ধর্মপন্থী দার্শনিকদের হাতে এসে এটা পরিশুদ্ধ হয়েছিলো, সে কথাটি কি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি? তাছাড়া, এসব বিশ্বখ্যাত দার্শনিকদের জীবন, চিন্তা, চেতনা ও জ্ঞান সম্পর্কেই বা কতটুকু আমাদের জানা আছে?

আমরা মুসলমান। আর মুসলমান হয়ে ইসলামী স্বর্ণযুগের শত শত জ্ঞানতাপসদের কথা আমরা আজ ভুলে গেছি। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকেই এসব জ্ঞানতাপস সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। অথচ পশ্চিমা নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের কথা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা আপনাকে বিরাট লেকচার দিয়ে দেবে!

দর্শনের প্রভাব অপরিসীম। মানবজীবনের অনেক দিকই দর্শন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিশেষকরে দর্শন থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলে। আধুনিক যুগে ইসলামী দর্শনের ক্রমোবনতি হেতুই পাশ্চাত্য ধর্মবিরোধী দর্শন ও মতবাদ মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে বিরাট। অথচ এরূপ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া এবং ধর্মদ্রোহী দর্শনকে প্রতিহত করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েই আমাদের পূর্বসুরী মুসলিম দার্শনিক ও জ্ঞানতাপসরা ধর্মভিত্তিক আদর্শ দর্শন সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক যে জিনিসটি সক্রিয় ছিলো বলে দেখা যায় তা হচ্ছে, ধর্মের ক্ষতিসাধন না করেও বৈজ্ঞানিক প্রগতির সম্ভাবনা। প্রায় সব মুসলিম

দার্শনিকরাই ধর্ম, বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজেছেন এবং দেখিয়েছেন, নিষ্কলুষ ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞান-যুক্তিবাদের সংশ্লেষণ শুধু সম্ভব নয় বরং কাম্য। যে যুক্তিবাদে ধর্মের স্থান নেই সেরূপ যুক্তিবাদকে জ্ঞান এবং যুক্তিরই আলোকে তাঁরা নির্মূল করতে সক্ষম হন।

আজ আমাদের সমাজে সেই দার্শনিকদের জ্ঞান অনুপস্থিত থাকায় দর্শনের জন্য পাশ্চাত্যের নাস্তিকদের দ্বারে দ্বারে যেতে হচ্ছে। ইসলামী দর্শনের প্রভাব থেকে পাশ্চাত্যের দর্শন সৃষ্টি হলো- যা পরবর্তীতে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের অপ্রাপ্ততা ও অসামঞ্জস্যতা হেতু পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ধর্মদ্রোহিতাকে গ্রহণ করলেন, সেই প্রাণহীন, ধর্মহীন দর্শনকে আমরা লালন করছি। প্রচার করছি। সমাজকে অজান্তে ঠেলে দিচ্ছি ধ্বংসের দিকে।

আজকের তরুণ-তরুণীদের মস্তিষ্কে কোনো ইসলামী জ্ঞান-দর্শন নেই। এরা বড় বড় নাস্তিক্যবাদী, সন্দেহবাদীদের চাকচিক্য দর্শনকে মহামন্ত্র মনে করে মগজ ভর্তি করে নিচ্ছে। ইবনে রুশ্‌দ যে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষকে কূটতর্কের (মূলত মিথ্যাবাদিতার) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা আজ আমরা চোখের সামনে অবলোকন করছি। ইসলামী চিন্তা-চেতনা করলে মানুষ প্রগতিবিরোধী হয়ে যায়, বেকওয়ার্ড হয়ে যায়, ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী, ইসলামী আইন-আকীদা নারীদের স্বাধীনতা বিরোধী প্রভৃতি কথা তোতা পাখির মতো বার বার উচ্চারণ করে তারা নতুন প্রজন্মকে একেবারে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এতকাল যাবৎ এসব বুলি আওড়িয়েও তারা তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজ গঠন করা দূরে থাক, বরং সমাজকে আরো জঘন্য মারাত্মক করে তুলেছে।

এ দূরাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো ইসলামী জ্ঞান-দর্শনের পুনর্জাগরণ। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস-আকীদা ও শরীয়ত ছাড়াও এর দার্শনিক চিন্তা-চেতনা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে, অতীত মুসলিম জ্ঞানতাপসদের অনুপ্রেরণা ও অনুসরণে পাশ্চাত্য জগত থেকে আমদানীকৃত ধর্মবিরোধী দর্শনকে ইসলামী সমাজ থেকে উৎখাত করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযৌক্তিক যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেও যে ইসলামী দর্শন মুসলিম উম্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তা শাণিত কলমে প্রকাশ করতে হবে। মূলত বর্তমান স্থান-

কালের মানদণ্ডে ইসলামী দর্শনের সংস্কার, পরিবর্ধন, শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি করা আজ জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামের হাজার বছরের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। যে জাতি ইতিহাস থেকে শেখে না সে জাতি অবশ্যই অজ্ঞতার অন্ধকার পথে অগ্রসর হয়। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানচর্চার অনতিক্রম্য দৃষ্টান্ত আছে। যে যুগে আমাদের সাধের পাশ্চাত্য জগত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, সে যুগে এই ইসলামী জ্ঞানের আলোই জগতকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। ইউরোপকে মধ্যযুগের বর্বরতা (*পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, মধ্যযুগের অন্ধকার শুধুমাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে একই সময়ে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়। সুতরাং মধ্যযুগকে যদি আমরা 'অন্ধকার, অসভ্য, বর্বরতার যুগ' বলি তাহলে বুঝতে হবে তা শুধুমাত্র তখনকার ইউরোপীয় সমাজকে বুঝাচ্ছে।*) থেকে সুপথে নিয়ে এসেছিলো এবং রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এ হচ্ছে ইসলামী চিন্তা-চেতনার অতীত।

রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের ইতিহাসে অনেক দ্বন্ধ হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু একই সময় ধর্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুধারণা চর্চাই ছিলো মূখ্য। জ্ঞানচর্চায় দার্শনিকরা পূর্ববর্তী এবং প্রাচীন যুগের জ্ঞানতাপসদের চিন্তাধারাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। যেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সত্যের সাথে সংঘাত হয়েছে সেখানে সংস্কার সাধন করেছেন। তাঁরা হাজার বছর যাবৎ বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে সমগ্র দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা কি? বিজ্ঞান ও ইসলামী দর্শনে পিছিয়ে থাকায় পাশ্চাত্য উপনিবেশ ও নাস্তিক্যবাদী দর্শন আমাদেরকে পঙ্গু করে ছেড়েছে। এখন আমরা দর্শন-চর্চায় সেই প্রাচ্যের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বসেও দেকার্ট, হেগেল, বারকেলি, লোকি, কান্ট, মার্কস আর এ্যাঞ্জেলের দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। অথচ এদের থেকে শতগুণ বেশি জ্ঞানী মুসলিম দর্শনের জনক আল-গাযালী, আল-ফারাবী, ইবনে রুশ্‌দ প্রমুখদের সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! এদের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে কেউ কিছু বলে না- একই সময় আমরা মুসলমানও!

এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের বংশধররা একদিন সম্পূর্ণ নাস্তিকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ পাশ্চাত্যের মাটিতে

লেখাপড়া করে, তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেও আজ আমি বলতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য দর্শন মানুষকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যুক্তি আর বৈষয়িক উন্নতি, ধন, ক্ষমতা প্রভৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করে মানুষের মগজ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। একই সময় অন্তরে শুধু-শুধু শূন্যতা আর শূন্যতাই বিরাজ করছে। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে হতাশা, সমাজে ভারসাম্যহীনতা। মানুষের হৃদয় থেকে শান্তির রস শুকিয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে যাচ্ছে যন্ত্র। জঘন্য যন্ত্র, নৈতিকতাহীন, ভাবহীন, ইমোশনলেস চলন্ত মেশিন। এ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদে নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্যের আসল স্বরূপ। আমরা কি এরূপ প্রাণহীন সমাজ চাই? ইসলামী জ্ঞান ও দর্শন বুকের মধ্যে লালন না করলে এরূপ প্রাণহীন যন্ত্রে আমাদের আগামী প্রজন্ম যে রূপান্তরিত হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ইসলামী দর্শনের মূলে ঈমান- পবিত্র তাওহীদ। ইসলামী নৈতিকতার মূলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাহ। মনের খোরাক ও শান্তির উৎস আল্লাহ্‌র স্মরণ (ইবাদত) ও ইলমে তাছাওউফ। জ্ঞানের উৎস আল-কুরআন। জাগতিক উৎকর্ষের পথ আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুজগত নিয়ে গবেষণা ও তা কাজে লাগানো- তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। মুসলমানের মন-মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামী শিক্ষা ও দর্শন, পাশ্চাত্যের ধর্মদ্রোহী, অভিশাপে পরিপূর্ণ নাস্তিক্যবাদী বাদ-মতবাদ নয়। ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনের পুনর্জাগরণ ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আস্তিক গুণিজন আশারাখি এখনই আরও গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হবেন।

সিলেট, ১৫/০৪/০৬।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষাভাষী ইসলামপন্থী লেখকদেরক চ্যালেঞ্জ

বেশ কদিন আগের কথা। বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক ম্যাগাজিন ইসলামী সমাচার নিয়ে একটি হালাল গ্রোসারি দোকানে গিয়েছি। উদ্দেশ্য- অপেক্ষাকৃত এ বিজি দোকানে কয়েকটি কপি রাখবো। দোকানের মালিক পরিচিত একজন মুসলমান। স্থানীয় মসজিদে নামাজে প্রায়ই আসতে দেখি। ইসলামপন্থী একটি পত্রিকার উপর তার বেশ না হলেও কিছুটা অনুরাগ থাকবে, তা স্বাভাবিক ভেবেছিলাম। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে ইসলামবিরোধী মিডিয়া সন্ত্রাসের এ যুগে যে কোন ইসলামিক মিডিয়া- তা যতো ক্ষুদ্রকায়ই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য এক যারপরনেই সুখবর। নির্যাতিত এতিম মুসলিম জণগোষ্ঠির সুখ-দুঃখ ও সমস্যার কথা মিডিয়াতে তুলে ধরা আজকের মতো আর কোনকালে এতো জরুরী ছিলো না।

যা হউক, দোকানের মালিক- এ মুসলিম ভদ্রলোকের হাতে এককপি ম্যাগাজিন সৌজন্যে তুলে দিলাম। চোখ বুলালেন, তারপর বললেন, ৫ কপি রেখে যান। পরবর্তী কপি যখন বেরুলো তখন আবার তার দোকানে ৫ কপি নিয়ে এসে দেখলাম আগের ৫টি কপিই বিক্রি হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আরো ৫ কপি রেখে আসলাম। তবে দোকান থেকে বের হবার পূর্বে দোকানী সাহেব একটি মন্তব্য করলেন:

- হু! সবকটি ম্যাগাজিন চলে গেল! টাকা বানাবেন দেখছি।

আমি কিছু বললাম না। তবে কথাটা কেমন যেন ভাবিয়ে তুললো। পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে দোকানে যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ভদ্রলোক অন্য কিছু স্থানীয় বাংলা সাপ্তাহিকী এবং আরো কাগজপত্রের একেবারে নীচ থেকে ইসলামিক সমাচারের সবগুলো কপি বের করে বললেন,

- এই নিন, এগুলো কেউ পড়ে না!

আমি অবাক হলাম। বললাম,

- এগুলো তো অন্যান্য পত্র-পত্রিকার একেবারে নীচে ছিলো। আগের সপ্তাহ সব চলে গেল, আর এ সপ্তাহ একটিও যে গেলো না? কেউ এসে ইসলামী সমাচার আছে কি না জিজ্ঞেস করেনি?

একথা বলতেই মুসলমান এই অর্ধবয়সী লোকটি হঠাৎ আমার উপর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন-

- আমি এখানে দোকান দেইনি, ইসলাম প্রচারের জন্য! এছাড়া আমি মুসলমান কিন্তু ধর্মান্ধ নই!

তার কমেন্ট শুনে আমি নির্বাক। লোকটি কথায়-বার্তায় সুশিক্ষিত বলে ইতোমধ্যে ধারণা হয়েছিলো। এবার বুঝলাম, তিনি শুধু তা নয়, ইসলাম ও এর শিক্ষার উপর ব্রেন-ওয়াশকরা সুশিক্ষিত। তার কাছে ইসলামের সবকিছু গ্রহণযোগ্য নয়। ধার্মিকতা নিয়ে বলা, লেখা- এর মৌলিক আকীদা, বিশ্বাস প্রচার করা তার কাছে ধর্মান্ধতা। ইসলাম তাহলে মানুষকে অন্ধ করে দেয়! এটাই তার ধারণা। নাউযুবিল্লাহ! যে ইসলাম অন্ধকারকে দূরিভূত করেছে। জাহেলিয়াতের যুগের অবসান ঘটিয়েছে। পৃথিবীর মানুষকে দান করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উত্তম সভ্যতা। সে ইসলাম মুসলমান নামধারী, নামাজ-রোজা পালন করনেওয়ালা কিছু লোকদের কাছে আজ ধর্মান্ধতা! ধর্মকর্ম বেশি করলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়- এটাই এখন বড় একদল মুসলমানদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনটি কেন হলো? আজকের বিশেষকরে মুসলমান বাঙ্গালী সমাজে এসব ধারণা কেন জন্ম নিয়েছে? ধর্মদ্রোহী এসব ডাহা মিথ্যাকথা কারা রটাচ্ছে এবং মানুষের ব্রেনকে ধোলাই দিয়ে ছাড়ছে?

আমরা জানি এরা কারা। এরা হচ্ছে নব্য মুনাফিক, নাস্তিক, মুরতাদ আর সন্দেহবাদী লেখক-বুজীবীদের দল। এদের আমরা চিনি কিন্তু তাদের অপলেখা, অপলাপ আর কুজ্ঞানী কথার সঠিক জবাব আমরা দিতে পারছি না। প্রতিকার-প্রতিবাদ করতে পারছি না। এই বিলেতের মাটিতেও এসব জ্ঞানপাপীরা সাধারণ মুসলামদেরকে বিভ্রান্ত করে চলছে। আর তাদের সাথে প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছে বাংলা মিডিয়াগুলো। ধর্মকে নিয়ে এসব লেখকরা যাচ্ছেতাই লিখে যাচ্ছেন। এসব কথা যে বাজে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু এর প্রভাব কতটুকু সে কথা নিয়ে কি ভেবেছি? এসব বাজে লেখার প্রভাব যে কি হতে পারে, উপরোল্লিখিত ঐ হালাল গ্রোসারী দোকানের মুসলমান মালিকই এর প্রমাণ। সত্যিকার মানবধর্ম যদি মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তবে আলো দেবে কিসে? যদি ধর্মান্ধতা বলতে কিছু থেকেই থাকে তবে তা অবশ্যই ইসলামধর্মের সাথে সম্পূর্ণ

সম্পর্কহীন। ইসলাম মানুষকে চাক্ষুষ্মান করেছে। অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করেছে। তালাবদ্ধ হৃদয়কে উন্মোক্ত করেছে। মানুষকে আল্লাহর দাসে পরিণত করে তাকে মানুষ আর প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। জাহেলিয়াতের যুগে আল-কুরআনের নূর এসে উজ্জ্বল করেছে ধরার কোল। ইসলামকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, প্রগতিবিরোধী প্রভৃতি বানোয়াট ধর্ম বলে ব্যাখ্যা দিতে দিতে মানুষের মগজকে, মননকে, হৃদয়কে সম্পূর্ণ কলুষিত করে দেয়া হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক এ আগ্রাসন চলছে অনেকদিন যাবৎ। প্রচার মিডিয়ায় ইসলামী লেখক, বুজীবীদের কোন স্থান, অধিকার-আধিপত্য না থাকায়ই এটা সম্ভব হয়েছে।

তবে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে নেই। আশাবাদী হয়ে থকা ইসলামের শিক্ষা। দীর্ঘ সুড়ঙ্গের শেষে আজ কিছুটা আলোর আভা ফুটে উঠছে। একাধিক বাংলা মিডিয়া এই সুদূর বিলেতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বল্প হলেও, ইসলামপন্থী তথা হকপন্থী লেখকরা ইসলামের আসল রূপ তুলে ধরতে পারছেন। এর জন্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেই হয়। এটুকুও হবে কি না, আজ কদিন আগেও অনেকের সন্দেহ ছিলো। এবার ঐ গ্রোসারী দোকানের ভদ্রলোকের মতো বিভ্রান্ত, মিডিয়া দ্বারা দিকহারা মুসলমানদেরকে ইসলামের পথে, আলোর পথে, সৎপথে, সভ্যতার পথে, চাক্ষুস্মানতার পথে ফিরে আনতে লেখকদের কলম চালাতে হবে। সর্বোপরি ইসলাম বিরোধী মুসলিম নামধারীদের কলমকে প্রতিহত করতে হবে। তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে পাল্টা হামলা চালাতে হবে। কুরআন, হাদীস, ইসালামী ইতিহাস-ঐতিহ্য-সিভিলাইজেশনের আলোকে এদের লেখা, কথা ও বিবৃতির সমুচিত জবাব দিতে হবে। দেশ-বিদেশে গড়তে হবে একঝাঁক হক্বপন্থী তথা ইসলামপন্থী লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী। ইসলামী মিডিয়াই যথেষ্ট নয়, এতে লেখার জন্যও সুলেখকদের প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামী নবজাগরণের চেতনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইংরেজী, আরবী এবং বিভিন্ন ভাষায় পত্র-পত্রিকাসহ অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আজকাল প্রচুর লেখালেখি প্রকাশ পাচ্ছে। এ থেকে আমরা অনেকটা আশাবাদী হতে পারি। তবে বাংলা ভাষায় কিন্তু ইসলামী চর্চা এখনো সীমিত। অথচ ইসলামের উপর স্বল্পজ্ঞানী বাংলা ভাষার

পণ্ডিতদের অভাব নেই। পশ্চিমা ধর্মদ্রোহী শিক্ষা-দর্শন এদেরকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই এরা (মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের দেশের এমএ ডিগ্রীধারী অনেকেই এ্যারিস্টটল, সর্কেটিস, মার্কস, এঙ্গোল, বার্কেলী, কান্ট, ডেকা, রাসেল প্রমুখ পশ্চিমা দার্শনিকদের ব্যাপারে পারদর্শী। কিন্তু আপনি তাদেরকে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনুল আরাবী, আল-ফারাবী, আল-গাযালী (রাহঃ) প্রখুম মুসলিম জ্ঞান-তাপসদের কথা জিজ্ঞেস করুন। অন্তত ৯০ শতাংশ হয়তো বলবে এরা কারা, এদের কথা তো শুনিনি? এ হচ্ছে আজকের বাস্তবতা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ব্রেন-ওয়াশ হয়ে অসংখ্য শিক্ষিত পুরুষ ও নারী বেরিয়ে আসছে। এরাই পরে বুদ্ধিজীবী সেজে ইসলামবিরোধী অপতৎপরতায় নেমে যায়। বিপথগামী করে আমাদের সমাজকে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হয়তো জিহাদের প্রয়োজন দাঁড়াবে, কিন্তু তার আগে কলমের জিহাদ করতে হবে। আর এ জিহাদই বড় জিহাদ। বৃহত্তর এ জিহাদে জিততে না পারলে কষ্মিমকালেও ইসলামী আইন, আকীদা, হুকুমাত, সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সুতরাং বাংলা ভাষাভাষী ইসলামপন্থী লেখকরা শুধু নিজেরাই লিখে ক্ষান্ত হলে চলবে না। ইসলামী শক্তিশালী মিডিয়া সৃষ্টি এবং নতুন লেখক তৈরীর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। হুজুরে পাক (সাঃ) বলেছেন: যারা দ্বীনের উপর লেখাপড়া ও চর্চা করে এরা আল্লাহর ছাত্র। সচেতন আস্তিক লেখকদের উচিত আজকের বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী এক বৃহৎ আল্লাহর ছাত্রদল সৃষ্টি করতে একান্ত নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসা। নতুন শতকে ইসলামী নবজাগরণের পূর্বশর্তই হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক এই শক্তিশালী দল গঠন করে বিপক্ষ লেখকদের লেখালেখির প্রভাব সমূলে উৎখাত করে দেয়া। আজ ইসলামপন্থী বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের এটাই সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ।

লন্ডন, ৫/১১/১৯৯৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দেশব্যাপী খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী

আধুনিক যুগের চাকচিক্য ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জটিল জীবনপদ্ধতি আমাদেরকে দ্বীনিয়্যাত ও বিশেষকরে আত্মশুদ্ধির রাস্তা থেকে দূরে সরে দিচ্ছে। শরীয়তের উপর অটল থেকে তাছাওউফের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বা রূহানিয়্যাতের উন্নয়ন ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ পাক 'শুধুমাত্র' তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে এটা মনে করা কখনো ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পাক মানুষ ও জিনদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী! আসলে তিনি সকল মুখাপেক্ষীতার ঊর্ধ্বে। বাস্তবে আপনি ও আমাকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতির ইহকালীন জিন্দেগী নিশ্চিত ও সুন্দরকরণে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সুচারুরূপে। একটু ভেবে দেখুন, এই মহাবিশ্বের সবকিছু, এমনকি আমাদের দেহও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের খিদমাতে নিয়োজিত আছে। এতো পরিকল্পনা, এতো জটিল তন্ত্র, এতো আয়োজন- এ সবই মানুষের জন্য। সুবহানাল্লাহ! এই ব্যাপারটি অনুধাবন শেষে কী করে মানুষ মহান প্রভুর অবাধ্য হতে পারে? কিভাবে তাঁর ইবাদাত থেকে গাফিল থাকতে পারে? কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ ঠিক এই অবস্থা সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপরে আমি যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তুলে ধরেছি, আমার ধারণা তার উপর মুসলমানদের অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। একজন সাধারণ মুসলমানকেও যদি এসব ব্যাপার বলা হয় তাহলে তিনি বলবেন, ঠিক কথা। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ মানুষ আজ ধর্মকর্ম ও রূহানিয়্যাত থেকে দূরে। এর কারণ কী হতে পারে? মানুষের সৃষ্টিমূলে দু'টি ব্যাপার মৌলিকভাবে কাজ করে: ভালো ও মন্দের দিকে ধাবিত হওয়া। মানুষ স্বভাবতই মন্দকে পরিহার করে উত্তম পন্থায় জীবন-যাপন করতে চায়। তাহলে কোন্ জিনিসটি তাকে উত্তম রাস্তা থেকে সরিয়ে খারাপ রাস্তায় নিয়ে পতিত করে? এই জিনিসটি আর কিছু নয়, তাহলো আমাদের নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তি।

কাম রিপু, জবানের অন্যায়, রাগ, মনোমানিল্যতা, হিংসা, দুনিয়ার প্রতি অতি মুহাব্বাত, খ্যাতির আশা, কৃপণতা, লোভ, লোক দেখানো প্রবণতা, আত্মগর্ব, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি মানবিক কুস্বভাব অন্তরে প্রবল করে ঐ নফসে আম্মারা।

উপর্যুক্ত কুস্বভাবগুলোকে পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে উত্তম কিছু সুস্বভাব নিজেদের জীবনে পাকাপুক্ত করে নেওয়ার মাধ্যমেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এসব সুস্বভাব হলো তাওবাহ অর্থাৎ গোণাহসমূহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, কৃতজ্ঞতা (শোকর), আল্লাহর শাস্তির ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত রাখা, আল্লাহর করুণার উপর ভরসা, দুনিয়া বিমুখতা ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ, আল্লাহর তাওহীদের উপর দৃঢ়তা ও তাওয়াক্কুল অর্জন, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি আগ্রহ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাবতীয় আমল ও ইবাদাত করা (ইখলাস), লক্ষ্যবস্তুর উপর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন, সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে থাকা, আল্লাহর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর দৃঢ় থেকে জীবন-যাপন করা, আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ফিকির ইত্যাদি। এসব গুণাবলী অর্জন তেমন সহজ নয়। তবে এগুলো অর্জন অবশ্যই সবার কাম্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই এসব গুণাবলী অর্জনের কিছু নির্দিষ্ট পন্থা গুণিজন অনুসরণ করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা যে উপায়ে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনে নিজে ও মানুষকে উপদেশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন তাকেই বলে তাছাওউফ।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) 'তরীকুল কলন্দর' নামক কিতাবে বলেছেন, তাছাওউফের সকল মৌলিক ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। যে সকল মানুষ মনে করে যে, তাছাওউফ কুরআন-হাদীসে নেই, তাদের এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। অর্থাৎ উগ্রপন্থী সূফী ও রূহানিয়্যাত শূন্য আলিমদের ধারণা এই যে, কুরআন ও হাদীস তাছাওউফশূন্য। কিন্তু বাস্তবে উভয় শ্রেণীর ধারণাই ভুল। রূহানিয়্যাত শূন্য আলিমদের বক্তব্য হলো- তাছাওউফ কোন বস্তুই নয়, এগুলো সব বাজে কথা। শুধু নামায রোযা ইত্যাদি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এবং এগুলোই করণীয় মাত্র। সূফীরা আবার এ কোন ঝগড়া সৃষ্টি করলো!

সুতরাং বলা যায় যে, এসব আলিমের মতে কুরআন হাদীস তাছাওউফ শূন্য। উগ্র সূফীদের বক্তব্য হলো যে, কুরআন হাদীসে শুধু জাহিরী বিধি-বিধান রয়েছে। তাছাওউফ হচ্ছে বাতিনী ইলম। (নাউযুবিল্লাহ্) তাদের নিকট কুরআন হাদীসেরই প্রয়োজনীয়তা নেই। মোটকথা এই দুই শ্রেণীই কুরআন হাদীসকে তাছাওউফশূন্য মনে করেছে। তাই নিজ নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে একশ্রেণী তো তাছাওউফকে ত্যাগ করলো, আর অপরটি ত্যাগ করলো কুরআন-হাদীসকে।

ইতিহাসব্যাপী একদল তথাকথিত শরীয়ত পরিত্যাগকারী সূফী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আসছিলো। এদের তৎপরতা আজো বিদ্যমান। কিন্তু এদের কারণে বলা যায় না, তাছাওউফ ভণ্ডামী! আসলে দুনিয়াদারিত্ব সকলশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এর ফলেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। ভণ্ডরা দুনিয়া হাসিলের লক্ষ্যে ভণ্ড সূফী সেজে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তাছাওউফের গুরুত্ব বিরাট। কিন্তু সঠিক কামিল মুর্শিদ ছাড়া এই রাস্তায় অগ্রসরের বিকল্প নেই। আর বড়ো পরিতাপের বিষয় আজকের দুনিয়ায় দিন দিন কামিল মুর্শিদ তথা আল্লাহর খাস ওলিদের সংখ্যা কমে আসছে। অপরদিকে রূহানী রোগীদের সংখ্যা গণনাতীত। কামিল মুর্শিদ হলেন রূহানী রোগের চিকিৎসক। উপরোক্ত উত্তম চরিত্রগঠন ও গুণাবলী অর্জনে রূহানী চিকিৎসকের প্রয়োজন। তাছাওউফের রাস্তায় না নেমে নিজেদের আত্মশুদ্ধি খুব অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে থাকে। আর পরিতাপের বিষয় যে, আজ আমরা এই আত্মশুদ্ধির রাস্তায় নামতে রাজী নই। শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং কিছু অপরিপক্ক 'জ্ঞানী' মানুষের বৈরিপূর্ণ উক্তির উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। তাছাওউফের গুরুত্ব অনুধাবন থেকে বঞ্চিত থাকার ফলেই আজ সমাজে নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। কারণ আত্মশুদ্ধি ছাড়া সত্যিকার অর্থে নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে গিয়ে যতোই নীতি-নৈতিকতার দর্শন শিক্ষা হোক না কেন, তার প্রভাব খুব অল্প ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। আত্মিক পরিশুদ্ধতা শুধুমাত্র কিতাবী উত্তম উপদেশবাণী থেকে অর্জন হয় না। দর্জি হতে হলে দর্জির কাজ হাতেকড়ি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হয়। অনুরূপ কেউ কোনদিন শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করে ডাক্তার হতে পারে নি।

প্রত্যেক কাজই সঠিকভাবে শেখার একটি পূর্বশর্ত হলো প্রাকটিকেল ট্রেনিং। তাছাওউফও আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বৈ কিছু নয়। আর যে কোন শিক্ষার্জনের আরেক শর্ত হলো উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া। উস্তাদ ছাড়া নির্ভুল শিক্ষার্জন হয় না। তাছাওউফের মাধ্যমে আল্লাহর সঠিক পরিচিতি লাভ, কুস্বভাব পরিত্যাগ, সুন্নাত তথা শরীয়তের পাওবন্দ ও উত্তম গুণাবলী অর্জনেও একজন পরিপক্ক, উপযুক্ত কামিল শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়। সুতরাং সঠিক পীর ছাড়া তাছাওউফের রাস্তায় অগ্রসরের বিকল্প কোন উপায় নেই।

খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। তাছাওউফচর্চা ছিলো সার্বজনীন ব্যাপার। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান ছিলো ইলমে তাছাওউফের মাধ্যমে নফসের ইসলাহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য খানক্বাহ। এসব খানক্বায় কামিল মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকে গণনাতীত মুসলমান শরীয়ত, তরীকত, হাক্বিকাত ও মা'রিফাতের সুপেয় সুধাপানে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। ইসলামী জীবন এসব খানক্বার ওয়াসিলায় ছিলো উন্নততর। কিন্তু দুঃখের বিষয় অমুসলিম ও কিছু মুসলমান নামধারী ব্যক্তিদের অপপ্রচার ও পশ্চিমা উপনিবেশ থেকে সৃষ্ট প্রচণ্ড চাপের মুখে আমরা খানক্বাভিত্তিক তাছাওউফচর্চাকে হারিয়েছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে, তাছাওউফের মাধ্যমে কোন ফায়দা হয় না (নাউযুবিল্লাহ্)। চরম দুনিয়াদার বানিয়ে আমাদেরকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে ঈমানদার বান্দাহ হিসাবে প্রভুর দরবারে ফিরে যাওয়াই হলো সে উদ্দেশ্য। এরই মধ্যে শুধু যে আখিরাতের মহান স্থায়ী কল্যাণ নিহিত তা নয়, বরং দুনিয়াবী অসংখ্য ফায়দা আছে। নৈতিক উন্নয়নহীন জাতি অধঃপতিত হতে বাধ্য। আর দর্শন অধ্যয়ন দ্বারা যে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় না- তার প্রমাণ মানবেতিহাসে বার বার মিলেছে। বৈষয়িক উন্নয়ন দ্বারাও মানুষের নৈতিক উন্নয়ন হয় না। বাস্তবে বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণ প্রয়োজন তা-ও কিন্তু তাছাওউফ থেকে অর্জিত হতে পারে। এর ফলেই অতীতে শত শত মুসলিম গুণিজনের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা একদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করেছেন আর অপরদিকে তাছাওউফের

মাধ্যমে নিজেদের নফসের ইসলাহ্ করে জীবনকে ধন্য করেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে।

তাছাওউফ মূলত দ্বীন ও ঈমানের প্রাণকেন্দ্র। মাদ্রাসা শিক্ষায় আজকাল তাছাওউফের উপর গুরুত্ব তেমন বেশী দেওয়া হয় না। কিন্তু 'কওমী' মাদ্রাসার 'মা' বলে স্বীকৃত দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তাছাওউফচর্চা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলো। বলতে দ্বিধা নেই, এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইলমে জাহিরের সঙ্গে তাছাওউফচর্চা সম্পৃক্ত থাকার ফলেই এখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন জগতখ্যাত আলীম ও গুণিজন। বাংলাদেশে এখন হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষাসূচীতে তাছাওউফ শাস্ত্রকে বাধ্যতামূলক করা এখন একান্ত জরুরী। এর ফলে ফারিগ-হওয়া আলিমদের থেকে বৃহত্তম জনগোষ্ঠি শরীয়ত ও মা'রিফাত তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবিধানের উপর দিকনির্দেশনা পেয়ে উপকৃত হবেন।

দ্বিতীয় আরেক গুরুত্বপূর্ণ মুভমেন্ট আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর পূর্বে ভারত থেকে শুরু হয়েছে। আমল ও ঈমানের পরিপক্কতার এই মুভমেন্টের নাম 'তাবলীগ জামাআত'। আলহামদুলিল্লাহ! এ পর্যন্ত এই জামাআত দ্বারা পুরো বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়ে আসছেন। আমল ও ঈমান সঠিককরণের এই উত্তম পন্থাটি কিন্তু সবাই সুদৃষ্টিতে দেখেন না। আমি জানি না কেনো দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি কোন মানুষের বৈরিভাব থাকবে? তবে ব্যাপার হলো, উপরে উল্লেখিত মাদ্রাসা শিক্ষা এবং তাবলীগ জামাআত দ্বারা বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধি আসবে না। এর কারণ হলো সবাই মাদ্রাসার ছাত্র নন বা হবেন না এবং সকলে তাবলীগ জামাআতেও যাবেন না। বাস্তবে এক বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠি প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল। এবং আরেক বড় বৃহৎ দল তো কোন ধরনের শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত। সুতরাং পুরো মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় থেকে দূরে সরে আছেন। আর এ কারণেই তৃতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি তথা ইলমে তাছাওউফের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদেরকে নতুনভাবে পুরো দেশব্যাপী গড়ে তুলতে

হবে শত শত খানক্বাহ। এসব খানক্বায় যে কোন স্তরের মানুষ এসে তার দ্বীনিয়্যাতকে সঠিক করে নিতে সক্ষম হবে।

আমার ধারণা এখনও আমাদের মাঝে অনেক কামিল পীর-বুজুর্গ বিদ্যমান আছেন। খানক্বাহ প্রতিষ্ঠায় তাঁদের চিন্তা-ফিকির একান্ত কাম্য। কারণ খানক্বায় এসে মানুষ তাঁদের হাতেই বাইআত গ্রহণ করে নিজেদের আমল-ঈমান পরিপক্ক করবে। আমি নালায়েক শ্রদ্ধাভাজন সকল পীর-মাশায়েখ মহাত্মনদের দরবারে এই বলে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, তরীকতের মহান ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন, মানুষের নফসের ইসলাহের রাস্তা উন্মুক্ত করুন। দেশব্যাপী নতুনভাবে খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করে জিকির-মুরাকাবা, আমল-ঈমানের দিকে মানুষকে ধাবমান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বস্তরের সর্বপেশার মানুষের জন্য উন্মুক্ত করুন আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে তরীকতের খানক্বাহ। দিনে নয়, সপ্তাহে নয়- মাসে একবারও যদি মানুষ এসব খানক্বায় এসে হক্কানী পীর মাশায়িখদের সান্নিধ্যে থেকে জিকির আজকার করেন তাহলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। আজকের ঈমান-আমলে দুর্বল মুসলিম জনগোষ্ঠির ভসরাস্থল হবে এসব খানক্বাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাছাওউফ, তরীকা ও ইসলাহে নফসের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায় হোন। আমীন।

সিলেট, ৩/১২/২০১৩।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়

আমরা সবাই সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনে মিলে সময়ের সাথে আমাদের পরিচিতি। আমাদের অস্তিত্ব সময়ের ঊর্ধ্বে নয় বরং এর ভেতরে। আমরা সর্বদাই বর্তমানের উপর বাস করি। অতীত থাকে আমাদের স্মরণে, কাগজে, ইতিহাসে আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই বাস করে আমাদের নাগালের বাইরে। সময়ের ক্ষয় ও অবক্ষয় থেকেও আমরা কেউ মুক্ত নই। চলমান সময় আমাদের দেহ-মন-প্রাণে ক্রিয়া করে একদিন নির্দিষ্ট ক্ষণে কবরে নিয়ে যায়।

বস্তুজগতে সময় সদাক্রিয়াশীল। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুর জন্ম হয়, ক্ষয়, পরিবর্তন এবং ধ্বংস হয়। এই সময় যদি চলমান না থাকতো তবে সবকিছু অনড়, অক্ষয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো। সর্বাদিক মহাসত্য এই সময় জিনিসটি আসলে কি? বড় জটিল প্রশ্ন বটে।

সময়কে বুঝার জন্য যুগ যুগ ধরে কত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মাথা ঘামিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সময়কে চেনা যে কতো কঠিন তা এক ঘটনা থেকে জানা যায়। কথিত আছে একদা এক বিদেশী বয়োবৃদ্ধ দার্শনিক লন্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি টেমস নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর তরঙ্গদোলা অবলোকন করছিলেন তন্ময় হয়ে। এসময় তার মতো আরেক বিদেশী পর্যটক এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হুয়াট ইজ টাইম? দার্শনিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, এটা জানার জন্য যুগ যুগ ধরে কাতো বিজ্ঞানী ও দার্শনিক চেষ্টা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই! বলাই বাহুল্য দার্শনিকের মুখ থেকে এরূপ কথা শ্রবণ করে ঐ লোকটি ভাবলেন, এ বৃদ্ধ পাগল-ছাগল হবে! কারণ তিনি জানতে চেয়েছিলেন বিকেল কটা হয়েছে, কিন্তু লোকটি কি অদ্ভুত জবাবই না দিলেন! আসলে দার্শনিকের জবাবই সঠিক ছিলো, কারণ লোকটি তো ইংরেজী ভাষায় কাঁচা থাকায় প্রশ্ন করে বসেছেন বড়টি। সময় কি? এটা তো দর্শন ও বিজ্ঞানের ‘সিকস্টি ফোর মিলিয়ন ডলার কুয়েশ্সন’। তবে

প্রশ্নকারী যদি বলতেন, হুয়াট টাইম ইজ ইট? তবে হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত জবাব পেতেন।

প্রথমে রহস্যজনক অথচ সার্বজনিন এই টাইম বা সময় সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা কি, তা আলোচনা করে দেখা যাক। এরপর এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতমালায় সময় সম্পর্কে মহাপ্রভূর বাণীর উপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা ও ওহীর জ্ঞানের সাথে সবশেষে কিছু তুলনামূল আলোচনা করে সময়কে চেনার ক্ষেত্রে কিছুটা আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

সময় সম্পর্কে বিজ্ঞান ও দর্শন যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালানোর পর অবশেষে বিংশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) এর একটি সংজ্ঞা দেন। গণিত ও ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তাঁর এ ব্যাখ্যা এখন বিজ্ঞানজগতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর মতে সময় তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বস্তু জগতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি উপাদান। আমরা মূলত চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থান-কাল-চলমান (স্পেইস-টাইম-কন্টিনিউয়াম) জগতে বাস করি। আইনস্টাইন তাঁর প্রখ্যাত রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিতা থিওরীর মাধ্যমে এ সত্য দেখিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আপেক্ষিকতা বুঝিয়ে বলা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে সময় সম্পর্কে এ থিওরী থেকে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে তা অবশ্যই ধারণাতীত। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন আলোকের গতির সাথে সময়ের সম্পর্ক আছে। কেউ যদি আলোকের গতির কাছাকাছি চলতে পারে (আলোকের গতি প্রায় ১,৬৮,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) তবে সময় তার উপর দিয়ে অনেকটা ধীরে চলবে। অর্থাৎ এ উচ্চগতিসম্পন্ন ভ্রমণকারীর বয়স বৃদ্ধি হবে অনেক আস্তে আস্তে! এ অদ্ভুত কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পরবর্তীতে একাধিকবার এর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার জন্য সুইজারল্যান্ডে স্থাপিত একটি পার্টিকেল একসেলেরেটর বা অণু-পরমাণু গতিশীল করার একটি মেশিন ব্যবহার করেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, কিছু পরমাণুর স্থায়িত্বকাল যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় হাফ-লাইফ বলে, নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোকের কাছাকাছি গতিতে এগুলো চালিত করার পর তা সম্ভব হয়েছে।

সময় সম্পর্কে আইনস্টাইন আরোও অনেককিছু বলেছেন। যেমন, সময়ের শুরু ছিলো এবং শেষ হবে। এর শুরু হয় জগতসৃষ্টির মুহূর্তে এবং শেষ হবে জগত ধ্বংসের কালে। সময় আপেক্ষিক, অর্থাৎ একেকজন দর্শকের কাছে সময় একেক রকম হয়ে থাকে। বিশ্বজনিন কোন সময় নেই। সময় মূলত: লকেল। বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের থিওরী অনুসরণ করে আরো আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের দেহে বায়োলজিক্যাল ঘড়ি আছে। দেহের প্রতিটি কোষে এই ঘড়ি ক্রিয়া করে আমাদেরকে বুড়ো করছে।

এ হচ্ছে সংক্ষেপে সময় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা। সময় যে মূলতঃ আপেক্ষিক এ কথাটিই বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। এবার পবিত্র কুরআন শরীফের দুটি আয়াতে সময় সম্পর্কে আল্লাহ পাক মানুষকে যে ধারণা দিয়েছেন তা আলোচনা করে দেখা যাক।

কুরআন শরীফের আয়াতদ্বয় হচ্ছেঃ ১. তারা আপনার কাছে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না, (কিন্তু শোন) আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান [সূরা হজ্ব : ৪৭]। এবং ২. তা আসবে (কিয়ামত দিবস) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তায়ালার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর [সূরা মাআরিজ : ৩-৪]।

পথমোক্ত আয়াতে 'তোমাদের গণনায় এক হাজার' বছর কথাটি এখানে চিত্তাকর্ষক। এতে এটাই বুঝা গেল সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটেই সর্বত্র একই ধরণের নয়। আমরা যেখানে মনে করি হাজার বছর চলে গেছে সেখানে বিশ্বপ্রভূর কাছে একদিনের সমান। এই একদিন উক্তিটাও কিন্তু আপেক্ষিক, কারণ সময় তো আসলে আল্লাহর আয়ত্বে। দ্বিতীয় আয়াতে ৫০ হাজার বছর ব্যক্ত হওয়াটাই এর প্রমাণ। তাঁর কাছে মূলত আমরা যেভাবে সময়কে বুঝি এরূপ কোন সময়ের প্রয়োজন বা অস্তিত্ব নেই। কারণ আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী, তিনি সবকিছু (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) একই মুহূর্তে অবলোকন করেন। সময়ের আবর্তন থেকে তিনি মুক্ত- এ জন্যই একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ এ গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। কারণ যাবতীয় সৃষ্টি মূলতঃ সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। এ মহাবিশ্ব

এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করে আল্লাহ্ পাক সময় নামক একটি অতিরিক্ত উপাদান দ্বারা এর আওতার ভেতর সবকিছুকে বন্দী করে দিয়েছেন। উদ্ধৃত আয়াত দুটো কিয়ামত দিবস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। একটি হাদীস আছে: আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনা: সাহবায়ে কেরাম এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার প্রাণ যে সত্তার করায়াত্ব, তাঁর শপথ করে বলছি, এই দিনটি একজন মুমিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে [তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন থেকে উদ্ধৃত]।

এ হাদীস থেকেও সময়ের আপেক্ষিকতার প্রমাণ পরিষ্কার হয়েছে। কিয়ামত দিবস কারোর জন্য (মুমিনদের জন্য) অল্পমেয়াদী হবে আবার কারোর জন্য (কাফীরদের জন্য) হবে সুদীর্ঘ কষ্টময়। এখন প্রশ্ন জাগে একই দিন বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন কিরূপ হতে পারে? উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (আইস্টাইনের আপেক্ষিতা) থেকেই এর জবাব মেলে। এই সৃষ্ট জগতেই যদি আলোকের গতির সমপরিমাণ গতিতে চলে কোন বস্তু বা মানুষ সময়ের প্রক্রিয়াকে ধীরগতিসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তবে এই সময়ের সৃষ্টিকর্তা কি ইচ্ছা করলে একেক জনের উপর সময়কে একেকটি আলাদা গতিতে পরিচালিত করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।

সময়ের আপেক্ষিকতার ব্যাপারে টুইন প্যারাডক্স নামক একটি অত্যাশ্চর্য কাল্পনিক গল্প বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাল্পনিক হলেও এটা সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যা হউক, গল্পটি এই: একদা সুইজারল্যান্ডের একজন নভোচারী সিদ্ধান্ত করলেন, তার আলোকের কাছাকাছি গতিসম্পন্ন রকেটসীপে পৃথিবীর নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেন্টরীতে ভ্রমণে যাবেন। বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা তাকে জন বলে সম্বোধন করবো। জনের এক জময (টুইন) ভাই ছিলেন, তাকে আমরা জোহান বলে ডাকবো। জময, তাই দু'ভাইয়ের বয়স একই ছিলো এবং তা হলো ৪৭ বছর। জন নির্দিষ্ট দিনে তার জময ভাই জোহানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রকেটে আরোহণ করলেন এবং বললেন, ভাই

জোহান, তোমার সাথে আট বছর পর দেখা হবে। গুডবাই। জনের মাহাকাশযান দ্রুত উপরের দিকে উঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। জনের আট বছর বলার পেছনে রহস্য হলো, প্রক্সিমা সেন্টরী তারাটি পৃথিবী থেকে চার আলোক-বছর (আলো যেতে চার বছর সময় লাগে) দূরে অবস্থিত। সুতরাং আলোকের কাছাকাছি গতিতে সেথা পৌঁছে ফিরে আসতে অন্তত আট বছর সময় লাগবে।

যা হউক, সময় যেতে লাগলো। পৃথিবীতে থেকে জোহান তার ভাইয়ের আগমণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। আট বছর তো আর কম দিন নয়। জোহান বিয়ে করলেন এবং দুটি সানের পিতা হলেন। একদিন তার অপেক্ষার অবসান ঘটলো এবং জনের প্রত্যাবর্তন দিসব এসে হাজির হলো। রকেট স্টেশনে তিনি সপরিবারে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। জন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে অবতরণ করলেন। এতোদিন পর ভাইকে দেখার জন্য জোহান ছুটে গেলেন রকেটের কাছে। জন বেরিয়ে আসলেন, কিন্তু জোহান তাকে চিনতে পারলেন না। তার নিজের অর্ধেক দাড়ি পেকে গেছে, অথচ জনের তো অবস্থা সেই আট বছর আগে যেরূপ ছিলো ঠিক সেরূপই রয়েছে! সে তো ৫৫ বছর বয়স্ক লোক বলে মনে হয় না! জনও তার ভাইয়ের অবস্থা দেখে একেবারে থ! কি ব্যাপার? এই একদিনে আমার ভাইয়ের বয়স এতো বৃদ্ধি পেল কি করে! দুভাই একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন- ঠিক এসময়, এক বয়োবৃদ্ধ লোক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি জময দুভাইয়ের দিকে গভীরভাবে তাকালেন তারপর মৃদু হেসে বললেন, আরে! তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? তোমরা আমার আপেক্ষিকতার কথা শুনোনি বুঝি!

জন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? কি বলতে চান?

বৃদ্ধ বললেন, আমি আইনস্টাইন। তোমাদের মধ্যে বয়সের তারমত্য কিভাবে সৃষ্টি হলো তা বলে দিতে চাই।

বলুন। বললেন জোহান।

বৃদ্ধ এবার বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, জন যেহেতু আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ করেছেন তাই তার উপর দিয়ে সময় অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে, অপরদিকে জোহানের উপর দিয়ে সময় স্বাভাবিকভাবেই

চলেছে। তাই তার বয়স আট বছর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনের বয়স মাত্র একদিন বেড়েছে। সময় এরূপই গতির সাথে আপেক্ষিক।

এটাই টুইন প্যারাডক্স গল্প। সময় এভাবে গতির সাথে অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া করে থাকে। সময় এমন এক বস্তু যার সঠিক পিরিচিতি আমাদের জানা নেই। তবে এর প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা কেউ মুক্ত নয়। আল্লাহ্ পাক এই অত্যাশ্চর্য অদেখা অথচ সদাসক্রিয় একটি উপাদান সৃষ্টি করে প্রাণী এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সময় নামক এই অদ্ভুত জিনিষটি সম্পর্কে একামাত্র আল্লাহ্ পাকই সম্যক জ্ঞাত, যিনি এর সৃষ্টিকর্তা।

সিলেট, ২০০৫।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রাথমিক যুগের মহাত্মন সাধকদের বাণী থেকে

আত্মশুদ্ধির সাধনা

প্রাথমিক যুগের মহান সাধক, প্রখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত ওয়ায়েস করণী (রাহঃ) বলেনঃ "যিনি আল্লাহকে চিনেন, তিনি আর কাউকে চিনেন না, আর তিনিই সর্বোত্তম।" [তাজকেরাতুল আউলিয়া] তিনি আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয়েছে, তার কাছে আর কোন কিছুই গোপন নয়। আর তাঁর মাধ্যমে আল্লাহকে জানা সম্ভব হয়।" [ঐ]

হযরত ওয়ায়েস করণী (রাহঃ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় ইয়ামনবাসী এক প্রখ্যাত সাধক ছিলেন। তবে তিনি কোনদিনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন নি। এ কারণে তিনি সমকালীন হওয়ার পরও সাহাবী ছিলেন না। আশিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসেবে তাঁর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উহুদের যুদ্ধে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মুবারক শহীদ হয়েছে জানতে পেরে তিনি নিজের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাঁর পবিত্র জীবন সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিফহাল। ইলমে মা'রিফাত তথা আল্লাহ পরিচিতির সাধনা ও ফিকির ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর এই 'আল্লাহপরিচিতি'র অপর নামই হলো ইসলামী রূহানিয়্যাত।

আগের যুগে সত্যিকার আধ্যাত্মিক সাধকদের সংখ্যা ছিলো অনেক। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পরবর্তী যুগকে বলে তাবেঈনদের যুগ। এ যুগের একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন হযরত হাসান বসরী (রাহঃ)। ইলমে মা'রিফাত হাসিলের উদ্দেশ্যে ইস্তিখারা, মুরাকাবা ও মুশাহাদা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "এগুলো হচ্ছে এক স্বচ্ছ আরশির মতো। এতেই সবার সৎ ও অসৎ ক্রিয়াকলাপ এবং চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। যখন দেখবে তোমার মানসিক এই আয়নায় শুধু সৎ চিন্তাগুলো ভেসে উঠছে, তখনই তুমি মনে করবে- তুমি সঠিক পথে আছো। আর এতে অসৎ চিন্তাগুলো ভেসে উঠলে মনে করো, তুমি এখনও বিপথগামী আছো।" [তাজকেরাতুল আউলিয়া]

অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকের মতে ইলমে তাছাওউফ তথা আত্মশুদ্ধির সাধনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে 'আসহাবে সুফ্‌ফা' বা সুফ্‌ফাবাসী আসহাব (রাঃ) একদল সাধক ছিলেন। এরা ইলম ও আত্মশুদ্ধি হাসিলের সাধনায় সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। অনেকে বিয়ে-সাদী পর্যন্ত করেন নি দারিদ্র্যতা হেতু। তবে তাছাওউফ শব্দব্যবহার ও প্রচলিত প্রণালীবদ্ধ উপায়ে আত্মশুদ্ধি সাধনার সুত্রপাত ঘটে হযরত হাসান বসরীর (রাহঃ) মাধ্যমে। তিনিই সর্বপ্রথম 'খানাক্বাহ' তৈরি করেন, যেখানে আধ্যাত্মিক সাধকরা আল্লাহর যিকির-মুরাকাবা করতেন। তাঁর সমকালীন অনেক সাধকের মধ্যে একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ তাপসী হযরত রাবিয়া বসরী (রাহঃ)। এই মহিয়সী মহিলা সুফিয়ার জীবন ছিলো বিচিত্রময় ও চিত্তাকর্ষক। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাঁকে জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ একজন অতি সাধারণ ক্রীতদাসী হিসেবে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি সারাদিন কাজ করতেন ও সারারাত কাটাতেন আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে। আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছিলেন এই মহিলা ওলিয়াআল্লাহ। তিনি বলেনঃ "সব-কিছুরই ফল আছে কিন্তু জ্ঞানের ফল হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন (ফানাফিল্লাহ) হওয়া।" [সূফী দর্শন; ফকীর আব্দুর রশীদ] ইলমে তাছাওউফের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "নিজের গুপ্ত অন্তপুরে যে পাপ, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি বাসা বেঁধে আছে তা ধৌত করে সাফ করতে না পারলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না।" [বাণী চিরন্তনী; কাজী আব্দুল আলীম]

সুতরাং ইসলামে আধ্যাত্মিকতার অপর একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়া। কিন্তু যাকে আপন করে নিতে হবে, যার ইবাদাতের মধ্যে সারাটি জীবন কাটাতে হবে, যিনি নিজেই তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেনঃ "ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লিয়া'বুদূন" - অর্থাৎ, 'আমি [আল্লাহ] জিন ও মানুষ জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নি।' [সূরা যারিয়াত ৫৬] সুতরাং তাঁকে না চিনে, না জেনে কিভাবে সত্যিকার অর্থে ইবাদত করা যায়? তবে হ্যাঁ, এই পরিচিতি কিন্তু বাহ্যিক পরিচিতি নয়।

আমরা যেভাবে একে অন্যকে জানি-চিনি তা থেকে এ পরিচিতি স্বতন্ত্র। কিন্তু পরিচিতি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আর এই পরিচিতির স্তর আছে। যে আল্লাহকে যতো বেশী চিনতে পেরেছেন তিনি ততো উচ্চ পর্যায়ের ওলিআল্লাহ হয়েছেন। সুতরাং ইসলামী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহ-পরিচিতির বিভিন্ন স্তর। এই পরিচিতির সর্বোচ্চ স্তর বুঝাতে গিয়ে হযরত রাবিয়া বসরী (রাহঃ) 'আপনি যাঁর ইবাদত করেন, তাঁকে কি দেখতে পান?' এ প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ "তাঁকে দেখতে না পেলে আমি তাঁর ইবাদত করতামই না!" [তাজকেরাতুল আউলিয়া] এতে বুঝা গেল উচ্চ পর্যায়ের ওলিআল্লাহরা আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন।

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) ও হযরত রাবিয়া বসরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র সমকালীন প্রসিদ্ধ সাধকদের মধ্যে হযরত মালিক দীনার (রাহঃ) এবং হযরত খাজা আবু আলী শাকীক বলখী রাহিমাহুল্লাহ্‌র নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার প্রতি অতি-আসক্তি তাছাওউফপন্থী তথা যে কোন মু'মিনের জন্য বিরাট অন্তরায়। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে এই দুনিয়া মানুষের দুশমন হিসেবে কাজ করে। অথচ এই দুনিয়ায় থাকাবস্থায়ই আল্লাহর মা'রিফাত (পরিচিতি) হাসিল করতে হবে। এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মালিক দীনার (রাহঃ) বলেনঃ "তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি করে দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করো। নিজেকে বাঁচাও এবং অন্যকেও বাঁচাবার পথ প্রদর্শন করো।" [তাজকেরাতুল আউলিয়া] দুনিয়া ছাড়াও খোদাপ্রাপ্তির রাস্তায় সর্বাধিক বড় বাঁধা হচ্ছে আমাদের নফ্‌স। কিন্তু এই নফস দ্বারা আমরা দুনিয়ায় চলাফেরাও করি। তবে যে নফ্‌স মানুষের জন্য ক্ষতিকর তাকে তাছাওউফের ভাষায় 'নফসে আম্মারা' বলে। এটা শয়তান থেকেও মারাত্মক। হযরত মালিক দীনার (রাহঃ) বলেনঃ "যে লোক সর্বদা নফসের অনুগত হয়ে চলে, শয়তান আর তার কাছে বেশী যাতায়াতের প্রয়োজন বোধ করে না। যেহেতু সে মনে করে, এই ব্যক্তির প্রতি শয়তানী ওয়াসওয়াসা তো তার নফসই করে যাচ্ছে!" [তাজকেরাতুল আউলিয়া]

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা হাসিল করা। এ সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের ওলি-আবদালদের ধারণা ও মাক্বামের পর্যায় বুঝতে গেলে আমরা হযরত আবু

আলী শাকীক বলখী রাহিমাহুল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি লক্ষ করে দেখতে পারি। তিনি বলেছেনঃ “যদি আকাশ তাম্রের তৈরি হয়ে যায়, জমিন লোহার হয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি না বর্ষায়, জমিন ফসল না দেয় আর পৃথিবীর সকল প্রাণী আমার পরিবারভূক্ত হয়ে যায়, তথাপি আমি আমার তাওয়াক্কুলকে পরিত্যাগ করবো না।” [তাজকেরাতুল আউলিয়া] রুজি-রোজগারেও তাওয়াক্কুল হাসিল একান্ত জরুরী। তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি স্বীয় রুজির ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করে, তার স্বভাব উত্তম হয়, ইবাদতে তার মনে প্রেরণা জাগ্রত হয়।” [ঐ]

তাবে-তাবেঈনের যুগে অনেক প্রসিদ্ধ সাধক, জ্ঞান-তাপস ওলিআল্লাহ জীবিত ছিলেন। আত্মশুদ্ধির রাস্তায় একেক-জনের ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদেরকে বিস্মিত করে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রাহঃ), হযরত হাবীব আযমী (রাহঃ), হযরত আবু হাযিম মাদানী (রাহঃ), হযরত ইবনে আসলাম রায়ী (রাহঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক মারুযী (রাহঃ), হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ (রাহঃ), হযরত যুননুন মিসরী (রাহঃ), হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বলখী (রাহঃ), হযরত বিশরে হাফী (রাহঃ) ও হযরত সুফিয়ান সওরী (রাহঃ) প্রমুখ ছিলেন সেযুগের অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ক’জন মাত্র।

আল্লাহ পরিচিতির উচ্চপর্যায়ে এসে সাধকদের অনেকেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থাকে ‘বিস্ময়ের’ স্তর বলে অনেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওয়াসে (রাহঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা’আলাকে যে-ই চিনেছে সে-ই নির্বাক-নিস্তব্ধ হয়েছে।” [তাজকেরাতুল আউলিয়া] আল্লাহর বিরাটত্ব, মাহাত্ম্য, অসীমত্ব ইত্যাকার বিষয়বস্তু অনুধাবনের ফলে মানুষকে নির্বাক-অবাক-বিস্ময়তা ছাড়া আর কী বা ভাবার আছে। আবার আল্লাহর প্রতি আসক্তি, প্রেম, তাঁকে পাওয়ার অতিশয় আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যার মধ্যে প্রবল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহকে পেতে বিলম্বে পড়ে হাহাকারে দিন কাটায় তার অবস্থা ভিন্ন। সময় সময় এমন সাধক পাগলপ্রায় হয়ে ঘুরে বেড়ান। জবানে বেরিয়ে আসে অনেক দুর্বোধ্য বাক্যাবলী। এর কারণ হলো তিনি প্রেমাগ্নিতে জ্বলে ছাই হচ্ছেন। মনের মধ্যে সর্বদা অশান্তি, হাহাকার, আর্তি।

হযরত হাবীব আযমী (রাহঃ) ক'টি কথায় এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "যে আল্লাহকে লাভ করতে পারে নি সে সন্তুষ্ট হয় নি।" আর আল্লাহকে লাভ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। একব্যক্তির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারেঃ "হৃদয়কে এমন পরিষ্কার করতে হবে যে, মুনাফিকীর কোন ধূলো-বালি যেন সেখানে না থাকে।" সুতরাং বুঝা গেল মুনাফিকী চরিত্র মানুষের মজ্জাগত অবস্থা। এ থেকে মুক্ত না হতে পারলে ঈমানের স্বাধ পর্যন্ত অনুভূত হয় না। হযরত বায়েজিদ বিস্তামী (রাহঃ) বলেছেনঃ "আমি দীর্ঘ ১২ বছর আল্লাহর যিকির-মুরাকাবা-ধ্যান-ফিকির করে বুঝতে পারলাম, আমার মধ্যকার মুনাফিকীর চরিত্র মোটেই চলে যায় নি। আমার কোমরে বেল্ট আছে। [উল্লেখ্য, সেযুগে জন-পরিচিতির উদ্দেশ্যে চিহ্নিত মুনাফিক ও কাফিরদের কোমরে বেল্ট পরিয়ে দেয়া হতো।] এরপর আমি আরও ১২ বছর সাধনা শেষে দেখলাম এ বাহ্যিক বেল্ট খুলে গেলেও আরেকটি অভ্যন্তরীণ বেল্ট বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং আমি আরও ১২ বছর কঠোর সাধনা করলাম। এবার দেখতে পেলাম আমি বেল্ট থেকে মুক্ত হয়েছি। ঈমানের অপূর্ব স্বাধ আমি অনুভব করলাম। পুরো জগতের রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হলো। সকলের মাঝে মুনাফিকী চরিত্র আমি দেখতে পেলাম।"

ইলমে মা'রিফাতের রাস্তায় সাধকদেরকে নীরবতা পালন করতে হয়। একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ধ্যান-যিকির-মুরাকাবায় থাকতে হয়। কারণ, মানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশায় কিভাবে মনের একাগ্রতা জন্মিতে পারে? এ সম্পর্কে হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ (রাহঃ) সুন্দর উপদেশ প্রদান করেছেনঃ "নিশির আগমনই হলো খুশির কারণ, কেননা তখন নীরবে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়। আর দিনের আগমন হলো চিন্তার কারণ, কেননা তখন শুধু লোকজনের সমাগম আর তাতে ইবাদতে বাঁধার সৃষ্টি হয়।" [ঐ] দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ "দুনিয়া একটি পাগলা-গারদ স্বরূপ! আর তার অধিবাসীগণ পাগল-সদৃশ! কারাগারে যেভাবে কয়েদি হাত-পা শিকলাবদ্ধ থাকে, তারা তেমনি দুনিয়ার অহেতুক মায়া মহব্বতে আবদ্ধ রয়েছে।" [ঐ] এ কথাটি অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পবিত্র সেই বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল যেখানে তিনি বলেছেনঃ "দুনিয়া মু'মিনদের জন্য জেলখানা।"

মা'রিফাতপন্থী হওয়া কঠিন কাজ। সামান্যতম রিয়া বা দর্শনেচ্ছু ভাব প্রকাশ পেলেই সারা-জীবনের সাধনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। [আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন] সত্যিকার আল্লাহ-অন্বেষীদের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত বিশরে হাফী (রাহঃ) বলেনঃ "মা'রিফাতপন্থী সেই ব্যক্তি, যাকে শুধু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, চিনে না এবং সম্মান দেয় না।" [ঐ] তিনি আরো বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি আখিরাতের [অনন্ত জীবনের] স্বাধ লাভ করতে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি সমাজে আত্মপরিচয় ছড়িয়ে দিতে তৎপর থাকে।" [সূফিয়ায়ে কেরামের বাণী] সুতরাং দর্শনেচ্ছু ও যশ-খ্যাতির লিপ্সা, সাধকের রাস্তায় বিরাট অন্তরায়। এরূপ স্বভাব থেকে নিজেকে যে কোন মূল্যে মুক্ত রাখতে হবে। অন্যথায় আখিরাতকে জলাঞ্জলি দেয়া হবে। মা'রিফাত হাসিল করতে যেয়ে যেনো আমরা এরূপ ধোঁকায় না পড়ি, তার জন্য আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই।

ইসলামে আধ্যাত্মিকতার উপর মহাত্মন সুফি-সাধকদের বাণী সম্বলিত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি শেষ করার আগে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর একটি মহা-মূল্যবান বাণী এখানে উদ্ধৃত করছি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা (রাঃ) আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভরসা- তাওয়াক্কুলের ব্যাপক এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে মাত্র একজন লোক বেহেশতে যেতে পারবে না, তাহলে আমি মনে করবো বেহেশতে না যাওয়ার সেই একটি মাত্র অযোগ্য লোক আমি ছাড়া আর কেউ নয়! আর যদি ঘোষণা করা হয়, যাবতীয় মানুষের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেহেশতী হবে- বাকী সকলেই দোযখে যাবে- তথাপি আমি আশা করবো- সেই বেহেশতী লোকটি হয়তো আমি-ই। [তাবলিগী নেছাব ও ইলমে মা'রিফাত] হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে খাঁটি ঈমানদার, তাক্বওয়াশীল, পরহেজগার বান্দায় পরিণত না করে মৃত্যু দিও না। সর্বোপরি তোমার পরিচিতি লাভে আমাদের জীবন ধন্য করো। আ-মিন।

সিলেট, ৬ই জুলাই, ২০০৫।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঈমানের আলোকে বিজ্ঞানশিক্ষা

আমরা এখন ঈসায়ী একবিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশকের দ্বারপ্রান্তে। ইতিহাসব্যাপী প্রত্যেক যুগের একেকটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক গতিধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। সমগ্র মানবসমাজ এসব গাতিধারা দ্বারা সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। একে আমরা 'মানবতার পাল্‌স' বলতেও পারি। এ যুগের এই পাল্‌স হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার। চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে দেখুন, কোন্ স্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাপ নেই- তা খুঁজে বের করা কঠিন হবে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, কৃত্রিম উপগ্রহ, কৃত্রিম বুদ্ধি, ইত্যাদি কোনটি রেখে কোনটির কথা বলবো যাদের দ্বারা সমগ্র মানবজাতি আজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ও সময় সময় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখা সবার জন্যই আজ একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যারা আমরা ঈমানদারদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে তাদের মুকাবিলা কীভাবে করবো?

মহান আল্লাহর নিকট সমগ্র মানবজাতি এক ও অভিন্ন। সবাই তাঁর সৃষ্ট জীবী। কিন্তু তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা না রাখার ক্ষেত্রে মানবজাতি মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত: ১. অবিশ্বাসী (কাফির), ২. অংশীদারী (মুশরিক) ও ৩. বিশ্বাসী (মু'মিন)। শেষোক্ত দলটিই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। মহান রাব্বুল আলামিন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে নিষ্কলুষ তাওহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন- যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এই পবিত্র তাওহিদের ধারক-বাহক আমরাই।

ইতিহাসের আলোকে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটেছে মহানবীর শুভাগমনের পর থেকে। এর আগ পর্যন্ত পুরাতন সভ্যতা মেসোপটামিয়া, মিশর, ভারত ও গ্রিসের বিজ্ঞানচর্চার গতিধারা হোচট খেতে খেতে ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শুরুতে এসে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন পৃথিবীব্যাপী নেমে আসে এক ভীষণ অন্ধকার যুগ।

ঠিক সে মুহূর্তেই দয়ার সাগর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর সর্বশেষ আসমানী কিতাব নাজিল করতে প্রেরণ করেন শেষ নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। এর ফলে পুনরায় নতুন উদ্যম ও গতিবেগ নিয়ে শুরু হলো ইল্‌মের চর্চা। এখানে 'ইল্‌ম' শব্দটি ব্যাপকার্থে বুঝতে হবে। সঠিক ইসলামী জ্ঞানার্জন হচ্ছে এর পারিভাষিক অর্থ। আর জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে গবেষণা ও জ্ঞানার্জন হচ্ছে এর ব্যাপক অর্থ। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে ধর্মজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে। দেখুন এই পবিত্র আয়াতটি।

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।" [বাক্বারাহ : ১৬৪]

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকেই মহান সত্যধর্ম ইসলামের 'সত্যনূরে' আলোকিত, অসংখ্য জ্ঞানতাপস ইলমের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চর্চা-গবেষণায় ব্যাপকভাবে ঝাপিয়ে পড়েন। পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করেন বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানসধক ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আল-বিরুনি (৯৭৩-১০৮৪), আল-খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০), ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮), আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৩), আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫১), ইমাম গাযালি (১০৫৮-১১১১), ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৪০), জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১) এবং আরো অনেকে। পুরাতন সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। বরং ইসলামের সাথে সংঘাতহীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি, এসব গবেষণায় ভুল-ত্রুটি সংশোধনসহ সংযোজন ও সমৃদ্ধকরণ সাধন করেন। দীর্ঘ ৭ শতক যাবৎ এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকে। উপকৃত হতে থাকে সমগ্র মানবজাতি। চৌদ্দ ও পনেরো শতক পর্যন্ত স্থানী

ইউরোপীয় অন্ধকার মধ্যযুগকে আলোকিত করে তোলে মুসলমানদের এই মহানবজাগরণ। ইউরোপীয় রেনেঁসার জন্ম হয় মুসলিম জ্ঞানচর্চার কারণে। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ চরমভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেরাই শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা ব্যাপকভাবে, যা আজো অব্যাহত আছে।

মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনরা সেই পনেরো শতক থেকে 'বিজ্ঞান ইসলামের সঙ্গে সংঘাতময়' বলে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রাখা। তারা সফল হয়েছে। মুসলমানদেরকে দুর্বল করে শত শত বছরব্যাপী এশিয়া ও আফ্রিকায় মুসলিম-অমুসলিম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে উপনিবেশ। চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে গেছে মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ।

আলহামদুলিল্লাহ! বিংশ শতকে 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার মাধ্যমেই হোক, পশ্চিমা উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম প্রায় সবাই। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে এখনও অধিকাংশ জাতি মুক্ত হতে পারে নি। নিজেদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্য এবং উন্নত ধর্ম-দর্শন বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও একদল 'পশ্চিমাপন্থী' প্রভাবশীল লোকদের তৎপরতার মধ্যে মানুষ জিম্মি হয়ে গেছে। এদের খপ্পর থেকে সমাজকে বাঁচাতে মুসলিম চিন্তাবিদদের পুনরায় এগিয়ে আসতে হবে। একদিকে পশ্চিমা দর্শন ও ভ্রান্ত কৃষ্টি-কালচারকে প্রতিহতকরণ এবং অপরদিকে সঠিক বিজ্ঞানশিক্ষাকে সকল স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ ঘটানো দরকার। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বিজ্ঞানচর্চা মুসলমানদের উত্তরাধিকার। স্বভাব বা প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য মানবকল্যাণমুখী শক্তি ও বস্তু লুকিয়ে রেখেছেন। এগুলো আবিষ্কার ও সঠিকভাবে আহরণের পথ ও উপাত্তের নামই হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এতে ইসলামের সঙ্গে সংঘাত থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে হ্যাঁ, অবিশ্বাসী ও মুশরিক-সন্দেহবাদীদের কর্তৃক ইসলামবিরোধী যেসব অপপ্রচার চলছে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, তা সবার নিকট সেই বিজ্ঞানের আলোকেই উন্মোচন করে দিতে হবে। বাস্তবে বিজ্ঞানচর্চার দিক-নির্দেশনা যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন তা-ও

সকলকে অবগত করা জরুরি। ঈমানী আলোকে বিজ্ঞানচর্চা পুনরায় শুরু করা এখন যুগের দাবি। আর ঠিক এই ঈমানী আলোকেই অতীতে শত শত জগৎখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার দান করে গিয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতিকে।

আজকের পশ্চিমা বিশ্বও মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিশাল অবদানের কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা তাই জগৎখ্যাত গাণিতিক মুসা আল-খোয়ারিজমীর নামানুসারে পশ্চিমাদের কর্তৃকই চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি অঞ্চলের নামকরণ করতে দেখি। মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান আজ সর্বত্র স্বীকৃত। যুগের পরিবর্তনে মানুষের জ্ঞানচর্চায়ও পরিবর্তন আসছে। ইসলামের মৌলিক ইল্‌ম মূলত ওহির্জ্ঞানভিত্তিক। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। ওহির্জ্ঞান চিরন্তনভাবে মানবতার সঙ্গে থাকবে। দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তির একমাত্র উপায় এই ওহির্জ্ঞান। ঈমানদাররা এ থেকে দিক-নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত গ্রহণ করে যাবেন। অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিরপরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটি চলন্ত। তবে এটিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। মুসলমান হিসেবে তাই সবাইকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। যুগের চাহিদানুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর জ্ঞানার্জন করে বৈষয়িক সার্বিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে উপকারী জ্ঞানার্জনে তাওফিক দিন।

লন্ডন, ১২-১০-১৯৯৭।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীল চেহারা এবং ইসলামী আক্বাঈদ

আজকের একদল মানুষ অতিবেশী বিজ্ঞান-আস্থাশীল। বিজ্ঞানের ‘সত্য’-কে বিনা-প্রশ্নে মেনে নিতে তারা দ্বিধা করেন না। তাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস, বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাপার ধ্রুব সত্য- এতে কোন সন্দেহ নেই। অপরদিকে আরেকদল আছেন যারা বিজ্ঞানের প্রায় সবক’টি থিওরীর উপর সন্দেহপ্রবণ। এদের মতে, বিজ্ঞানের উপর আস্থা রাখলে ক্ষতি- বরং তা হবে দ্বীনি ঈমানের জন্য মারাত্মক! আর আরেক বড় দল আছেন যারা বিজ্ঞানমনা। এদের কথা হলো, সবকিছু এমনকি ধর্মবিশ্বাসও বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই-বাছাই করা জরুরী। ইসলামী আক্বীদাও তাদের মতে, এই বিজ্ঞান নামক ‘মেগনিফাইং কাচ’ দ্বারা খুব সূক্ষ্মভাবে গবেষণা ও সত্যায়িত করা প্রয়োজন! এদের ধারণা, এরূপ না হলে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রভাবিত বিশ্ব-বিবেক ও দর্শনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে আমরা ঠিকবো কি করে? আর আরেক ছোট্ট অথচ সুশিক্ষিত (অর্থাৎ ভার্সিটির ডিগ্রী-পিএইচডি অর্জনকারী) প্রভাবশীল একদল মানুষ আছেন যারা পশ্চিমা দর্শনের উপর গভীর অধ্যয়ন শেষে ধর্মবিশ্বাসকে সেকেলে, মানবতৈরী, মুক্তচিন্তা-বিরোধী, প্রগতিবিরোধী ইত্যাদি মন্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেন। এদের কথা হলো, দর্শনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, জগতের একজন প্রভু থাকা মোটেই জরুরী নয়। সুতরাং ধর্মকর্ম নিয়ে জীবন কাটানো আসলে সময়ের অপচয় এবং মানুষকে প্রগতিশীলতা থেকে দূরে রাখার নামান্তর! নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই চারটি দলের মধ্যে যে ‘কট্টরতা’ ও ভ্রান্তি বিদ্যমান তার কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগের কথা। বিলেত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিনের মধ্যে সিলেটস্থ উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন ইন্টারনি ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হলো। পরবর্তী বছরই তিনি পূর্ণ ডাক্তার হয়ে বের হবেন। ধর্ম-দর্শনের উপর প্রায়শঃই তার সাথে কথা হতো। আলাপচারিতায় সহজেই অনুমেয়, হবু ডাক্তার সাহেব শুধু মেডিকেল বিজ্ঞানের উপরই জ্ঞানবান নন, বরং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার উপরও তার গভীর জ্ঞান আছে। আর তিনি বিভিন্ন ‘যুগশ্রেষ্ঠ’ দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনার

উপরও ওয়াকিফহাল। কথায় কথায় একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'যাই বলুন না কেন, আসলে অনেক চিন্তা-গবেষণা শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সবকিছু মূলত শূন্য!' আমি কথাটির মর্ম আরো একটু আঁচ করে নিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আরো একটু পরিষ্কার করে বলুন?' তিনি বললেন, 'এই যে, আপনারা ধর্ম-বিশ্বাস, আক্বীদা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! এগুলো কিছুই নয়। বাস্তবে এই জীবনটাই সবকিছু- আর কিছু নয়। শূন্য থেকে শুরু এবং শূন্যতে প্রত্যাবর্তন। জগৎ, জীবন আর কিছু নয়- এই যা।'

আমি এই হবু ডাক্তারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর তথ্যানুসন্ধান কী লোকটিকে নাস্তিক বানিয়ে ছাড়লো? নাউযুবিল্লাহ্! এ যে বিপর্যয়। আমি পরে এই লোকটিকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি 'ঈমান বিল গায়িব' কি জিনিস বিজ্ঞানের আলোকে না জানা পর্যন্ত কিছুতেই তার অবস্থান থেকে নড়বেন না! তার শেষ কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের 'প্রমাণ' না পাওয়া পর্যন্ত তিনি প্রভুবিশ্বাসী হতে পারবেন না। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি- এমনকি যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে 'প্রমাণ' উপস্থাপনেরও চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন ফল হলো না। অবশ্য ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনাকালে অনুরূপ 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি অন্বেষী' আরো একাধিক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ইতোমধ্যে ঘটেছে। তবে তারা ছিলো অমুসলিম, সত্যিকার অর্থে অবিশ্বাসী- কাফির। আর উপরোক্ত হবু-ডাক্তার সাহেব ছিলেন মুসলমান নামধারী এক বাংলাদেশী! পার্থক্যটা এখানেই।

বেশ কিছুদিন পূর্বে আমি একজন ধার্মিক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপকালে তার পক্ষ থেকে একটা আশ্চর্য ধরনের মন্তব্য শ্রবণ করেছি। আমরা অনেক ব্যাপারই আলোচনা করছিলাম। ধর্ম-দর্শন, ইসলামী আক্বাঈদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি উচ্চতর বিষয়ও এতে স্থান পাচ্ছিলো। মানুষ যে চন্দ্রে অবতরণ করেছে এ ব্যাপারে আমি কিছু তথ্য তার নিকট বর্ণনা করতেই তিনি বলে ওঠলেন, "আরে না না! মানুষ কখনো চন্দ্রে অবতরণ করে নি! আসলে এরূপ বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য ঠিক নয়।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এ আপনি কী বলছেন? ১৯৬৯ সালে যখন মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করে, তখন সারা বিশ্বব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যাদের ঘরে টিভি

ছিলো, তারা তো সরাসরি এই অবতরণ সম্প্রচার স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। তারা কি মিথ্যা দেখলেন? তাদের চোখকে তারা অবিশ্বাস করবেন কি করে?” আমার এ ক'টি প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন এক অদ্ভুত মন্তব্য করলেন যে, তা সত্যিই আমাকে হতবাক করে ছাড়লো। তিনি বললেন, “যদি তারা চন্দ্রে গিয়েও থাকে তবুও মুসলমান হিসাবে এটা বিশ্বাস করা আমাদের জন্য ঠিক নয়- এতে ঈমানের ক্ষতি হবে!”

উপরোক্ত কথাটি শ্রবণ করে পাঠকদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম নিয়েছে তা জানি নে। তবে কথাটা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, এরূপ মন্তব্য কোন মতেই ‘ইসলামের স্বপক্ষে’ হতে পারে না- যদিও মন্তব্যদাতার উদ্দেশ্য তা-ই ছিলো। কারণ, মানুষ একবারই চাঁদে অবতরণ করে নি- ২০ জুলাই ১৯৬৯ সালে প্রথম অবতরণের পর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মোট ৬টি সফল অভিযান শুধু আমেরিকাই প্রেরণ করে। এই মনুষ্য চন্দ্রাবতরণ অভিযানে সর্বমোট ১২ জন এ্যাস্ট্রনাট (নভোচারী) চন্দ্রের মাটিতে পদার্পণ করেন। সুতরাং ‘মানুষ চাঁদে নামে নি বা নামলেও আমাদের জন্য বিশ্বাস করা ঠিক নয়’ এ ধরনের উদ্ভট কথা বলা বা এটা মুসলমানদের জন্য উপকারী ভাবা সত্যিই বাস্তববিরোধী ও মৌলিকভাবে বেকওয়ার্ড চিন্তা-চেতনা বৈ কিছু নয়।

এখন কথা হলো মুসলমান হিসাবে আধুনিক এই বিজ্ঞান-পাগল বিশ্বে কোন্ পন্থাবলম্বন আমাদের জন্য কষ্টরহীন ও নিরাপদ? আসলে আমি মনে করি আমাদের মহাসত্যের দ্বীন, বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা কখনো চাপের মুখোমুখি হওয়ার নয়। এর দু'টি কারণ আছে: প্রথমটি হলো, এই বিশ্বধর্ম নিষ্কলুষ অহির্জ্ঞান তথা কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়ত যে দু'টি জ্ঞানান্বেষা একে চাপের মুখে ফেলে দিতে পারে বলে ধারণা করা হয়- তথা দর্শন ও বিজ্ঞান, এগুলো মূলত নিষ্কলুষ তো নয়ই- বরং চিরপরিবর্তনশীল। কেননা এই দু'টি মানবিক জ্ঞানান্বেষা ভুল-ক্রটি থেকে কখনো মুক্ত ছিলো না এবং ভবিষ্যতে হবেও না। অসংখ্য মানুষ অতীতে ও বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করে এগুলোর উপর দৃঢ়-বিশ্বাস এনে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হয়েছে। এটা কিন্তু মারাত্মক ভ্রম। তারা চির-ডাইনামিক বা চেহারা পরিবর্তনশীল দু'টি মনুষ্য জ্ঞানকে কষ্টিপাথর বানিয়ে মহাসত্যের “ঈমান-আক্বীদাকে” এর দ্বারা যাচাই করতে যেয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নাউযুবিল্লাহ্! উভয় জ্ঞানান্বেষা থেকে সর্বক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতি হয়েছে বলাটাও কিন্তু বাস্তববিরোধী ও কট্টরতা। কারণ, দর্শন যা-ই হোক, এর দ্বারা পুরো ইতিহাসব্যাপী মানুষ প্রভাবিত হয়ে আসছে। আর বিজ্ঞান ও এর নির্যাস তথা প্রযুক্তি তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের সূত্র, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তবে দর্শন ও বিজ্ঞান যে, আসলেই অসম্পূর্ণ ও নিত্য-পরিবর্তনশীল দু'টি জ্ঞানচর্চার নাম, তা এদের ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত।

দু'টি উদাহরণ দ্বারা উপরোক্ত কথাটির স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো যায়। প্রথমটি হলো আমাদের সৌরজগতের উপর থিওরী নিয়ে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সর্বপ্রথম যে থিওরী প্রতিষ্ঠিত করেন তা ছিলো পৃথিবী-কেন্দ্রিক সৌরজগত। অর্থাৎ মহাকাশে সম্পূর্ণ স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র সবই ঘুর্নমান। এরপর অনেক পরে আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী (১০০-১৭০) নামক গবেষক অনুরূপ থিওরী প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এ্যারিস্টটলের থিওরীতে যে ভুল-ত্রুটি আছে তা সনাক্ত করে বললেন, আমার প্রতিষ্ঠিত থিওরীই সঠিক। দীর্ঘ ১৪০০ বছর মানুষ এই থিওরীকে সত্য বলে বিশ্বাস করলো। এরপর 'ইউরোপীয় অন্ধকার যুগের' (৫০০-১৫০০ ঈসায়ী পর্যন্ত সময়) শেষের দিকে নিকুলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামক এক বিজ্ঞানী নতুন এক থিওরী প্রচার করলেন। তিনি বললেন, আসলে সূর্যকে যাবতীয় গ্রহ প্রদক্ষিণ করে- অর্থাৎ সূর্যই জগতের মাঝখানে অবস্থান করছে। সূর্যকেন্দ্রিক এই নতুন মতবাদ কিন্তু তখনকার প্রভাবশীল খ্রীষ্টান চার্চের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তারা এর ঘোর বিরোধিতা করতে লাগলো। দীর্ঘদিন পর জোহান কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) নামক আরেক বিজ্ঞানী বললেন, আসলে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ সত্য হলেও এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত গ্রহদের কক্ষপথ নির্ভুল নয়- বরং আমি যেটা বলছি এভাবেই গ্রহগুলো 'ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে' ঘুর্নমান আছে। কেপলারের এই থিওরী ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) সমর্থন জানানোর ফলে শেষ জীবনে চার্চের পাদ্রীদের চরম দুশমনে পরিণত হন ও মৃত্যু পর্যন্ত গৃহবন্দী অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তবে উপরোক্ত এই নতুন থিওরী ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিশেষকরে ইংরেজ গাণিতিক আইজাক নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) 'মহাকর্ষ'

সম্পর্কিত থিওরী কর্তৃক গ্রহগুলোর গতিমতি হিসাব করার পদ্ধতি থেকে এটা নিশ্চিত জানা গেল যে, এই থিওরী সঠিক। কিন্তু তখনও সূর্যকে সৌরজগতের মধ্যখানে স্থির মনে করা হতো। বিংশ শতকের শুরুতে জার্মানীতে জন্ম-নেওয়া আমেরিকান নাগরিক আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) নিউটনের মহাকার্ষিক থিওরীতে ভুল ধরে ফেললেন। তিনি 'আপেক্ষিকতাবাদ' নামক এক নতুন থিওরীর মাধ্যমে সমগ্র জগতে কিভাবে মহাকর্ষ ক্রিয়া করে তা বুঝিয়ে দিলেন। এরপর দু' দশকের মধ্যেই এটাও জানা হলো যে, সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যও স্থির নেই- সে সমগ্র সৌরজগতসহ আমাদের ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির চতুর্দিকে উচ্চ গতিতে হু-হু করে ঘুরছে। পাঠকদের জন্য সৌরজগতের উপর 'চোহারা পরিবর্তনশীল থিওরী' সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট।

দেখলেন তো, আমরা কোত্থেকে কোথায় এসেছি! আজ থেকে শত বছর বা আরো পরে অন্য কোন বড় বিজ্ঞানী এসে আরো কিছু নতুন কথা বলবেন না- এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি? এবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি তলিয়ে দেখা যাক। এটা হলো স্বভাবের ক্ষুদ্র অংশ পরমাণু বা এটমকে নিয়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ডিমোক্রিটাস (খৃ.পূ ৪৬০-৩৭০) নামক গ্রীক দার্শনিক সর্বপ্রথম 'এটম' বা পরমাণুর ধারণার জন্ম দেন। তিনি বললেন, এটম হলো স্বভাবের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ। এরপর থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এটম নিয়ে আর কেউ বেশী মাথা ঘামান নি। কিন্তু উনবিংশ শতকে এসে বৃটিশ স্কুল শিক্ষক জন ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪) এটমের নতুন একটি মডেল প্রকাশ করেন। এই থিওরী প্রকাশের ফলে এটম নিয়ে গবেষণার প্রতি আবার বিজ্ঞানীদের আগ্রহ জন্ম নিলো। ১৮৯৯ সালে বৃটিশ পদার্থবিদ জে জে থমসন (১৮৫৬-১৯৪০) নতুন আরেক মডেল উপস্থাপন করলেন। এতে তিনি বললেন, এটম মূলত সৌরজগতের অনুরূপ। কেন্দ্রকে ইলেকট্রন নামক কণা প্রদক্ষিণ করে। এরপর ১৯১১ সালে আরেক বৃটিশ বিজ্ঞানী আরনেস্ট রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) আরো একটি নতুন মডেল প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, থমসনের মডেল সঠিক নয়- আমারটি সঠিক। তাঁর এই থিওরী ক্ষণস্থায়ী ছিলো।

নতুন আবিষ্কারের আলোকে ডেনিস পদার্থবিদ নীল্‌স বহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬২) ১৯১৩ সালে আরেকটি মডেল বানালেন। তিনি দেখালেন, আসলে এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করে ইলেকট্রনগুলো ঘুরে। কিন্তু এ মডেলও শেষ পর্যন্ত বদলে দিলেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ ইরউইন স্রোডিংগার (১৮৮৭-১৯৬১)। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত তার মডেল থেকে এটা জানা গেলো যে এটমের কেন্দ্রে অবস্থিত প্রটন ও নিউট্রনকে কেন্দ্র করে অনিশ্চিত পথে সকল ইলেকট্রন ঝাঁকে ঝাঁকে 'প্যাকেট' ও 'তরঙ্গের' মতো ঘুর্নমান আছে।

পাটকদের ধৈর্যচ্যুতি হবে ভেবে আর বললাম না। এই মডেলও যে স্থায়ী ছিলো না, তা বলার প্রয়োজন নেই। অত্যাধুনিক মডেলের নাম 'ক্যুয়ান্টাম এটম'। এর ব্যাখ্যা খুব জটিল ও সূক্ষ্ম। সুতরাং আর অগ্রসর হচ্ছি না। তবে এটুকু তথ্য থেকেই 'চেহারা পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান' এর ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি।

এখন বাকী থাকলো, চেহারা পরিবর্তনশীল দর্শন শাস্ত্রের কথা। আমি মনে করি এ ব্যাপারে কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। দর্শন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা সীমিত। বাস্তবে আমার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। আমি দর্শনের উপর অধ্যয়ন কলেজ-ভার্সিটি লেবেলে করি নি। তবে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, সকল জ্ঞানান্বেষার মধ্যে দর্শন হলো সর্বাপেক্ষা বেশী 'চেহারা পরিবর্তনশীল' জ্ঞানের নাম। এর অনেক কারণ আছে, তবে একটি বিশেষ কারণ হলো, দার্শনিকরা যেহেতু লেখা ও চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করে তাদের গবেষণা করে থাকেন তা-ই এতে ভুল-ত্রুটি সর্বাপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে। হ্যাঁ, তারা অবশ্য দর্শনের কোন থিওরীকেও 'প্রমাণ' করার আইন-কানুন আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ সবই ভাষার মাধ্যমে যুক্তিতর্ক-নির্ভর। আর মানুষের পক্ষে একই বিষয়ের উপর অনেক ভিন্নধর্মী আপাতদৃষ্টিতে সঠিক 'যুক্তি' উপস্থাপন সম্ভব।

যারতার দৃষ্টিকোণ থেকে এসব যুক্তি যথার্থ বলেই মনে করা হয়। সর্বোপরি এ কথাটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শন ঠিক বিজ্ঞানের মতো 'মানবিক জ্ঞানান্বেষার' অন্তর্ভূক্ত। অথচ এই দর্শন ও বিজ্ঞানই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, মানুষের জ্ঞান সীমিত। মানুষ নিজেই সসীমের মধ্যে আবদ্ধ।

সুতরাং এখানে থেকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যুক্তিবিরোধী। এদিক থেকে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিতে পারি যে, ঈমান ও ইসলামী আক্বাঈদ যেহেতু অসীম জ্ঞানের অধিকারী স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিষ্কলুষভাবে নেমে এসেছে মানুষের সার্বিক হিদাআতের লক্ষ্যে, তাই এতে কোন ধরনের ভুল-ক্রুটি নেই। সুতরাং মানবিক যে কোন জ্ঞানান্বেষা, আবিষ্কার ইত্যাদি দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত এই মহাসত্যের ধর্মবিশ্বাস ও আক্বাঈদকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা খণ্ডন করা আদৌ সম্ভব নয়।

মানবিক জ্ঞানান্বেষা থেকে কিন্তু উপকার লাভ কোন মতেই বর্জনীয় হতে পারে না। বিশেষ করে বিজ্ঞানের উপর অধ্যয়ন যদি আমরা ঈমানের আলোকে করি, তাহলে বিরাট ফায়দা হাসিল হতে পারে। এখানে ঈমানের আলোকে কথাটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, আজকাল আমার মতে ভুলবশত, মানুষ দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে ঈমান-আক্বীদাকে যাচাই করতে চায়। কিন্তু পরিবর্তনশীল এসব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের অহির্জ্ঞানভিত্তিক প্রাণের বিশ্বাসকে নিয়ে গবেষণা করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

হ্যাঁ, বিপরীতদিকে ভাবলে একথা সুস্পষ্টভাবে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, নিষ্কলুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল ও নবী, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মহাসত্যের ধর্ম ইসলাম ও এর ঈমান-আক্বীদার আলোকে সকল মানবিক জ্ঞানকে যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করা হবে সমগ্র মানবজাতির জন্য যথার্থ, কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত। দর্শনের মানদণ্ডে কখনো ঈমান-আক্বীদার হাক্বিকাত, পূর্ণতা, গ্রহণযোগ্যতা, কল্যাণকামিতা, দুনিয়া-আখিরাতে উপকারিতা, ও মানবিক হিদায়াত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাচাই-বাছাই আদৌ যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দর্শন মূলত আমরা 'ভ্রমপ্রবণ' মানুষের গবেষণার ফসল। এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহর পছন্দনীয় দ্বীন ও এর আক্বাঈদের কোন অংশকে 'গ্রহণযোগ্য' কিংবা 'বর্জনীয়' বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ মোটেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। হ্যাঁ, ধর্ম-ভিত্তিক দর্শন সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা মহাসত্যের দ্বীন ইসলামকে আরো বুঝার চেষ্টা চালাতে পারি। আর এ কাজটিই অতীতের মহাত্মন 'ইসলামী দার্শনিকরা' করে গেছেন। এখন বাকী থাকলো বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও দ্বীন ইসলামের আক্বাঈদ।

বিজ্ঞান থেকে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে অনেক ফায়দা হাসিল করতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির এ যুগে মুসলমানদেরকে পেছনে থেকে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি বৈজ্ঞানিক কোন 'থিওরী' দ্বারা এটা প্রমাণ করতে অগ্রসর হয় যে, ঈমান ও ইসলামী আক্বীদার সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক কিংবা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই থিওরীটি আমাদের ধর্মবিশ্বাসের কোন আক্বীদাকে চাপের মুখে ফেলে দিচ্ছে তাহলে আমাদেরকে একটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। এই মূলনীতিটি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে একটি কথা আবারো আমি ব্যক্ত করছি, আর সেটা হলো, ইতোমধ্যে আমরা ইতিহাসের আলোকে প্রমাণ করেছি যে, বৈজ্ঞানিক থিওরী একটি পরিবর্তনশীল জ্ঞানের নাম। এবার আমরা মূলনীতিটি লিপিবদ্ধ করে নিতে পরি: "যদি কোন কালে বৈজ্ঞানিক কোন থিওরী থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে, এই থিওরী ও ইসলামের ঈমান-আক্বাঈদের এক বা একাধিক কোন অংশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, ঐ থিওরীটি অবশ্যই নির্ভুল নয়। এতে নিশ্চিতভাবে কোন ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান। আর এই ভুল ধরা পড়তে যেয়ে যতো বছর বা কালই অতিবাহিত হোক না কেন- তা একদিন অবশ্যই ধরা পড়বে। আর যদি কিয়ামত পর্যন্ত ধরা না-ই পড়ে- এরপরও কিছু যায় আসে না। আমরা কোন মানবিক জ্ঞানকে কখনো অহির্জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না- এরূপ করা হবে আমাদের অন্তরে সংরক্ষিত সর্বাপেক্ষা মহামূল্যবান "ঈমানী নূরের" জন্য মহাবিপর্যয়।"

সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞানের চিরপরিবর্তনশীল চেহারা যেনো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে না- এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা সবার জন্য জরুরী। অপরদিকে এসব জ্ঞানান্বেষাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করাও যুক্তিযুক্ত নয়। তবে মুসলিম শিক্ষাঙ্গণে 'পশ্চিমা' ও 'বেদান্ত' দর্শনের লাগামহীন অনুপ্রবেশ সত্যিই মহা-উদ্বেগের কারণ।

দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম 'চরিত্রদর্শন'। আর ঈমান ও ইসলামী আক্বীদার মধ্যে যে চরিত্রদর্শন বিদ্যমান তার চেয়েও উন্নতমানের কোন মানবতৈরী চরিত্রদর্শন আছে বলে আমি মনে করি না। সুতরাং পশ্চিমা ও বেদান্ত (ভারতীয়) দর্শন দ্বারা আমাদের কী হবে? এ দু'টো দর্শনজ্ঞান হতে পারে ইতিহাসের বিষয় কিন্তু তা কখনো অনুকরণ-অনুসরণীয় নয়। দর্শনের

শত শত 'ইজম' শিখে আমরা কিভাবে যে উপকৃত হতে পারি তা আমি খুঁজে পাই না- একমাত্র এটা জানা ছাড়া যে, মানবিক 'মুক্তচিন্তা' মূলত বহুমুখী- ঠিক যেরূপ প্রত্যেক মানুষের চেহারা ভিন্ন। ইতিহাসখ্যাত প্রত্যেক চিন্তাশীল দার্শনিকই যারতার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সত্য' বলতে যা বুঝেছেন তা-ই প্রকাশ করে গেছেন লিখনীর মাধ্যমে। সুতরাং এদের প্রত্যেককে যেরূপ 'ভ্রান্ত' কিংবা 'ভুলপ্রবণ' বলা সঠিক হবে না- ঠিক তদ্রূপ এদেরকে 'মহাসত্যের' আবিষ্কারক বলাও চলবে না। তাদের একে অন্যের চিন্তা-চেতনা-দর্শনে মৌলিক পার্থক্য থাকাটাই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মোটকথা 'মহাসত্য' মুক্তচিন্তা বা দর্শন কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে 'আবিষ্কারের' ব্যাপার নয়। মহাসত্যের মূল সূত্র একমাত্র অহির্জ্ঞান ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আজকের বহুতরের ফিতনার এই কঠিন দিনে সকল জ্ঞানের আধার 'অহির্জ্ঞানে'র আলোকে দর্শন ও বিজ্ঞানকে জানা-চেনার সময় এসেছে। দর্শন ও বিজ্ঞানকে 'কষ্টিপাথর' বানানোর প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে- কারণ এই উভয় জ্ঞানান্বেষায় মানবিক মৌলিক দুর্বলতা তথা ক্রুটিপ্রবণতা বিদ্যমান। চেহারা পরিবর্তনশীল কোন পিচ্ছিল রাস্তায় পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে চলা আমাদের জন্য মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হোচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আমরা মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে আশ্রয় কামনা করছি- তিনি যেনো আজকের এই 'সর্বত্র স্ফুলিঙ্গের মতো সব ধরনের তথ্য ছড়িয়ে পড়ার' যুগে সঠিক হিদায়াতের রাস্তায় আমাদেরকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আমীন।

সিলেট, ১৮ এপ্রিল ২০১১।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী মাদ্রাসা ও দারুল উলূম কানাইঘাটে একদিন

বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে দু'টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ ইলমে দ্বীনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ শিক্ষাকেন্দ্রদ্বয় হলো সিলেট সদর জিলার অন্তর্গত কানাইঘাট উপজেলার 'গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা' এবং 'দারুল উলূম কানাইঘাট' মাদ্রাসা। আমি ছোট থেকেই কানাইঘাটের গাছবাড়ী মাদ্রাসা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলাম। অপরদিকে এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার প্রাক্তন একজন শাইখুল হাদীস হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র কথা লোকমুখে শোনে আসলেও তাঁর গ্রামের বাড়ির অদূরে স্থাপিত দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্রাসা সম্পর্কে ইতোমধ্যে খুব একটা জানতাম না। আলহামদুলিল্লাহ্‌ এই ক'দিন পূর্বে সিলেট তথা পুরো বাংলাদেশের গৌরব উক্ত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রদ্বয়ে ভ্রমণ করে আসলাম। আমি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই সফরের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গে ব্যক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভোরে আমার মোবাইলে একটি রিং এলো। অপরপ্রান্তে আমার তরীকতের মুর্শিদ যুগশ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়ার (দাঃবাঃ) একান্ত এক খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ। তিনি জানালেন শেখ সাহেব অসুস্থ। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে দেখতে গেলাম। আমার সাথে ছিলেন সুবিদ বাজার মসজিদের সানি ইমাম হাফিজ ফায়জুল ইসলাম। স্থানীয় মসজিদের ইমাম হিসাবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। হযরত শায়খে কাতিয়া বার বার তার মুর্শিদ ও উস্তাদ হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করছিলেন আর কাঁদছিলেন।

আমরা লক্ষ্য করলাম, হযরত অতিরিক্ত সফরের চাপে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে ওয়াজের মওসুম চলছে। পুরো সিলেট বিভাগের মধ্যে কুতবে বাঙ্গালের সমপর্যায়ের মুরুব্বি ওলিআল্লাহ তথা আলিমে দ্বীন আর কেউ নেই। সকলেই এই মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে বিদায় হয়ে গেছেন। গত হজ্জের সফরে থাকাকালে চলে গেলেন শাইখুল ইসলাম হযরত

মাদানী রাহিমাহুল্লাহ্র খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গজীনগরী (রাহঃ)। পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় বাইতুল্লাহ শরীফের সুশীতল ছায়ায় গাজীনগরীর লাশ রেখে আছরের নামায শেষে যখন ২০ লক্ষাধিক মানুষ নামাজে জানাযা আদায় করলেন, তখন আমার মুর্শিদ হযরত শায়খে কাতিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ জানাযায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকেও দান করেছিলেন। মক্কা শরীফের প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল মাআল্লায় গাজীনগরী রাহিমাহুল্লাহ্র কবরটিও পরদিন হযরতকে নিয়ে জিয়ারত করেছি। আল্লাহ পাক হযরত গাজীনগরীকে (রাহঃ) জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন।

হযরত শায়খে কাতিয়ার শারীরিক দুর্বলতা লক্ষ্য করে অতিরিক্ত সফর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমরা সকরুণ অনুরোধ জানালাম। তিনি রাজী হয়ে বললেন, আমি এখন রেস্ট নেবো। কানাইঘাট মাদ্রাসার জলসায় যেতে আশা ব্যক্ত করে তার নিকট দুআ চাইলাম। উল্লেখ্য, হযরত স্বয়ং এই জলসার একজন আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ছিলেন। বললেন, যাও, তাদেরকে আমার সালাম বলে জানিয়ে দিও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি আসতে পারলাম না। আমরা তার এই বার্তাটুকু কানাইঘাটে যেয়ে সম্মানিত মুহতামীম সাহেবের নিকট পৌঁছিয়েছি।

পরদিন বুধবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ০৯। এদিন কানাইঘাট মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। হাফিজ ফায়জুল ইসলামকে আগেই বলে রেখেছিলাম, এবার গাছবাড়ী ও কানাইঘাট বেড়াতে যাবো। সে অঞ্চলের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র আমীরে তাবলীগ জামাআত হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রাহঃ) ও প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্র স্মৃতি বিজড়িত ঐ এলাকাটি ঘুরে দেখবো ও বুজুর্গদ্বয়ের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে রূহানী ফায়েজ দ্বারা উপকৃত হবো। হাফিজ সাহেব আগের দিন ফোনে বললেন, আগামীকাল ভোর ৮-৯ ঘটিকার সময় বের হতে হবে। কানাইঘাটের দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। তবে আমাদেরকে আগে গাছবাড়ী মাদ্রাসায় গেলে ভালো হয়। ইতোমধ্যে ফোন করলেন আমার আরেক সুহৃদ উসমানীনগর থানার উমরপুরের মুহাম্মদ হুসাইন ভাই। তিনিও আমাদের সফরসঙ্গী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। সুতরাং আমরা

তিনজনে বুধবার ভোর ৯টায় কদমতলী টারমিনাল থেকে একখানা কোস্টারে কানাইঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

সফরে বেরুলে নিয়ম হলো দুই কিংবা ততোধিক সফরকারী হলে একজনকে আমীর নির্বাচন করা। অন্যথায় শয়তানও সফরসঙ্গী হবে। সুতরাং কানাইঘাট এলাকার উপর পারদর্শী আমাদের সফরসঙ্গী হাফিজ ফায়জুল ইসলাম সাহেবকে আমরা আমীর ও রাহবার এই উভয় দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী মাদরাসায়

আজ থেকে ১০৮ বছর পূর্বে (১৯০১ সালে) কানাইঘাটের গাছবাড়ী উপজেলার এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ক্বারী মুহাম্মদ আতহার আলী রাহিমাহুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রখ্যাত মাদরাসাটি। শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই 'আলিয়া' দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে ধন্য হয়েছেন অনেক প্রখ্যাত আলিম-উলামা। মাদরাসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রাণভরে চতুর্দিকে তাকালাম। পুকুরে অযু সেরে সাক্ষাৎ হলো মাদরাসার এক ছাত্রের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মাদ্রাসার কোন ইতিহাস গ্রন্থ আছে কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন বের হয়েছে। আপনি ওটা সংগ্রহ করে নিন, এতে মাদ্রাসার ইতিহাসসহ বেশ কিছু তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।' একটু পরই মাদরাসার বারান্দায় হঠাৎ সাক্ষাৎ হলো বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেবের সঙ্গে। তিনি আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বীয় অফিসকক্ষে নিয়ে গেলেন।

বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ

বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেব দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ দায়িত্বপালন করে যাচ্ছেন। মাওলানা সাহেবের অফিসে প্রবেশের পর বসতে বললেন, চা-বিস্কুটের অর্ডার দিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হলো। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, বর্তমান বিশ্বে দ্বীনে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তার মতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের করুণ অবস্থা এই অতি-

দুনিয়াদারিত্বের ফলেই হচ্ছে। তিনি বলেন, আগের যুগে ইলমে দ্বীনের খাদিমদের মধ্যে যে পরিমাণ ইখলাস ছিলো আজ আর সেটা নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অতীতে অনেক গুণিজন এই গাছবাড়ী মাদরাসার অধ্যক্ষের পদটি অলংকৃত করেছেন। তাদের মধ্যে ক'জন হলেন প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বারী আতহার আলী (রাহঃ), মাওলানা ইব্রাহীম আলী (রাহঃ), মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রাহঃ), মাওলানা আব্দুল গনি (রাহঃ) প্রমুখ। যেসব প্রখ্যাত মুহাদ্দীস এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ ইয়াকুব (রাহঃ), হযরত মাওলানা মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাঃ), হযরত মাওলানা ফযলে হক (ফাযিল সাহেব) (রাহঃ), হযরত মাওলানা মুহিবুর রহমান (রাহঃ), হযরত মাওলানা কমর উদ্দীন (রাহঃ), হাফিজ মাওলানা আব্দুস শাকুর (রাহঃ), হাফিজ মাওলানা ইউসুফ (রাহঃ) প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। এক মাসের ভেতর পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করার গৌরব অর্জন ছাড়াও তিনি দাখিল ক্লাসে প্রথম বৃত্তি লাভ ও মাদ্রাসা বোর্ডে গাছবাড়ী হতে সর্বপ্রথম আলীম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি আমাদের প্রত্যেককে একেক কপি শতবর্ষ পূর্তি বিশেষ ম্যাগাজিন উপহার দেন। এই ম্যাগাজিনই আমার এ লেখার মূল সূত্র।

হযরত হরমুজ উল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌র কবরপাশে

বাংলাদেশের প্রাক্তন আমীরে তাবলীগ জামাআত হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রাহঃ) ১৭ আগস্ট ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কানাইঘাট গাছবাড়ী বাজারের অদূরে নারানপুর গ্রামে তার জন্ম হয়। এই সুপরিচিত বুজুর্গের কবর তার গ্রামের বাড়ির নিকটে একটি গোরস্থানে অবস্থিত। আমাদের ইচ্ছে হলো হযরত আমীর সাহেব হুজুরের কবরটি জিয়ারত করে যাবো। আমার সফরসঙ্গী মুহাম্মদ হুসাইন ভাই জানালেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমীর সাহেব হুজুরকে চিনতেন। গাছবাড়ী মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে পায়ে হেটেই সেখানে পৌঁছলাম। সময় লাগলো ৫ থেকে ৭ মিনিট। পাকা রাস্তার পাশেই দু'টি কবর। এর একটি হযরত হরমুজ উল্লাহ

(রাহঃ) সাহেবের ও অপরটি হযরত ফজলে হক (ফাযিল) সাহেব (রাহঃ)-এর। উল্লেখ্য, শাইখুল হাদীস ফাযিল সাহেব ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা শ্রদ্ধাভরে উভয়ের কবর জিয়ারত করলাম। এরপর কানাইঘাটের উদ্দেশ্যে একখানা যাত্রীবাহী লেগুনাযোগে যাত্রা করলাম। তখনও যুহরের বেশ বাকী।

ঐতিহ্যবাহী কানাইঘাট মাদরাসায়

আমাদের লেগুনাখানা বিকেল ১.৩০ মিনিটের সময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। পুরাতন ও নতুন মিলে মোট তিন-চারটে ইমারত নিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা। ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেলাম বেশ কিছু লোক একটি কবরকে ঘিরে আছেন। তারা সবাই অত্যন্ত ভক্তিভরে কবরটি জিয়ারত করছিলেন। এই কবরটিই হলো প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র। মাদরাসার অদূরে পূর্বের মাঠে এটি অবস্থিত। কিছুটা উত্তরে সামনেই বিরাট মাঠ। সেখানে খুব বড় একটি প্যান্ডেলের ভেতর বসে ওয়াজ শ্রবণ করছেন অসংখ্য শ্রোতা। এই মাঠের পূর্বে কিছুটা উত্তরদিকে দেখাচ্ছিল উপজেলা শহর কানাইঘাট বাজার। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখলাম। তারপর চলে গেলাম হযরত বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র কবরপাশে। জিয়ারত শেষে মসজিদের সামনে সবুজ ঘাসের উপর বসে ভাবতে লাগলাম। হযরত বাইয়মপুরীর (রাহঃ) পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। ওয়াজ মাহফিলে বৃহত্তর সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোক জমায়েত হয়েছেন। সাধারণত এ পর্যায়ের ওয়াজ মাহফিলে এতো লোকের সমাগম হয় না। এই বিশাল গণজমায়েতের কারণ যে হযরত বাইয়মপুরী (রাহঃ) তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র জীবন থেকে কিছু তথ্যাদি পাঠকদের উপহার দিতে প্রয়াস পাচ্ছি। যুগশ্রেষ্ঠ এই অলিআল্লাহ ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাসে কানাইঘাট উপজেলার অন্তর্গত বাইয়মপুর

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম কারী মুহাম্মদ আলীম ও মাতার নাম মরহুমা মুছাম্মাত ছফিয়া। বাল্যকালেই মুশাহিদ সাহেব তার পিতাকে হারান। মাতা ছফিয়া পবিত্র কুরআনের হাফিজা ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন স্বীয় মায়ের কাছেই শুরু হয়। তিনি বাংলা, উর্দু এবং কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠগুলো মায়ের নিকটই শিক্ষা করেন। এরপর ৭ বছর বয়সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিন বছর লেখাপড়া শেষে অত্যন্ত কৃতীত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এই অল্প বয়সেই কিন্তু মুশাহিদ সাহেবের আল্লাহ প্রদত্ত উন্নত মেধা অনেকের নিকট ধরা পড়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই মেধাবী ছেলের প্রতি মুগ্ধ গয়ে প্রস্তাব করলেন মুশাহিদকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে তিনি নিজেই যাবতীয় খরচ বহন করবেন। কিন্তু যিনি হবেন ইলমে দ্বীন তথা ইলমে নববীর এক বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী তিনি কি আর জাগতিক জ্ঞানলাভের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারেন? সুতরাং সেই ছোট্ট বয়সেই তার মন ইলমে দ্বীনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়লো। শ্রদ্ধেয় মাস্টার সাহেবের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে তিনি ভর্তি হয়ে গেলেন কানাইঘাটের এই মাদরাসায় যার তখনকার নাম ছিলো, "কানাইঘাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা"। এখানে তিনি দীর্ঘ ৭ বছর লেখাপড়া করেন।

ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হয়ে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিকটস্থ লালার চক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু এখানে শিক্ষকতায় বেশীদিন মন বসলো না মুশাহিদ সাহেবের। জ্ঞানের প্রচণ্ড পিপাসা তাকে শীঘ্রই দূর-বিদেশে নিয়ে গেল উচ্চ শিক্ষার্জনের অন্বেষণে।

প্রথমে তিনি ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। এখানে হিকমাত, ফালাসিফা, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন শেষে ইলমে হাদীসের উপর আরোও জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে মিরাটে চলে যান। দীর্ঘ দু'বছর এখানে অধ্যয়ন শেষে স্বীয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মাসীউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌র নির্দেশে কাফিয়া কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইজাহুল মাতালিব' এবং আরো এক দু'টো কিতাব রচনা করেন। এগুলো তাঁর উস্তাদের নামেই প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, তিনি পরবর্তীতে আরবী, উর্দু ও বাংলায় বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ফতহুল

করীম, সত্যের আলো ও তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হযরত মুশাহিদ সাহেব দেশে ফিরে পুনরায় কানাইঘাটের রাহমানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করলেন। কিন্তু জ্ঞানান্বেষার প্রচণ্ড প্রভাব থেকে তিনি তখনও মুক্ত হতে পারলেন না। বাস্তবে জ্ঞানান্বেষীরা এরূপই হয়ে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান আহরণের পিপাসা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ) আবারো ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ইলমে দ্বীনের উচ্চতর শিক্ষার্থী হিসাবে। তিনি ১৩৫৬ হিজরীর জুমাদিউচ্ছানী মাসে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করলেন। এখানে তিনি চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী সকল বিষয়ে চুড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেন।

দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাওলানা সাহেব বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা শুরু করেন। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি শাইখুল হাদীস হিসাবে হাদীস শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিলেছিলেন ওগুলোর মধ্যে প্রধান ক'টি হলো সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা, দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্রাসা, ভারতের বদরপুর মাদ্রাসা এবং যুক্ত প্রদেশের রামপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা। তিনি জীবনের শেষাংশে কানাইঘাট দারুল উলূম মাদ্রাসায় মুহতামীম ও শাইখুল হাদীস হিসাবে দায়িত্বপালন করে গেছেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ) কতো উঁচু দরোজার আলিম ছিলেন তার একটি ধারণা আমরা পেয়ে যাবো নিম্নলিখিত ক'জন প্রখ্যাত আলিমের উক্তি থেকে। মাওলানার সঙ্গে এসব বুজুর্গের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো, এছাড়া অনেকেই তার ছাত্র ছিলেন।

হযরত মাওলানা বাইয়মপুরী সাহেবের ইন্তিকালের কিছুদিন পর সিলেট শহরের জামে মসজিদে এক শোক সভায় হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব শায়খে কৌড়িয়া (রাহঃ) বলেন, "সিলেট বিভাগের যতো আলিম রয়েছেন তাদের সবার ইলম একত্রিত করলেও হযরত মাওলানা মুশাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্‌র ইলমের সামনে এই বলা চলে যে, মাওলানার হাঁটু পানিতে সবাই সাঁতরাতে পারবে।" হানাফী মাজহাবের উপর হযরতের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক একটি ঘটনার কথা শায়খে কৌড়িয়া উক্ত সভায় উল্লেখ

করেন। তিনি বলেন, “একদা আমরা একত্রে পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করলাম। সেখানে মসজিদুল হারামে বসে এক আরবী আলিমের কণ্ঠে ওয়াজ শ্রবণ করছিলাম। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাজহাবের লোক। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সেই ওয়ায়েজ হানাফী মাজহাবকে কিছুটা কটাক্ষ করে বসলেন। সাথে সাথেই হযরত মুশাহিদ (রাহঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একজন আরবের মতো সুন্দর আরবী ভাষায় বক্তব্য শুরু করে দিলেন। দীর্ঘ ঘণ্টা খানেক তিনি হানাফী ফিকহের উপর বয়ান করলেন। এতে ঐ আলিম তার নিকট হার মানলেন। ঘটনার সংবাদটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর অসংখ্য মানুষ মাওলানাকে দেখতে আসলেন।”

প্রখ্যাত রানাপিং কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা রিয়াছত আলী (রাহঃ) একদা হাদীসের দরসের সময় উক্তি করেছিলেন, “আমাদের দেশে বড় আলিমদের মধ্যে হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ) অন্যতম।”

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন গহরপুরী (রাহঃ) একবার গহরপুর মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের মাত্রা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “সমস্ত পাকিস্তান নহে বরং আমার মতে সমস্ত বিশ্বে যে কয়েকজন হাদীসের খাদিম রয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ খাদিম বা হাদীস বিশারদ হচ্ছেন হযরত বাইয়মপুরী সাহেব।”

হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ) একবার প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বাসগৃহে মেহমান হয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা থেকেই হাদীস শাস্ত্রের উপর মাওলানার গভীর জ্ঞানের পরিচয় মিলে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রানাপিং মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা হাফিজ জাওয়াদ সাহেব বলেন, “একবার ঢাকায় ড. শহীদুল্লাহ (রাহঃ) এবং হযরত বাইয়মপুরী (রাহঃ) হাদীসের উপর আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে ড. শহীদুল্লাহ সাহেব কোন এক বিষয়ের সমর্থনে প্রায় ৫০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। প্রতিউত্তরে বাইয়মপুরী সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে উসূলে হাদীস অনুযায়ী প্রতিটি হাদীসের রাবী, উদ্দেশ্য, সত্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় এভাবে সুন্দর বর্ণনা শ্রবণ

করে ড. শহীদুল্লাহ সাহেব মন্তব্য করলেন, "আমি মোটেই জানতাম না যে, পাকিস্তানে হাদীস শাস্ত্রের উপর পারদর্শী এমন একব্যক্তি রয়েছেন।" এরপর শহীদুল্লাহ সাহেব হযরতকে তার বাসভবনে দাওয়াত দেন- হযরত তা সানন্দে গ্রহণও করেছিলেন।

হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী রাহিমাহুল্লাহ্‌র জীবন থেকে নেওয়া কয়েকটি মাত্র তথ্য এখানে উপস্থাপন করলাম। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আর অতিরিক্ত কিছু বলতে পারলাম না। তবে একটি মশহুর ব্যাপার ব্যক্ত না করে পারছি না। হযরতের মৃত্যু হয় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে। সেদিন ছিলো ঈদুল আযহার রাত। তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। লক্ষাধিক মানুষ হযরতের নামাযে জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। লাশ কবরস্থ করার পর এক আশ্চর্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। কবর থেকে বেরিয়ে আসলো আতরের অপূর্ব ঘ্রাণ। ভক্তরা মাটি তুলে নিতে লাগলো। এভাবে বেশ ক'দিন চললো। উল্লেখ্য, হযরত বাইয়মপুরী (রাহঃ) ও ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্‌র জীবনের মধ্যে বেশ মিল পাওয়া যায়। উভয়ই ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং উভয়ের কবর থেকে ঘ্রাণ বেরিয়েছে ও অনেকে মাটি নিয়েছেন। এছাড়া উভয়ের মৃত্যুদিবস ছিলো ঈদুল আযহার রাত।

আল্লাহর পবিত্র দরবারে আবারো অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি অনুগ্রহ করে হযরত মুশাহিদ বাইয়মপুরী এবং হযরত হরমুজ উল্লাহর (রাহঃ) মতো যুগ শ্রেষ্ঠ দুই অলিআল্লাহর স্মৃতিবিজড়িত কানাইঘাট অঞ্চল সফর করালেন। ইশার নামায শেষে আমরা একখানা ফোরস্ট্রোক রিজার্ভ করে সিলেটের উদ্দেশে ফের যাত্রা করলাম।

(তথ্যসূত্র: আমরা যাদের উত্তরসূরী- হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান; আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রাহঃ) জীবন ও চিন্তাধারা- অধ্যাপক মাওলানা মুহিববুর রহমান; জামিউল উলূম শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা- ছাত্র সংসদ, গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্রাসা।)

সিলেট, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খানক্বাহর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

’খানক্বাহ’ (خانقاه - خانگاه) মূলত ফার্সি ভাষার একটি শব্দ। তবে শব্দটি আরবি ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এমন এক স্থান যেখানে শরীয়ত, তারীকাত, হাক্বিক্বাত ও মা’রিফাতের সমন্বয়ে আত্মশুদ্ধির চর্চা হয়। সুফি-দরবেশ ও তরীকতের সালিকরা সাধারণত এক বা একাধিক খিলাফতপ্রাপ্ত ওলির সুহবত লাভের ইচ্ছায় খানক্বায় আগমন করেন। অতীতে খানক্বাহ সুফি-দরবেশদের ’মুসাফিরখানা’ হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ খানক্বার সাথে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কোনো ওলির সমাধিও সংযুক্ত থাকে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খানক্বাহ শব্দের বদলে একই প্রতিষ্ঠানকে ’رباط’ [রিবাত], ’زاويه’ [জাভিয়া], এবং ’تكيه’ [তেক্কি] বলে।

ইতিহাস: খানক্বাহ শব্দের ব্যবহার ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে ছিলো না। যেভাবে ’ফিক্বাহ’, ’মাজহাব’, ’মাদ্রাসা’, ’দারস’ ইত্যাদি শব্দব্যবহার পরবর্তীতে মশহুর ও গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেছিল। ঠিক তদ্রূপ ইসলামী আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়্যাতের ক্ষেত্রে সুফি-দরবেশরা ’খানক্বাহ’ শব্দব্যবহার জনপ্রিয় করেন। তবে খানক্বায়ী কর্মতৎপরতা বা নিযাম শুরু হয় মসজিদে নববী শরীফ সংলগ্ন সুফফার অধিবাসী আসহাবে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা’আলা আজমাঈনের দ্বারা। পরের যুগে একটি খানক্বার মৌলিক কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে সুফফাবাসী সাহাবায়ে কিরামের কাজকর্মের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। যেমন, খানক্বার ইমারতের সাথে মসজিদ-মাদ্রাসা থাকা, জিকির-আজকার, জ্ঞানচর্চা, ইসলাহী তৎপরতা ও জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি কাজ।

যুগশ্রেষ্ঠ ওলি ইমাম জাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ’সিয়ার আ’লামুন্ নুবালা’ (سير أعلام النبلاء) গ্রন্থে উল্লেখ করেন: “হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাগরিদ, প্রখ্যাত তাবি’ঈ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিনের বেলা মসজিদে বসে ’তাফসীর’, ’হাদীস’ ও ’ফিক্বাহ’ শাস্ত্রের উপর দারস দিতেন। রাতে তাঁর একটি বিশেষ দারস ছিলো। এই দারসে তিনি ’সুলুকের’ পথ-পাথেয় এবং ’মৌলিক গুণাবলী থেকে সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার রাস্তার’ উপর

শাগরিদদের প্রতি নসিহত করতেন। বলা হয়ে থাকে, এই বিশেষ দারসে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, ’এসব প্রশ্ন শুধুমাত্র দিনের বেলা করবেন। তখন এ গুলোর উপর দারস বসে।’ ইমাম জাহাবী বলেন, ‘খানক্বায়ী কাজের শুরু এখান থেকেই’।”

আজকাল অভিধানে খানক্বাহ (خانقاه) শব্দের অর্থ দেওয়া হয়: একটি ইমারত যেখানে সুফি-দরবেশরা বাস করেন। এটা তাঁদের আস্তানা।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ঈসায়ী দশম শতক থেকে ’খানক্বাহ’ শব্দ ব্যবহার শুরু হয়। খানক্বাকে ইবাদতগাহ ও শরীয়ত এবং তরীকতের কেন্দ্র বলা হয়। অতীতে পুরো মুসলিম বিশ্বের শহরাঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাংলাদেশে ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকে সুফি-দরবেশরা খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ইতিহাসব্যাপী মুসলিম সমাজে খানক্বাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে আসছে। সঠিকভাবে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানুষ দলে দলে খানক্বায় এসে উপস্থিত হতেন। তবে বাহ্যিক এসব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছাড়াও আধ্যাত্মিক ’ইসলাহ’ বা আত্ম-পরিশুদ্ধির প্রয়োজনও খানক্বাহ আঞ্জাম দেয়। আর এই ইসলাহ অর্জনের পরীক্ষিত সফল রাস্তার নাম পীর-মুরীদী। খানক্বাহ এই পীর-মুরীদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আজকাল অতীতের মতো খানক্বার প্রভাব তেমনটি অবশিষ্ট না থাকলেও উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে এখনও অনেক খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত আছে। আগের যুগে খানক্বার ইমারত প্রয়োজনীয় অনুমতিসহ সরকারী জায়গায় তৈরী হতো। বাংলাদেশে সরকারী বা ডিসি’র খতিয়ানভূক্ত কোনো জায়গায় অনুমতিসহ খানক্বাহ আজকাল আছে বলে জানা নেই। সুফি-দরবেশরা ব্যক্তিগত কিংবা ভক্ত-অনুরক্তদের অনুদানভিত্তিক অর্থায়নে খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকেন।

খানক্বায় যেসব অতিরিক্ত কর্মের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলো: ১. হক্কানী পীর-মাশাইখ কর্তৃক নিয়মিত ’ইসলাহী’ বয়ান। ২. হক্কানী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ। ৩. তাসবীহাত ও জিকির করা। যথা: ৬ তাসবীহ, পাস-আনফাস [দমের জিকির], তেরো তাসবীহ জিকির, ইসমে যাতের [আল্লাহ নামের] জিকির, মুরাক্বাবা, মুশাহাদা, রিয়াজত, মুজাহাদা, সুন্নাতী

জীবন গড়ার উপর চর্চা, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদির উপর তা'লিম ও আমল করা।

খানক্বাভিত্তিক ইসলাহী আমলে অবশ্যই উপকার হয়। তবে খিয়াল রাখতে হবে আজকের এ বহুতরের ফিতনার যুগে সঠিক হক্কানী খানক্বাহর সঙ্গে জড়িত হতে হবে। শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ যাতে খানক্বায় প্রতিষ্ঠিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা চাই। শরীয়তবিরোধী আমল ও বিদআত দ্বারা ইসলাহ হওয়া তো দূরের কথা- বরং তা ডেকে আনতে পারে করুণ পরিণতি ও ধ্বংস। আমরা আল্লাহর দরবারে ফানাহ চাই।

সিলট, ০৪ জানুয়ারী ২০২৫।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফিরে এল সিয়াম সাধনার মাস- পবিত্র রমজান শরীফ

প্রভুর নির্দেশে স্বেচ্ছায় উপবাস, নফসে আম্মারার উপর যাতনা, আল্লাহর আনুগত্যের সাধনার সর্বোত্তম ট্রেনিংয়ের মাস রমযানুল মুবারক ফিরে এসেছে মুসলিম জীবনে। দিবালোকে সর্বপ্রকার খাদ্য-পানীয় থেকে দূরে থেকে মুসলমান তার ঈমানকে তাজা করবে একটি মাসের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে- এটা হচ্ছে এ মাসের একটি মহান শিক্ষা। আল্লাহর আনুগত্যের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা পবিত্র এ মাসটি শরীয়তের গণ্ডিসীমার ভেতরে থেকে - আসুন, একান্ত ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সাধনায় লিপ্ত হই। দিনের বেলা কাটিয়ে দিই একে অন্যের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ভালোবাসায়, রাগ-গোস্বা সংবরণ করে ও সর্বপ্রকার পাপকার্য থেকে বিরত থেকে। আর রাতগুলো কাটিয়ে দিই অশ্রুতে সিক্ত আঁখিদ্বয়সহ প্রভুর ইবাদত-ধ্যান-যিকিরে। মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিই আল্লাহর রাহমাত ও পবিত্র সান্নিধ্যের আশা ও তাঁর সম্মুখে রোজ কিয়ামতে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।

সিয়াম সাধনা হচ্ছে মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য এক অপূর্ব উপহার। যদিও বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিবসে উপবাসের ট্রেডিশন প্রতিটি ধর্মেই বিদ্যমান। কিন্তু এক নাগাড়ে দীর্ঘ এক মাস সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা থেকে বিরত হয়ে সিয়াম সাধনা একমাত্র ইসলামেই আছে। এর মাধ্যমে জাগতিক, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অশেষ উপকার হাসিল হয়।

জাগতিক উপকারগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ভুখা মানুষের অবস্থার বাস্তব উপলব্ধি। পুরো বিশ্বব্যাপী অভাবহীনদের তুলনায় অভাবীদের সংখ্যা অনেক বেশী। এই বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাটেও চোখে পড়ে অনেক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন মানুষ, যাদের জীবন কেটে যায় ভুখাবস্থায়। একটি দিনও তারা পেটপুরে খেতে পারে কি না। স্বচক্ষে দেখেছি রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষ আবর্জনা ভর্তি ডাষ্টবিন থেকে তুলে খেতে। দেখেছি ভুখা মানুষ ক্ষিদে মেটাতে বাসি-নোংরা খাবার খেতে। এদেশের অনেকেই বাস করে

দরিদ্রসীমার অনেক নীচে। এসব মানুষ ক্ষিদের জ্বালায় বছরের পর বছর যাবৎ কী ভীষণ কষ্টে দিন কাটায় তা আমরা যারা চার-পাঁচ আইটেম ছাড়া খাওয়া রুচিশীল মনে করি না- কিভাবে বুঝতে পারবো? সিয়াম সাধনা থেকে অল্প হলেও তা কিছুটা টের পাওয়ার একটি রাস্তা খোলা আছে। পুরো দিনভর না খেয়ে থাকার ফলে চিন্তাশীলরা ভুখা মানুষের বাস্তব অবস্থার উপলব্ধি করে থাকেন। তাঁদের মন তখন ওসব ভাগ্যহত লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তাঁরা পেটপুরে খাওয়ার সময় মনে মনে ভাবেন, হায়! আমার মতোই অসংখ্য রক্তে-মাংসে-অস্তি-মজ্জায় গড়া আল্লাহর বান্দাহ আজ স্বেচ্ছায় নয়, অভাবের তাড়নায় উপোস থেকে যাবে। কিছু করতে না পারলেও অন্তত মনের গভীরে এই অনুভূতিটুকু জাগ্রত হওয়াটাও বৃহত্তর সমাজের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। হতে পারে, একদিন এই ধনাঢ্য ব্যক্তির কঠিন হৃদয়খানা দুঃখী অভাবীদের করুণ আর্তনাদে গলে যাবে মোমের মতো। সিয়াম সাধনায় আমরা এহেন চিন্তা-ভাবনা করলে সমাজের অনেক উপকার হবে নিঃসন্দেহে।

শারীরিক উপকারগুলোর মধ্যে আজকের প্রেক্ষাপটে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাপার হচ্ছে ধূমপান থেকে রক্ষার একটি উত্তম উপায়। পৃথিবীব্যাপী ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা ইদানিং জাগ্রত হয়ে উঠলেও, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও এই বদ অভ্যাস থেকে রেহাই পায় নি। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধূমপানের প্রতি আগ্রহ মোটেই কমে নি। এছাড়া ছেলেদের মতো মেয়েরাও ধূমপানে লিপ্ত হচ্ছে। সরকার কর্তৃক পাবলিক স্থানে, বাস-স্ট্রীমার-লঞ্চে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় অনেকটা স্বস্তিবোধ করছেন অনেকে। এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বৈ-কি। কিন্তু এতে ধূমপান থেকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিরত হচ্ছে বলে মনে হয় না। ধূমপান ছেড়ে দেয়া ছাড়া নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষার কোন পথ খোলা নেই। ধূমপানে পানকারীর ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে শুরু করে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার বৃহৎ ঝুঁকি তো আছেই, উপরন্তু আশপাশে যারা ধূমপান না করেও ‘প্যাসিভ স্মোকিং’ বা অক্রিয় ধূমপানের শিকার হয়ে থাকে তাদেরও স্বাস্থ্যের বিরাট ক্ষতি হয়। সুতরাং ধূমপান এখানে পারা যাবে না, আর ওখানে পারা যাবে- এ নীতির

উপর ভরসা মোটেই যথেষ্ট নয়। ধূমপান সম্পূর্ণরূপে পরিহার করলেই বাঁচা যায়। আর এজন্য সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রমজান মাস। দিনের বেলা যেহেতু ধূমপান করা যাবে না- তাই একটু উইল-পাওয়ার খাঁটিয়ে রাতেও যদি এ থেকে বিরত থাকা যায়, তাহলে পুরো একমাস এভাবে ধূমপান থেকে নিজেকে রক্ষা সম্ভব। অনেকে রমজানে ধূমপান ছেড়েছেন বলেও প্রমাণ আছে। সুতরাং আসুন, ধূমপান থেকে নিজেকে এই রমজান মাসে বিরত রাখার অঙ্গীকার করি যা অধিকাংশ আলিমের মতে 'মাকরুহ'। আর একমাস বিরত থাকলে ধূমপানের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে- দেখবেন, এর দুর্গন্ধও সহ্য হবে না।

সিয়াম সাধনা মানসিক প্রশান্তি দানেও সহায়ক হয়ে থাকে। আমরা তো সামাজিক জীবী। আজকের জটিল-কঠিন এ সমাজে বেঁচে থাকা হচ্ছে- কঠিন এক সংগ্রামী জীবন। সুতরাং ব্যক্তি, পরিবার ও বৃহত্তর সামাজিক জীবন সংগ্রামে হিমশিম খেতে হয় সবাইকে। মানুষ তাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটুকু শান্তি, একটুকু স্বস্তি। তার মনে সদাজাগ্রত- সবকিছু থেকে দূরে সরে থাকার স্পৃহা। সিয়াম সাধনার মধ্যে এই মানসিক প্রশান্তির একটি উপায় বিদ্যমান। তাহলো রমজান মাসের ইবাদত। একান্ত মনোযোগ সহকারে এমাসে মুসলমানরা রাতের বেলা খতমে তারাবীহ নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। মহিলারাও ঘরের ভেতর এ নামায শান্তির মধ্যে পালন করেন। তারাবীহর নামায মূলত শান্তির নামায। নিজের তনু-মন-প্রাণকে আল্লাহর রাহমাত ও বরকতের আশার উপর নিবদ্ধ রেখে তাঁরই আনুগত্য প্রকাশের নিয়্যাতে সকল ইবাদত করাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। সারাদিনের উপবাসও মহান আল্লাহ পাকের একান্ত আনুগত্যেরই স্বীকৃতি। কারণ, উপবাস না থেকেও মানুষের নিকট নিজেকে রোযাদার হিসেবে জাহির করা সম্ভব। সুতরাং, রোযা সত্যিই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় পালন করা হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও এসঙ্গে উত্তম আমল দ্বারা তা পরিপক্ক করার মধ্যেই নিহিত অনাবিল প্রশান্তি।

রমযানের রোযা একটি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সাধনাও বটে। এই রমজান মাসেই আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআনুল করীম নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল। শবে কৃদর বা 'ক্ষমতাধর রাত' এ মাসেরই একটি রজনী যা

অনেকের মতে শেষ দশ রোযার কোন এক রাত। তবে প্রকৃত জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর।

শবে কৃদরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অনেকে আজও পুরো রমজান মাস কাটিয়ে দেন ই'তিকাফ করে। কারণ সেই মহান রাতের মাহাত্ম্য ও বিরাট ফজিলতের কথা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নিজেই বর্ণনা করেছেন। হাজার রাতের চেয়েও উত্তম এ রাতটি রমজান মাসেরই একটি। আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শরীয়ত মুতাবিক আল্লাহর নির্দিষ্ট হালাল-হারামের প্রতি আনুগত্য, ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত পালন, ইবাদত ও নফল যিকির-আযকার এবং আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনে নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা। রমজান মাসে চরম আনুগত্যের এই ট্রেনিং সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসু হয়ে থাকে। কারণ সিয়াম সাধনা মানুষকে প্রভুর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করে দেয়। সুতরাং আত্মিক উন্নয়নে রাতের গভীরে একান্ত খুশুখুজুর মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে আহাজারির ফলাফল খুব ভাল হবে- এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার তাওফীক দিন। তাঁর রাহমাত, বরকত ও মাগফিরাতের বারিধারা আমাদের সবার উপর বর্ষণ করুন। আজকের কঠিন এই ফিতনার যুগে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে তাঁর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন পৃথিবীর সকল মুসলিম নর-নারীকে। এই পবিত্র মাস হয়ে উঠুক আমাদের সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের অফুরন্ত শান্তি ও কল্যাণের ওয়াসিলা। আ-মীন।

সিলেট, ২৬ রজব ১৪২৬ হিজরী, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপমহাদেশে বেসরকারি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

প্রসঙ্গ কথা

মোগল আমলে বাদশাহ আকবর [১৫৪২-১৬০৫] কর্তৃক নতুন বিদআ'ত 'দ্বীনে ইলাহী'-কে পঞ্চদশ শতকের শেষে শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দীদে আলফে-সানি [১৫৬৪-১৬২৪] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশ্চিহ্ন করে উপমহাদেশে একটি বৃহৎ ইসলামী সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর এই অবদান ভারতে মুসলিম ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সম্রাট আকবরের নতুন ধর্মমতের ফিতনা থেকে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন।

১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের [১৬১৮-১৭০৭] মৃত্যুর ৪ বছর পূর্বে প্রখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী [১৭০৩-১৭৬২] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে মধ্যযুগ ও আধুনিক মুসলিম ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিলো। শাহ সাহেব তখনকার ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম ও আর্থ-রাজনীতিক সমস্যাবলী সনাক্ত করে দ্বিমুখী সংস্কার সাধনে ব্রত হোন। তাঁর সৃষ্ট জিহাদী চেতনা পরবর্তীকালে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। অপরদিকে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি কিছু মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রচেষ্টা ও এর প্রভাবের ফলেই পরবর্তীতে প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ [প্রতিষ্ঠাকাল: ৩১ মে ১৮৬৬ / ১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরি] আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই ভারতে মূলত মোগল সাম্রাজ্যের ইতি ঘটে। এরপর বৃটিশরা এসে সেখানে নতুন নতুন ফিতনার জন্ম দেয়। এর প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মুসলমানরা ইসলামী পুনর্জাগরণের সূচনা করেন। এসময় সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৭৮৬-১৮৩১] বৃটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন। তাঁর এই মুভমেন্টই ছিলো

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা। ফরায়েজী মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৮১-১৮৪০] এবং তখনকার উলামা ইসলাম ও মুসলমানদের আমল-ঈমানের উপর বৃটিশ বুদ্ধিভিত্তিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হোন। পশ্চিমাকরণ তথা পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুসলমানদের ভীষণ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তাঁরা উপলব্ধি করে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এ আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু ছিলো মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে পাশ্চাত্যের আমদানী করা ভীষণ ক্ষতিকর শিক্ষা-সংস্কৃতিকে উৎখাত করে দেওয়া। লৌখনোর ফারাঙ্গী মহল ও দিল্লীর দারুল উলামা এ কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর দারুল উলামার পরিচালনার দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে শাহ সাহেবের তিন পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়। এদের মধ্যে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৭৪৬-১৮২৪] এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁরা তিন জনই পিতার সংস্কারমূলক কার্য অব্যাহত রাখেন।

বালাকোটের ময়দানে মুসলমানদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয় [৬ মে ১৮৩১] এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতার পর বৃটিশরা মুসলমানদের উপর আরও ক্ষেপে উঠে। তারা প্রথমত: সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে [১৭৭৫-১৮৬২] বার্মায় নির্বাসিত করে চিরদিনের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের ইতি ঘটায়। দ্বিতীয়ত: দিল্লী থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয় এবং অনেককে অমানুষিকভাবে নির্যাতন ও খুন করে। তাদের বাড়ি-ঘর-ধন-সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বহু মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ এবং ধূলিসাৎ করে নির্বিচারে। মসজিদে নামায পড়ারও সুযোগ দেয়নি তখনকার বৃটিশ হয়েনারা। তৃতীয়ত: মুসলমানদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তারা পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে গড়ে তুলে স্কুল ও কলেজ।

মুসলমানরা ১৮৫৭ সালের পরে বৃটিশদের ইসলামবিরোধী আগ্রাসনের তীব্রতা ও ক্ষতি উপলব্ধি করে নিজেদের ইসলামিক শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার্থে আরও বেশি তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা বুঝতে পারলেন, বৃটিশদের এই

পরিকল্পনা যদি সফল হয় তবে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের নিজ আমল-আকীদা ও শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে পড়বে। তারা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা থেকে দূরে সরে পড়ে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট হবে। এসময় উলামা-মাশায়িখরা ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উপমহাদেশে 'মাদরাসা শিক্ষার' প্রসার ঘটান। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একদল নতুন মুসলিম আলিমসমাজ ও মুজাহিদদের জন্ম হবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস ছিলো। বাস্তবে তা-ই হয়েছিলো। মাদরাসা শিক্ষার প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা কাসিম নানুতুবী [১৮৩২-১৮৮০] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী [১৮২৬-১৯০৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এরা দু'জনই ছিলেন ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সিপাহসালার হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [১৮১৭-১৮৯৯] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক শিষ্য। এই আলিমদের প্রচেষ্টায়ই ভারতে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়।

এছাড়া স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের [১৮১৭-১৮৯৮] নেতৃত্বে অপর এক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। দিল্লী থেকে বহিষ্কৃত একদল আলিম গ্রামাঞ্চলে এসে ইসলামিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সৈয়দ আহমাদ বৃটিশদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি সেক্যুলার শিক্ষারও প্রসার ঘটান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৮৭৫; পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে এজাতীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসার ভারতের মুসলমানদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। বাস্তবে এই শিক্ষাব্যবস্থা এখন বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তবে এ যুগে সৈয়দ আহমাদ খানের দ্বিমুখী তথা ইসলামিক ও সেক্যুলার শিক্ষার যে ভারসাম্য ছিলো, তা আর অবশিষ্ট নেই। এখন সেক্যুলার তথা পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার উপরই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। এরফলে নতুন প্রজন্ম ইসলামী সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পাশ্চাত্যের বাদ-মতবাদ ও সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। আধুনিককালে উপমহাদেশে শিক্ষিতসমাজের ভাবধারা থেকে এ কথা স্পষ্ট।

সেক্যুলার এবং বামদর্শনে আকৃষ্ট সমগ্র অঞ্চলে প্রবাভশালী এক বৃহৎ লেখক-বুদ্ধিজীবী গ্রুপের জন্ম হয়েছে। বলাই বাহুল্য এদের দর্শন ও কলম আজ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এক জঘন্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে সেযুগের মতো এযুগেও 'দারুল উলূম' শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা উলামা-মাশায়িখরা ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ও নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তখনকার দিনে যে ক'টি প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছিলো তার মধ্যে দারুল উলূম ফারাঙ্গী মহল, মাদরাসাতুল আরামিয়া, দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

দারুল উলূম ফারাঙ্গী মহল

দারুল উলূম ফারাঙ্গী [বা ফারাং] মহল লৌখনোতে ১৬৯৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুল্লা নিজামুদ্দীন সিহাল (১৬৭৭-১৭৪৮) [তিনিই ছিলেন বিখ্যাত 'দারসে নিযামী'র প্রতিষ্ঠাতা]। এই প্রতিষ্ঠানে কাজী, মুফতী এবং অন্যান্য মুসলিম আদালতের চাকুরিজীবীদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামী রাষ্ট্রের আইনবিভাগের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাদরাসাতুর রাহিমিয়া

মাদরাসাতুর রাহিমিয়া দিল্লীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতা শাহ আব্দুর রহিম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব এবং পরবর্তীদের তাঁর পুত্রদের সুযোগ্য পরিচালনায় ইসলামী উচ্চতর ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হতো।

এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পূর্বোল্লিখিত দারুল উলূম ফারাঙ্গী মহল- উভয় প্রতিষ্ঠানই ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই আন্দোলনের পর ভারতে মুসলমানদের অবস্থান ও প্রেক্ষাপট বদলে যায়। সুতরাং নতুন পরিবেশে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন জরুরী হয়ে উঠে। এই নতুন ধারার সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠানটিই হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ।

দারুল উলূম দেওবন্দ

দিল্লীর নব্বুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেওবন্দ শহরটি অবস্থিত। উত্তর ভারতে বিস্তৃত অনেক বড় গ্রামের মতো এ ছোট্ট শহরটিও একটি মফস্বল এলাকা ছিলো। দেওবন্দে মুসলমান উলামার মধ্যে দু'টি প্রভাবশালী পরিবার বসবাস করতেন। এরা হলেন উসমান ও সিদ্দীক পরিবার। মোগল আমল থেকে এ দু'টি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। দারুল উলূম দেওবন্দ এই এলাকায় সর্বপ্রথম ১৮৬৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে। তখন ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের মাত্র নয় বছর পার হয়েছে। প্রখ্যাত এই ইসলামী প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হাজী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আবিদ হোসাইন, হযরত মাওলানা দুহুল ফকীর (তিনি ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসানের পিতা), হযরত মাওলানা আব্দুর রাহমান উসমানী (মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানীর পিতা) এবং হযরত মাওলানা মিসবাউল হাজ্জ মুহাম্মদ আবিদ হোসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। দেওবন্দের প্রথম অনুদান এই শেষোক্ত মাওলানা প্রদান করেন এবং তিনিই প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক ছিলেন মুল্লা মাহমুদ দেওবন্দী [মৃ. ১৮৮৬] এবং প্রথম ছাত্র ছিলেন মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী [১৮৫১-১৯২০] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। পরবর্তীতে এই ছাত্রই দেওবন্দের প্রখ্যাত শিক্ষক হয়েছিলেন। প্রথম সেশনে ১৬ জন ছাত্র লেখাপড়া করেছেন এবং এদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে অধ্যয়ন শেষ করেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান। প্রথমবারের মতো পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। প্রাথমিক অবস্থায় 'মসজিদে ছাত' নামক একটি স্থানীয় মসজিদে ক্লাস হতো। এ পুরাতন মাসজিদটি একটি বড় বৃক্ষের নীচে ছিলো। এই বৃক্ষটি এখনও বিদ্যমান। পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা ভাড়াকরা একটি গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া স্থানীয় জামে মসজিদের একাংশও ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হতো। এভাবে সুদীর্ঘ ৩০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিজস্ব ভবন ১৮৯৭ সালে নির্মিত

হয়। এরপর থেকেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল শাখা-প্রশাখা, ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রয়োজন মুতাবিক নির্মিত হয়ে মূল ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

একটি বৃক্ষের নীচে ১৬ জন মাত্র ছাত্র নিয়ে সর্বপ্রথম দারুল উলূম দেওবন্দ আত্মপ্রকাশ করার পর কালে এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ৫,০০০ এর চেয়েও অধিক ছাত্রদের এক বিরাট দল সুদক্ষ একদল শিক্ষকের শিক্ষকতায় এখানে নিয়মিত পড়াশুনা করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ছাত্র এখানে লেখাপড়ার জন্য এখনও আসেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের বাজেট কয়েক মিলিয়ন ভারতীয় রূপী পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বড় অংকের টাকা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অনুদান থেকে প্রাপ্ত। এখনও এই মাদরাসায় সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া হয় না। এই পলিসি অব্যাহত রাখার একটি বড় কারণ হলো, বাইরের কোন প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা। দারুল উলূমের অনুসরণে উপমহাদেশে অসংখ্য মাদরাসা আত্মপ্রকাশ করেছে, এগুলোকে সাধারণত 'ক্বওমী' (পাবলিক) বা বেসরকারী মাদরাসা বলা হয়। এসব মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতারা অনেকেই দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ এলাকায় দ্বীনের খিদমাতে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ পরিচালনার দায়িত্ব একটি কার্যকরী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এরা হলেন চ্যান্সেলর বা সরপরাস্ট, ভাইস-চ্যান্সেলর বা মুহতামীম, ডীন বা সাদর-মুদাররিস এবং ফাতোয়া বিভাগের প্রধান। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভবন ও অফিসগুলো ছাড়াও এতে মোট ১৩টি একাডেমিক বিভাগ আছে। ২২টি ভিন্ন ইসলামী বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে তাফসীরুল কুরআন, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আরবী ব্যাকরণ, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনেক আগে থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দ একটি বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। বর্তমান বিশ্বে প্রখ্যাত আল-

আজহার বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে তবে দারুল উলূম অবশ্যই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ১৫৩ [বর্তমান ২০১৯ সালের হিসেব মতে] বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী শিক্ষার একটি উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হয়ে আছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে মৌলিক লক্ষ্য ছিলো তা হলো, উলামা-মাশায়িখ তৈরী করা যারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়ে আসা উলামা উপমহাদেশের অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসায় ইমাম-শিক্ষক হিসেবে প্রথম থেকেই বহাল আছেন। এরা মুসলমানদেরকে ঈমান, দ্বীন, আমল, আখলাক, প্রভৃতি ব্যাপারে সর্বদাই শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ওয়াজ-নসিহত ও লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটাচ্ছেন। এছাড়া উপমহাদেশে যুগে যুগে ইসলামী রাজনীতি, সংস্কার ও আন্দোলন করে যাচ্ছেন। বলতে গেলে আধুনিক যুগের ৯৯ শতাংশ আলিমে দ্বীন যারা উপমহাদেশের ইতিহাসে অবদান রেখেছেন এবং এখনও রাখছেন তাঁরা সবাই মূলত এই দেওবন্দ মাদরাসা থেকে সরাসরি শিক্ষিত, না হয় এই প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ অন্য কোন মাদরাসা থেকে আলিম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ক'জন মাত্র প্রখ্যাত উলামার নাম উল্লেখ করলেই এ কথা প্রমাণিত হবে। শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৫১-১৯২০], হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৭৫-১৯৩৩], হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৬৩-১৯৪৩], শাইখুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৭৯-১৯৫৭], হযরত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৭২-১৯৪৪], হযরত মুফতি শফী উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৯৭-১৯৭৬], হযরত সাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৮৭-১৯৪৯], হযরত মাওলানা ইলইয়াস কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [১৮৮৫-১৯৪৪] প্রমুখ জাহানখ্যাত উলামা এই দারুল উলূম দেওবন্দ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। পাক-ভারত-বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলামিক আন্দোলনের ইতিহাস এদেরকে বাদ দিয়ে কোন দিন রচনা করা সম্ভব হবে না।

দারুল উলূম দেওবন্দের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা দারসে-নিযামী ক্যারিকোলামের উপর নির্ভরশীল। এর মাধ্যম হচ্ছে উর্দু এবং ৬ বছর এই ক্যারিকোলামের উপর অধ্যয়ন করতে হয়। এটা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং উত্তর প্রদেশের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়- এই উভয় প্রতিষ্ঠানই উর্দুকে মিডিয়াম হিসেবে প্রচলিত করে এ ভাষা উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য জনপ্রিয় করে তুলে।

দারুল উলূমে ছাত্ররা তাদের সাধারণ শিক্ষা শেষ করার পর ইচ্ছে হলে আরও ২ বছর অবস্থান করতে পারেন। এ সময় ইসলামের যে কোন বিষয়ের উপর উচ্চতর স্ট্যাডি করা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠান থেকে যে একাডেমিক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তা পৃথিবীর যে কোন ইন্সটিটিউশনে গ্রহণযোগ্য।

দারুল উলূম দেওবন্দের অপর যে বৈশিষ্ট্য তা হলো, এটা উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা তথা ইলমে তাছাওউফের কেন্দ্র। এখানে ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে বাইআত গ্রহণ করে ইসলামের এই শাখার উপর শিক্ষালাভ করে ধন্য হোন। দেওবন্দী সিলসিলার বাইরে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অনেক ক্ষেত্রে না থাকার ফলেই হয়তো অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ, ইসলাম শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল-ইবাদতের নাম নয়। এর একটি অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দিক আছে। আর এই সূক্ষ্ম দিকটিই হচ্ছে ইলমে তাছাওউফ। ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফ্ফার সাহাবীদের থেকে শুরু করে জ্ঞানের এই শাখার উপর অসংখ্য পীর-দরবেশ-অলি-মাশায়িখ আজীবন সাধনা করে গেছেন। ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহাত্মনও একজন দরবেশ ছিলেন। এছাড়া ইলমে তাছাওউফ তথা মা'রিফাতের জ্ঞানের উপর তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তাহলে আধুনিক যুগে জ্ঞানের এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে বাদ দিয়ে এবং এমনকি এটাকে অস্বীকার করে ইসলামের কাজ এবং ইসলামী আন্দোলন কী কখনও সফলতা অর্জন করতে পারে? তা যে সম্ভব নয় আধুনিক যুগের মুসলমানদের দুরাবস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনে ব্যর্থতার ইতিহাসই এর প্রমাণ বহন করে। বাহ্যিকটা ধরে আর অভ্যন্তরীণ দিক ছেড়ে দেওয়ার অর্থ যেমন অপূর্ণতা, তেমনি অভ্যন্তরীণটা

ধরে বাহ্যিকটা ছাড়ার নামও অপূর্ণতা। মূলত এ দুয়ের সমন্বয়েই পূর্ণতালাভ সম্ভব। এক্ষেত্রে দেওবন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যার প্রমাণ আগেই উল্লেখ করেছি। উপমহাদেশে যতো ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, যতো প্রখ্যাত উলামা-মাশায়িখ বিশ্ব-বরেণ্য আলিম হিসেবে কলমের মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই এই দেওবন্দ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে অন্যান্য আলিমদের অনেকেই অবদান যাকিছু রেখেছেন, তার সিংহভাগই এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য, ইসলামী আন্দোলনের জন্য লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছে বলে মনে হয়।

আলীগড় কলেজ (পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়)

আলীগড় মুভমেন্টের অগ্রদূত ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমাদ খান [১৮১৭-১৮৯৮] এবং এটা ভারতে বৃটিশ পলিসিকে সমর্থন করেছিলো। সৈয়দ আহমাদ খান মোগল সাম্রাজ্যের পতন দেখেছেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের একজন উচ্চপদস্থ সিভিল সার্ভেন্ট। তিনি বৃটিশদের জীবনাদর্শ ও বুদ্ধিভিত্তিক তৎপরতার উপর আকৃষ্ট হোন। বৃটিশদের প্রতি আনুগত্য তার কাছে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য হতো। তখনকার দিনে বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক বিশ্ব দর্শন তাকে প্রভাবিত করে। পশ্চিমা সভ্যতা ও এর বিজ্ঞানভিত্তিক মডার্ন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তার অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিলো প্রবল। এমনকি তিনি এ পর্যন্ত অগ্রসর হতে দ্বিধা করেন নি যে, যুক্তি-ভিত্তিক ধার্মিকতার নামে পবিত্র কুরআন শরীফের বৈজ্ঞানিক রূপদান করারও চেষ্টা তিনি চালান। অবশ্য তখনকার উলামা তার এ মারাত্মক পদক্ষেপ প্রতিহত করেন এবং সার্বিকভাবে আলীগড় মুভমেন্টের বিরোধিতায় লিপ্ত হোন। প্রাথমিক অবস্থায় আলীগড় কলেজে ইসলামী শিক্ষা তেমন বেশী ছিলো না। উলামার বিরোধিতার ফলেই স্যার সৈয়দের চিন্তা-দ্বারায় অনেকটা পরিবর্তন আসে এবং পরিশেষে কলেজে কয়েকটি ইসলামী বিষয়ের উপর অধ্যয়ন সংযুক্ত হয়। ১৯২১ সালে আলীগড় কলেজ একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের পরবর্তী আর্থ-রাজনীতিক ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত ইসলামী জাগরণ ও সংস্কৃতির উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। আর এ প্রভাবের প্রতিফল আজও উপমহাদেশে বিদ্যমান। আলীগড়ের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে কুফরী সেক্যুলার শিক্ষার বিস্তার ঘটে। অবশ্য বৃটিশরা তো এ শিক্ষাব্যবস্থা ছড়ানোর জন্য যারপরনেই চেষ্টা করেছে। বৃটিশদের কাছে আলীগড় ছিলো একটি প্রভাবশালী সহায়ক শক্তি। তাদের কুফরী বাদ-মতবাদ প্রচার-প্রসারে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো আইডিয়াল ক্ষেত্র। তাই আজো আলীগড় এবং এর প্রতিষ্ঠাতার প্রতি তাদের 'বাহবা' প্রকাশের সীমা নেই। এছাড়া তারা তাঁকে 'স্যার' উপাদিতে আগেই ভূষিত করে পুরস্কৃত করেছে। আর এ উপাধি সকলকে দেওয়া হয় না। এ পর্যন্ত ইসলামের দরদী, মুসলমানদের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করে কোন মুসলিম গুণিজন 'স্যার' নামক বৃটিশদের এই 'মূল্যবান' (?) খেতাবটি পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা

নদওয়াতুল উলামা নামক বুদ্ধিভিত্তিক মুভমেন্টের অগ্রনায়ক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আল-মুঙ্গেরী [১৮৪৬-১৯২৭]। ১৮৯৩ সালে এ মুভমেন্টের জন্ম। এর ৫ বছর পরই অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে ইসলামী ইন্সটিটিউশন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য চরমে ছিলো। একদল বৃটিশদের সমর্থক এবং অপরদল উলামার সমর্থক ছিলেন। নদওয়াতুল উলূম এ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে একটি ব্যালান্স সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করাই ছিলো এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্সটিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী সিলেবাসের মধ্যে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনয়ন করেন। এই উদ্যোগ ছিলো ভারতে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভিনব সংযোজন। কারণ, ইতোমধ্যে পুরাতন দারসে নিযামী সিলেবাসই ছিলো একমাত্র প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠিত 'কওমী' এবং 'আলিয়া' মাদরাসাশিক্ষা থেকে

অপর এক তৃতীয় পদ্ধতি, যা মূলত প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। আর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা একাধিক প্রখ্যাত উলামা ও ইসলামিক চিন্তাবিদ বিশ্ব-বরেণ্য মনীষী হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এখানে শুধুমাত্র হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী [১৯১৩-১৯৯৯] রাহিমাহুল্লাহর নাম উল্লেখই প্রমাণ-স্বরূপ যথেষ্ট হবে।

উপমহাদেশে সংক্ষিপ্তাকারে বেসরকারি ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ও আন্দোলনের উপর অতি সংক্ষেপ এই প্রাথমিক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সাংস্কৃতিক অঙ্গণে সিংহভাগ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার অভাবই আমাদেরকে অধঃপতিত করেছে। শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি থেকে এক জঘন্য আক্রমণ শুরু হয়। তখনকার উলামা এটা উপলব্ধি করে বৃটিশদের চরম নির্যাতন ও দমন-পীড়ন সহ্য করেও দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা- এই দু'টি মৌলিক ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে সর্বত্র দীনি শিক্ষা-সংস্কৃতি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা যদি এসব পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন তাহলে আজ উপমহাদেশে ও বিশেষকরে বাংলাদেশে ইসলাম থাকতো কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে- থাকলেও যে শুধু নামমাত্র থাকতো তা নিশ্চিত। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা আজকাল 'কওমী মাদরাসা' নামক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝায়, মোটেই বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে সরকার নিয়ন্ত্রিত 'আলিয়া মাদরাসা' প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরও যুগ যুগ ধরে সরকারী চাপ, শ্যেনদৃষ্টি এবং বিভিন্ন অশুভ উদ্দেশ্য পতিত হয়ে আসছে। যার সাক্ষ্য আলিয়া মাদরাসার দীর্ঘ ইতিহাস বহন করে।

স্বাধীনতার পর বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আশা করা হয়েছিলো যে, এবার সঠিক ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করবে। কিন্তু দু:খের বিষয়, বাস্তবে দেখা গেল এই প্রসারলাভে বাঁধা-বিপত্তি বৃটিশদের তুলনায় আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। স্বাধীন মুসলমানরা এবার সেক্যুলার শিক্ষার প্রভাবে নিজেদের প্রাণের বিশ্বাস ইসলামের অনেককিছু ছেড়ে দিচ্ছে। আজ এমনও হয়েছে, মুসলমান, ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা-

সংস্কৃতির কথা মুখ থেকে বের করলে সময় সময় গালি খেতে হয়। যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় আলিম সমাজও আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা কিছু 'শিক্ষিত' সমাজের নিকট অত্যন্ত সাধারণ এবং সময় সময় দুশমন ও গালিগালাজের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এটা যে কতো মারাত্মক তা একবারও তারা বুঝতে চায় না। দেশের আলিম সমাজকে মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পশ্চিমাদের দোসর সেজে বেইজ্জত করা, জেল-যুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা যে ভীষণ আত্মঘাতী তৎপরতা তা এই তথাকথিত সেক্যুলার একদল 'শিক্ষিত' সমাজ মোটেই অনুধাবন করতে পারছে না বা চাচ্ছে না। এটা অবশ্যই দেশ ও জনতার উপর আল্লাহর গযব ডেকে আনার আলামত। তবে আমরা আশা করি, বৈষয়িক উন্নতি সাধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাগতিক শিক্ষার সাথে সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা-সাংস্কৃতিক একটি বৃহত্তর চেতনা দেশে জাগ্রত হবে এবং অবশ্যম্ভাবী এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে দেশের মুসলমানরা রক্ষা পাবেন।

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার
সিলেট, ২২ ডিসেম্বর ২০১৯।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলাম ও বিজ্ঞান: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা

আজকের মানুষ যুক্তিপাগল। যুক্তির নিরিখে সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে মানুষ অভ্যস্ত। তারা অন্ধভাবে কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। যে কোনো ব্যাপার "যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত" হতে হবে। এর বিকল্প নেই। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ তো অবশ্যই আছে। আমরা আপাতত ওসব কারণ সম্পর্কে বেশ কিছু এ মুহূর্তে বলবো না। শুধু এটুকুই উল্লেখ করছি যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরাট প্রভাব হেতু মানুষের মধ্যে সবকিছুতে যুক্তিনির্ভরতা খুব শক্তভাবে শেকড় গেড়েছে। তবে যৌক্তিক চিন্তা-চেতনা মূলত মানবিক একটি মৌলিক গুণ। সুতরাং যুক্তিনির্ভরতার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কথা হচ্ছে, যুক্তির নিরিখে যে কোনো বিষয়, বিশ্বাস বা আক্বিদা যাচাই করতে যেয়ে আমাদেরকে অবশ্যই মানদণ্ডের স্ট্যান্ডার্ড নির্ণয় করতে হবে। একে বলা যায় যাচাই-বাছাইয়ের কষ্টিপাথর। সুতরাং আমাদেরকে যৌক্তিকভাবে দেখতে হবে ইসলাম বিজ্ঞানের নিকট কতটুকু যৌক্তিক এবং বিজ্ঞান ইসলামের নিকট কতটুকু যৌক্তিক- এ উভয়টি। কিন্তু এ দু'টির কোন্‌টি হবে কষ্টিপাথর? ইসলাম না বিজ্ঞান? না উভয়টিই কিংবা অন্য কোনো তৃতীয় উপাদান? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ না। কিন্তু যুক্তির মানদণ্ড নির্দিষ্ট না করে আমদেরকে কোনো 'যৌক্তিক' উপসংহারে পৌঁছুনো সম্ভব নয়।

২.

যুক্তির কষ্টিপাথর নির্ণয়ে ঈমানদার হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইসলামের ঈমান, আক্বীদা ও উপাসনা পদ্ধতির মূলে আছে স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বিশুদ্ধ ও পবিত্র ওহির্জ্ঞান। তাহলে, মুসলমান হিসাবে বিজ্ঞানের কোনো থিওরিকে গ্রহণ বা বর্জন করার কষ্টিপাথর হতেই হবে ওহির্জ্ঞান। ওপরদিকে কেউ যদি বলেন, বিজ্ঞানের আলোকে বা বিজ্ঞানকে কষ্টিপাথর সাব্যস্ত করে ইসলামকে মানতে-বুঝতে হবে- তা আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হবে। এর পক্ষে আমাদের

যুক্তি হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি মূলত পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান ইতোমধ্যে কোনো 'মহাসত্য' আবিষ্কার করে নি। বৈজ্ঞানিক সকল থিওরি আসলে সময়ের সাথে আপেক্ষিক। এর প্রমাণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিদ্যমান।

মহাকাশ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সৌরজগৎ নিয়ে গবেষণা। হাজার হাজার বছরব্যাপী মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলে আসছিলেন, আমরা একটি পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বে বাস করছি। অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবী সমগ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। একে কেন্দ্র করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু প্রতিনিয়ত ঘূর্ণমান বা গতিশীল আছে। প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানীরা এই থিওরির প্রবক্তা ছিলেন। তবে ঈসায়ী ২য় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী টলেমি (১০০-১৭০) এই থিওরিকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি "আলমাজেস্ট" [এটা মূল গ্রন্থের আরবি নামকরণ] নামক একটি বই রচনা করে তার এ পৃথিবীকেন্দ্রিকতাবাদ থিওরি তুলে ধরেন। দীর্ঘ ১২০০ বছর যাবৎ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এটি সত্য বলে মেনে নেয়। যদিও ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ থিওরির নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছিল। কারণ সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন শরীফে এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক তথ্য বিদ্যমান। বলা হয়েছে:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ * وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

-"সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের; প্রত্যেকেই [পৃথিবীসহ মহাকাশে যাকিছুই আছে] আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।" [ইয়া-সীন : ৪০]

আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত আয়াত টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিকতার অসারতাকে প্রমাণ করেছে। লক্ষ করুণ, রাত ও দিনের আবর্তন সম্পর্কে বলার কারণে আয়াতের শেষাংশে 'কুল্লুন' শব্দব্যবহারে পৃথিবীকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কারণ রাত-দিনের ব্যাপারটি মূলত পৃথিবীর মধ্যেই সংঘটিত হয়। এছাড়া আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, আয়াতে করীমের প্রথমাংশে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে: দিবারাত্রির আবর্তনের কারণ হচ্ছে পৃথিবীর দৈনিক (আহ্নিক) গতি এবং চন্দ্রকে পৃথিবী ধরে রাখার কারণে সূর্য একে নাগাল

পেতে পারে না। অর্থাৎ তার মহাকর্ষ দ্বারা নিজের ওপর নিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে না। এখানে ইঙ্গিতে পৃথিবী দ্বারা চন্দ্রকে মহাকর্ষ কর্তৃক আটকে রাখা, তার (মাসিক) ঘুর্ণনের কারণে পৃথিবীতে পতিত না হাওয়ার কথাও বলে দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা। 'মহাকর্ষ' বা গ্র্যাভিটেশন অনেক পরে আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) আবিষ্কার করেছেন বলে সবাই বলেন। কিন্তু লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা কটি অল্প কথায় মহাকর্ষের ক্রিয়া চৌদ্দশত বছর পূর্বেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। বাস্তবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের সারাংশ হচ্ছে, মহার্ষের কারণে সমগ্র মহাবিশ্ব যেমনি ঠিকে আছে, তেমনি তার আকর্ষণ থেকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছু যারতার কক্ষপথে গতিশীল হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে। করণ, ঘুর্ণন গতির ফলেই যে কোনো বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি হয় বাইরের দিকের কেন্দ্রাতিক (সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স) গতি। ভেতর দিকের মহাকর্ষ গতি ও ঘুর্ণনের ফলে সৃষ্ট বাইরের দিকের গতির মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যালান্স বা সমতা। সুতরাং মহাকাশের সকল বস্তুকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেঁচে থাকা একান্ত অবশ্যকরণীয়। কী সুন্দর মাহপ্রভু আল্লাহ তা'আলার পালনকারিতা!

আল-কুরআনের এসব মহাসত্যের বাণী বিজ্ঞানীদের কর্তৃক পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু হাজার বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। টলেমির পরে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ষষ্ঠদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রমাণ (?) করলেন, বাস্তবে পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগতে আমরা বাস করি না- বরং, সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতে আমাদের বাস। স্থির সূর্যের চতুর্দিকে আমাদের পৃথিবীসহ গ্রহ-উপগ্রহগুলো যারতার কক্ষপথে ঘুর্ণমান আছে। কোপারনিকাস গণিতের মাধ্যমে তাঁর এ থিওরির প্রমাণ বৈজ্ঞানিক সমাজে তোলে ধরলেন। অনেক চড়াই-উৎরাই ও কট্টর রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখে এই নতুন থিওরি কোনো মতে ঠিকে গেলো। কিন্তু এটাও ছিলো কুরআনের উক্ত আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সূর্যকে স্থির বলা হয় নি সেখানে! সূর্যও যে সমগ্র সৌরজগৎকে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে উচ্চ গতিতে মহাকাশে সন্তরণ করছে, সে সত্য আবিষ্কার হতে বিংশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা কতে হয়েছে। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক একটি মাত্র থিওরির সর্বজনজ্ঞাত

ইতিহাস। এখন চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, কেউ যদি কোপারনিকাস বা তারও পূর্বের যুগে কোনো মুসলমানকে প্রশ্ন করতো, "দেখো, বিজ্ঞানের একটি সত্য হচ্ছে পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগতে আমরা বাস করছি। অথচ কুরআন বলছে সূর্যসহ সবকিছু ঘুর্ণমান! এটা কী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলো না?" মুসলমান হিসেবে ঐ ব্যক্তি কী জবাব দিয়েছেন বলে আপনার ধারণা? অবশ্যই, জবাব দেওয়া হয়ে থাকবে, "যদি কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বৈজ্ঞানিক থিওরি কেউ প্রকাশ করে তাহলে বুঝতে হবে ঐ থিওরি নির্ভুল নয়। কারণ কুরআন হচ্ছে পবিত্র ও বিশুদ্ধ ওহির্জ্ঞান। যা মহাসত্য।"

কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক থিওরিও নির্ভুল ছিলো না কিন্তু! পরবর্তীতে জোহান কেপ্লার (১৫৭১-১৬৩০) নামক এক মহাকাশ বিজ্ঞানী বললেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সূর্যের চতুর্দিকের বাৎসরিক প্রদক্ষিণপথ উপবৃত্তিক (ইলিপটিক্যাল)। অথচ কোপারনিকাস বলেছিলেন, এ প্রদক্ষিণপথ বৃত্তাকার (সার্কুলার)। কেপ্লারের 'শোধিত' সূর্যকেন্দ্রিক থিওরি দীর্ঘকাল সকলেই বিশ্বাস করতে থাকেন। কিন্তু বিংশ শতকের শুরুতে এসে প্রমাণিত হলো সূর্যও স্থির নয়! বরং সে তার পরিবারবর্গ গ্রহ-উপগ্রহসহ সমবিভ্যাহারে দ্রুত গতিতে আমাদের ছায়াপথকে (বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে) কেন্দ্র করে সন্তরণ বা প্রদক্ষিণ করছে। শুধু তা নয়, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এডউইন হাবল্ (১৮৮৯-১৯৫৩) শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করলেন যে, মহাকাশে আমাদের ছায়াপথ ছাড়াও আরো অসংখ্য গ্যালাক্সি আছে। ওগুলোও মূলত চির-চলন্ত, চির-ঘুর্ণমান এবং সম্প্রসারণশীল। তাঁর এ পর্যবেক্ষণ দ্বারা আলবার্ট আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৯) আপেক্ষিকতাবাদেরও প্রমাণ মিললো যা তিনি দুদশক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। আপেক্ষিকতাবাদের মূল কথাই হচ্ছে, সময়সহ (টাইম) সবকিছু আপেক্ষিক (রিলেটিভ)। তিনি বলেছেন, আমাদের দেখা, পর্যবেক্ষণ, সময়ের মাপজোখ ইত্যাদি নির্ভরশীল আমাদের নিজস্ব অবস্থান ও গতির ওপর। কারণ, জগতে কোথাও এমন কোনো স্থিরবিন্দু নেই যাকে সূত্র করে (রেফারেন্স বানিয়ে) সময়কে মাপা যায়। এবার ভেবে দেখুন পাঠক! টলেমি থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত মহাকাশ বিজ্ঞানের দীর্ঘ গবেষণার ফল কী দাঁড়ালো- সবকিছু ঘুর্ণমান, গতিশীল। সুবহানাল্লাহ! এ কথাটিই তো

মহাগ্রন্থ আল-কুরানের উক্ত সূরা ইয়া-সীনের ৪০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা।

৩.

এ পর্যন্ত তথ্যনির্ভর আলোচনা দ্বারা আমরা প্রমাণ করলাম যে, বিজ্ঞানের সর্বাধিক পুরাতন শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি পরিবর্তনশীল গবেষণার নাম। এ বিজ্ঞান থেকে মাহাকাশের বস্তুগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে অনেককিছু আমরা বুঝতে পেরেছি। তবে এখনো অনেক ব্যাপার জানার বাকী আছে। এবার প্রশ্ন জাগে, অন্যান্য বিজ্ঞানও কী অনুরূপ পরিবর্তনশীল ও অসম্পূর্ণ? এ প্রশ্নের জবাবও খুঁজে দেখার প্রয়োজন আছে। আজকের বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম পদার্থ বিজ্ঞান [Physics]। ইতিহাসের আলোকে আমরা এ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ে সামান্য আলোচনা করবো। পাঠকরা এ থেকেই সহজে অনুধাবন করতে পারবেন যে, পদার্থ বিজ্ঞানও মূলত পরিবর্তনশীল একটি গবেষণার নাম।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিকরা বললেন, সকল বস্তু মূলত একাধিক ক্ষুদ্রতম অংশের সমন্বয়ে গঠিত। তারা এর নামকরণ করলেন 'এটম'। এই থিওরি মতে এটম হচ্ছে এককেটি শক্ত কঠিন বস্তু। একে আর ভাঙ্গা যায় না। এটমের আয়তন, ওজন ও আকার ভিন্ন থাকায় বিভিন্ন ধরনের বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ ২০০০ বছর যাবৎ মানুষ এ থিওরির উপর ভরসা করে আসলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে জন ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪) এই থিওরিকে সামান্য পরিবর্তন করার সাহস দেখালেন। তিনি বললেন সব এটম মূলত একই ধরনের। তাদের ওজন ভিন্ন থাকাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর সৃষ্টির কারণ। এর কিছুদিন পর [১৮৯০ সালে] জে জে থমসন (১৮৫৬-১৯৪০) নতুন এটমিক থিওরি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, এটমের চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্রকায় 'ইলেকট্রন' নামক একটি বস্তু বিদ্যমান। ইলেকট্রন চলন্ত থাকতে পারে তা তিনি ধারণা করেন নি।

থমসন মডেলের ওপর বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন বিশ্বাস করলেন। এরপর ১৯১০ সালের দিকে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) নতুন আরেক

থিওরি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, এটমের কেন্দ্রে খুব ভারী কিছু আছে। ইলেকট্রন এই বস্তুর চতুর্দিকে ঘুর্ণনরত- ঠিক যেরূপ সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে। তিনি এটাও বললেন, কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ধনাত্মক (positive) এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক (negative) শক্তি বহন করে। তবে একটা আরেকটার ওপর পড়ে যাচ্ছে না কেনো- এ প্রশ্নের জবাব তিনি খুঁজে পান নি। প্রায় একই সময় নিয়েল্‌স বহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬২) আরেকটি এটমিক থিওরি তুলে ধরলেন। তিনি থমসনের 'সৌরথিওরি' সমর্থন করেও বললেন, ইলেকট্রনগুলো মূলত প্রদক্ষিণ করে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন এনার্জি ও আকার ধারণ করে- তিনি এসব স্তরকে 'অরবিট্যাল' বলে আখ্যাতি করলেন। এই থিওরি দ্বারা পজিটিভ কিউক্লিয়াসের ওপর নেগিটিভ ইলেকট্রন পড়ে না যাওয়ার ব্যাখ্যা আসলো।

বহ্‌র মডেল বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেলো। কিন্তু বেশিদিন নয়। এক দশক পরই এরউইন স্রোডিঙ্গার (১৮৮৭-১৯৬১) আরো একটি জটিল এটমিক মডেল উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, ইলেকট্রন গ্রহগুলোর মাতো বিশেষ কোনো প্রদক্ষিণপথে ঘুরে না। যে কোনো মুহূর্তে এর অবস্থান সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি!

এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ এটম নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। বর্তমানে এটমকে বিজ্ঞানীরা উপস্থান করতে যেয়ে বলেন: ১. প্রতিটি এটমে আছে কেন্দ্রে অবস্থানরত নিউট্রন ও প্রটন এবং বাইরে চলন্ত ইলেকট্রন। ২. প্রতিটি প্রটন ও নিউট্রন আবার তিনটি করে কণা দ্বারা সৃষ্ট - এগুলোর নাম কুয়ার্ক। ৩. কোন্‌ বস্তু কী তা নির্ভর করে তার এটমে কটি প্রটন ও ইলেকট্রন আছে- সে সংখ্যার ওপর।

এটমিক থিওরির ওপর আর বেশি বলার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে লক্ষণীয় যে, ফিজিক্সের এ শাখার থিওরিগুলোও পবির্তনশীল। উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে তা স্পষ্ট। সতুরাং এ পর্যন্ত আলেচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, "বিজ্ঞানের সকল থিওরিই মূলত পরিবর্তনশীল।" বিজ্ঞান কোনো মহাসত্য এখনও আবিষ্কার করে নি। আজকের থিওরিটিক্যাল বিজ্ঞান জগত সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরছে তা আজ থেকে হাজার বছর পর যে পাল্টে যাবে- তা নিশ্চিত। অপরদিকে বিজ্ঞানের

অপর শাখা প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা সবাই প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছি। প্রযুক্তি ও ইসলামে কোনো সময়ই কোনো ধরনের সংঘাত ছিলো না। সুতরাং প্রযুক্তিকে কষ্টিপাথর বানানোর কোনো সুযোগই নেই। হ্যাঁ, সমগ্র মানবজাতি প্রযুক্তি থেকে উপকার লাভ করতে পারে। এতে মুসলমান হিসেবে আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন সবারই কাম্য।

৪.

উপসংহারে কয়েকটি মৌলিক ব্যাপার উপস্থাপন করে প্রবন্ধের ইতি টানছি। প্রথমত, আমরা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করলাম যে, বিজ্ঞান একটি পরিবর্তনশীল জ্ঞানান্বেষা। সুতরাং ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কোনো থিওরির আপাতসংঘাত মূলত ভিত্তিহীন। কারণ বৈজ্ঞানিক থিওরি পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক থিওরির সঙ্গে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্যধর্ম ইসলাম ও এর ঈমান-আক্বিদাকে ‘কষ্টিপাথর’ হিসেবে মেনে নিতে হবে। যে কোনো বৈজ্ঞানিক থিওরির সাথে ইসলাম ও ঈমানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণও সংঘাত পরিলক্ষিত হলে আমারা ধরে নেবো- ভুলটা বিজ্ঞানেরই। প্রমাণ হিসেবে আমরা বিজ্ঞানচর্চার দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি নজর দিতে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং (চরমভাবে) পরিবর্তনশীল ‘দর্শন’ শাস্ত্রনির্ভর কোনো তথ্যাদি দ্বারা কোনো মুসলমান যাতে বিভ্রান্ত না হন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে চতুর্দিক থেকে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে অনেক ক্ষতিকর বিষয়-আসয় ছড়িয়ে পড়ছে। ঈমান-আক্বিদার সঙ্গে সংঘাতময় কোনো তত্ত্ব-তথ্যাদি দ্বারা যেনো কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হোন- এ কামনা করে প্রবন্ধের ইতি টানছি। আল্লাহ তা’আলা সবাইকে হিফাজতে রাখুন। আমীন।

সিলেট, ১৩/০৩/২০১৪।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হযরত শায়খে কাতিয়া (রাহ.): যুগের শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিলের বিদায়গ্রহণ

গত ৩০ রামাদ্বান জুমু'আতুল বিদার দিন (১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী) আমাদের মাঝ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন এ যুগের এক মহান অলি-আল্লাহ, সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান মুরুব্বী এবং অসংখ্য মানুষের পথপ্রদর্শক, কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া (রাহ.)। প্রায় ৯৬ বছরের তাঁর দীর্ঘ জীনবটি ছিলো, দুনিয়া-আখিরাতে মানুষের মুক্তি ও সফলতা কামনায় নিবেদিত। কিভাবে সঠিক দ্বীনদারী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সেই চিন্তা-ফিকির-কর্ম ছিলো তাঁর জীবনভর সাধনা। তাঁর মৃত্যুসংবাদের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে উপমহাদেশের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক এবং মাসিক মদীনার সম্মানিত সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা:বা:) বলেন: "আমার দৃষ্টিতে তিনি বাংলার কুতুব ছিলেন- সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন তাই অনেকে তাঁকে চিনতে পারেন নি। ... হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রাহ.) হিদায়াতের, তাসাওউফের এবং একই সাথে রাজনীতির যে ধারা বিস্তার করেছিলেন, এর সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন কাতিয়ার শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন আমাদের মুরুব্বী, গুরু, পথপ্রদর্শক, নেতা, বন্ধু - যাই বলেন .... কী আর বলবো ... ।" [অত্র প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক প্রণীত, 'কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া (রাহ.) জীবনের শেষ ক'টি দিন এবং অমৃত বাণী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত] যুগের এই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক রাহবার ও অসংখ্য মানুষের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের জীবন ও কর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। সুতরাং অতি সংক্ষেপে হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহ.-এর জীবন ও চরিত্র মাধুর্যের উপর আলোচনা তুলে ধরছি মাত্র।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত জগন্নাথপুর থানার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কাতিয়া নামক গ্রামে, আনুমানিক ১৯১৪ সালে 'শেখ বংশ' নামে সুখ্যাত একটি মুসলিম পরিবারে হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম শেখ মুহাম্মদ কনাই এবং মাতার নাম মরহুমা খালেদা বিবি। খুব অল্প বয়সের সময়ই তাঁর পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াতীম

শিশু আমিন উদ্দীন পরিবারের অন্যান্যদের কর্তৃক লালিত-পালিত হয়ে শৈশবে পদার্পণ করার পরই চাষাবাদে জড়িত হওয়ার জন্য পারিবারিক চাপের মুখে পড়েন। কিন্তু যিনি হবেন যুগের প্রসিদ্ধ সফল রূহানী চিকিৎসক, দ্বীনের মহান খাদিম তিনি কী আর এভাবে সাধারণ কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারেন? এক দু'দিন নিজস্ব জমি-জমায় কাজ করার পরই তিনি বড় ভাইদেরকে বললেন, আমি সুশিক্ষিত হতে চাই-চাষাবাদ করে জীবন কাটাতে পারবো না! সুতরাং কিছুটা বিলম্বে হলেও তিনি শিক্ষাজীবনে পদার্পণ করলেন। প্রথমে স্বীয় গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার্জন শেষে, জগন্নাথপুর থানাধীন পাটলী এবং নবীগঞ্জ থানাধীন দিঘলবাগ গ্রামের (বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ স্কিম) স্কুলে লেখাপড়া করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে গমন

প্রাথমিক শিক্ষার্জনের সময় একদা কিশোর শায়খে কাতিয়া (রাহ.) স্বপ্নে দেখলেন, উপমহাদেশের প্রখ্যাত রূহানী রাহবার শাইখুল ইসলাম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ. তাঁকে পবিত্র কুরআনের দার্স দিচ্ছেন। স্বভাবতই এরূপ একটি স্বপ্ন দেখার পর কিশোর হযরত শায়খে কাতিয়ার মনে হযরত মাদানীর (রাহ.) সাথে সাক্ষাত করার বিরাট আগ্রহ জন্ম নিলো। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ. সিলেট শহরের মানিক পীরের টিলার বিপরীতে স্থাপিত 'খেলাফত বিল্ডিংয়ে' এসে হাদীস শরীফের দার্স শুরু করেন। তিনি ঐ বছর থেকে মানিক পীরের টিলার অদূরে 'নয়াসড়ক' মসজিদে ই'তিকাফ পালনেও রত হন। সুতরাং কিশোর শায়খে কাতিয়া পবিত্র রমজান মাসে নয়াসড়ক মসজিদে এসে তাঁর ভবিষ্যৎ উস্তাদ ও মুর্শিদ হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানীর (রাহ.) সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন।

সিলেট সদর জিলার গোলাপগঞ্জে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী বাঘা মাদ্রাসায় হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. সরফ, নাহুসহ মাধ্যমিক মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রাহ. এবং হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহ.। এখানকার লেখাপড়া শেষে ১৯৪৩ সালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

শায়খে কাতিয়া যখন শিক্ষার্থী হিসাবে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন তখন মুহতামীমের দায়িত্বে ছিলেন হযরত মাওলানা ক্বারী তাইয়্যিব রাহ. এবং সদর মুদাররিস (শাইখুল হাদীস) ছিলেন শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী

(রাহ.)। দারুল উলূমে থাকাকালেই হযরত শায়খে কাতিয়ার মেধা ও 'ফানা ফিস-শাইখ'-এর হালত প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি স্বীয় উস্তাদ ও মুর্শিদ হযরত হুসাইন আহমদ মাদানীর এতোই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন যে, অচিরেই সবার নিকট 'মাদানী পাগল' হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ ৭ বছর তিনি তাঁর প্রিয় উস্তাদ ও মুর্শিদের খিদমাতে থেকে উচ্চতর শিক্ষার্জন শেষে ১৯৫০ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বিদায় বেলা হযরত মাদানী রাহ. স্বীয় জামা, পাগড়ি, যষ্টি ইত্যাদি হাদিয়া হিসাবে তাঁকে প্রদান করেন। দেওবন্দে হযরত শায়খে কাতিয়ার (রাহ.) সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত নূর উদ্দীন গহরপুরী রাহ.। তিনি বলেন, 'আমি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীসের সনদ নিয়ে এসেছি আর আমার মামা (হযরত শায়খে কাতিয়া) নিয়ে এসেছেন স্বয়ং মাদানী রাহ.'। আর সত্যিই তা-ই। হযরত শায়খে কাতিয়ার বাকী জীবনটাই কেটেছে 'আয়নায়ে মাদানী' হিসাবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রিয় উস্তাদ ও মুর্শিদকে অনুসরণ করতেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৪ বছর যাবৎ তিনি কোনদিন খদ্দরের তৈরী (মোটা সুতার) জামা ছাড়া আর কোন ধরনের জামা পরিধান করেন নি।

কাতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই নিজস্ব গ্রামে একটি 'কওমী' মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত শায়খে কাতিয়া নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যক্তিগত অনেক কষ্ট-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বদলে এবং কাতিয়া ও তৎসংলগ্ন অলৈতলী গ্রামের ধর্মানুরাগী মুরুব্বিয়ানদের সহযোগিতায় ১৯৫০ সালে তিনি কাতিয়া গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ "জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া" মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামীম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দীর্ঘ ষাট বছরের অধিক কালব্যাপী এই মাদ্রাসাটি একটি উন্নতমানের কওমী মাদ্রাসা হিসাবে দেশ-বিদেশে খুব সুনাম অর্জন করে আসছে। কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. এর রূহানী সান্নিধ্যলাভ থেকে অত্র মাদ্রাসার অনেক ছাত্র বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। দেশ-বিদেশে তাঁদের অনেকে এখন আলীম ও রূহানী রাহবার হিসাবে সুপরিচিতি অর্জন করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে দাওরা হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার্জনের সুবিধাসম্পন্ন একটি 'মহিলা মাদ্রাসা' শাখাও কাতিয়া মাদ্রাসার সাথে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ঐতিহ্যবাহী এই মাদ্রাসায় এখন হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী দ্বীনি লেখাপড়া করছেন। হযরত শায়খে কাতিয়া

রাহ. এর মৃত্যুর পর মাদ্রাসার মুহতামীম হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী সাহেব।

কাতিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. সিলেট বিভাগসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শহরাঞ্চল থেকে নিভৃত পল্লী-পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত যেখানেই দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছেন সেখানেই তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় মুসলমানদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। দেশে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড "আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লিম বাংলাদেশ" এবং সুনামগঞ্জ এদারার বিশিষ্ট উপদেষ্টা পদে আসীন ছিলেন।

অনুপম চরিত্র-মাধুর্য

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহ. ছিলেন সবার আপনজন। তাঁর ইন্তিকালের পর অনেকের নিকট থেকে যে মন্তব্য আমরা পেয়েছি তা থেকেই হযরতের অনুপম চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। সবার মুখে একই কথা: "তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী মায়া করতেন"। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও বলেছেন, হযরত শায়খে কাতিয়া তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি প্রত্যেককে একান্ত আপনজন মনে করতেন এবং দুনিয়া-আখিরাতে কিভাবে তাদের মুক্তি ও সফলতা অর্জিত হতে পারে সে চিন্তায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে দিতেন। শহরে-গঞ্জে-গ্রামে তিনি অবিরাম সফর করতেন এবং মানুষের সংস্পর্শে থেকে সকলের বাহ্যিক ও রূহানী উন্নয়নে নিজেকে জড়িয়ে দিতেন। অনেক সময় দেখা যেতো তিনি নিজের হাতের যষ্টি দিয়ে মানুষকে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে আঘাত হানছেন। সময় সময় মৃদু ভর্ৎসনাও করেছেন, কিন্তু এতে কেউ কোনদিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট পর্যন্ত হন নি। বরং অত্যন্ত খুশী হতেন। একদা বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তিনি ফযরের নামায দরগাহে হযরত শাহজালাল (রাহ:) মসজিদে আদায় করলেন। তারপর মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখা গেল, এক যুবক এসে তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরেছে। তিনি তাকে নিজের হাতের যষ্টি দ্বারা বেশ ক'টি আঘাত হানলেন। এরপর যুবকটি অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল। পরে তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে সুদূর ছাতক থানা শহর থেকে এসেছে হযরত শায়খে কাতিয়ার হাতের গল্লার বাড়ি খাওয়ার জন্য! ক'দিন পর সে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে- এই 'গল্লার বাড়ি' হেতু সে এতে ভালো রেজাল্ট করার আশা করে।

উপরে বর্ণিত এরূপ অনেক ঘটনাবলীর কথা লোকমুখে শোনা যায়। এ থেকে এটা সহজেই অনুমিত হয়, তিনি কোন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনো একা বসে আহার করতেন না। সর্বদাই অন্তত আরো একজনকে নিয়ে তিনি একই প্লেটে খাবার খেতেন। দেওবন্দে লেখাপড়া শুরুর পর থেকে আজীবন তিনি হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহ. -এর অনুসরণে 'খদ্দরের' জামা-কাপড় ও টুপি পরিধান করেছেন। এমনকি এই মোটা সূতার খদ্দরের কাপড় দ্বারাই তাঁর কাফন হয়েছে। তিনি নিজেই ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে এই কাফনের কাপড় ক্রয় করে রেখেছিলেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। একটা সুন্নাতও যাতে ছুটে না যায় সে ব্যাপারে তাঁর মতো সতর্ক লোক খুব কম ছিলেন বা আছেন। একদা বিলেত সফরকালে আমি তাঁর খাদিম হিসাবে সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। দীর্ঘ ২৮ দিনের এই সফরের সময় হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. পদে পদে আমাকে সুন্নাতের অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন- এমনকি ভুল-ত্রুটি হলেও সাথে সাথে আমাকে ওয়াকিফহাল করেছেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য 'ট্রেনিং' দিয়েছেন। এই সফরে এক রাতে তাঁর কোনো এক মুরীদের বাসায় আমরা রাত্রি যাপন করি। ঘুমোনোর পূর্বে আমি পাজামা খোলার সময় ভুলে প্রথমে ডান পা খুললাম। হযরত রাহ. সাথে সাথে বললেন, "তুমি সুন্নাতের খেলাপ কেনো করলে!"। এরপর বললেন, পাজামা সুন্নাত পদ্ধতিতে আবার পরো এরপর সুন্নাত পদ্ধতিতে আবার খোলো, এটা হলো সুন্নাতের 'ট্রেনিং'! বলাই বাহুল্য, পাজামা পরা ও খোলার এই সুন্নাতকে আমি কোনোদিন আর ভুলি নি। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. সারা জীবনই তাঁর সুহবতে যারা সময় কাটিয়েছেন তাদেরকে এভাবে সুন্নাতের পাবন্দ হতে অভিজ্ঞতার আলোকে তাগিদ দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রূহানিয়্যাত, ব্যক্তিত্ব ও উন্নত আ'মলী জিন্দেগী ছিলো সকল মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। মানুষ কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ করে সে চিন্তায় তিনি সর্বদা ব্যকুল থাকতেন। একদিন আমাকে বললেন, তোমার নামায কখন কামিল হয়েছে বলে তুমি নিশ্চিতভাবে জানবে তা কি বলে দেবো? মনে রেখো, যখন তুমি নামাযে যাওয়ার সময় দেখবে অপর কোনো মুসলমান ভাই নামাযে যাচ্ছে না, আর এ থেকে যদি তোমার অন্তরে আগুন লেগে যায়- তবেই বুঝবে তোমার নামায কামিল হয়েছে।

হযরত শায়খে কাতিয়া ইয়াতীম, মিসকিন, গরীব ও ফকিরদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইয়াতীম কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন, "আহ! লোকটি ইয়াতীম!" একদা আমার সিলেটস্থ বাড়িতে তিনি মেহমান হলেন। মা-বাবা হারা

আমার ভায়রা ভাইয়ের সন্তান শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত নূরুজ্জামান যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন তার পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কেমন আছেন বাবা? নূরুজ্জামান একটু নতমস্তকে জবাব দিলেন, তারা তো উভয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন, হযরত। হযরত শায়খে কাতিয়া তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "আহ! তুমি ইয়াতীম, তুমি ইয়াতীম!" এরপর থেকে হযরতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলেই এই ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন।

তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমান মুহাব্বাতের দৃষ্টিতে দেখতেন। এক রিক্সা ড্রাইভার তিনদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাকে নিয়ে একই প্লেটে খাবার খেয়েছেন, নিজের খরচে ইসলামী লেবাস তথা পাঞ্জাবী, পাজামা, টুপি ইত্যাদি ক্রয় করে দিয়েছেন এবং তাকে অনেক টাকাও প্রদান করেছেন। বিদায় বেলা ড্রাইভার কাঁদতে লাগলেন, বললেন: "আমার জীবনেও কেউ আমাকে এরূপ মায়া-মুহাব্বাত করেন নি।" নেত্রকোণা জিলার জারিয়া নামক শহরে স্থাপিত একটি মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় একবার তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন। আসরের নামাযের সময় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর নামাযান্তে আপ্যায়নের জন্য কিছু ফল-ফ্রুট তাঁর সামনে নিয়ে আসলেন কর্তৃপক্ষ। পাশেই বসা ছিলেন স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মধ্যবয়সী জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব। হযরত শায়খে কাতিয়া একটি কলা নিয়ে তাকে মুখে তুলে দিয়ে বললেন, "খেয়ে নিন!" আমি লোকটির দিকে তাকাচ্ছিলাম। তার চোখ দু'টো অশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠলো। তিনি কলা খেয়ে নিলেন। এরপর বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে আজকের জন্য আমি গরীবের বাড়িতে মেহমান হয়ে আমার জীবনকে ধন্য করুন। ঐ রাতে মুজিবুর রহমানের সাথে আমার কথা হলো। আমি তাকে কলা খাওয়ার সময় চোখে জল আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, "ছোটবেলা মা-বাবা আমাকে এভাবে কলা মুখে তুলে দিতেন যেভাবে আজ হযরত শায়খে কাতিয়া তুলে দিলেন। আমাকে তিনি এরূপ মুহাব্বাত করছেন দেখে চোখের মধ্যে অশ্রু আসা ছাড়া আর কী আসতে পারে?" উল্লেখ্য, এ রাতেই তাহাজ্জুদের সময় তিনি হযরত শায়খে কাতিয়ার হাতে বাইআত গ্রহণ করে তাঁর মুরীদ হয়ে যান। অথচ ইতোমধ্যে জারিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক জলসায় আগত পীর-মাশাইখ এবং আলিম-উলামাদের মেজবান হিসাবে নিজের বাড়িতে এনে খিদমাত করেছেন, কিন্তু কারো হাতে বাইআত গ্রহণ করেন নি।

মাদানী পরিবারের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ

কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবশ্য উপমহাদেশের প্রখ্যাত রূহানী রাহবার, শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ও মুরীদ ছিলেন। সুতরাং স্বভাবতই 'মাদানী পরিবারের' প্রতি তার বিশেষ এক আকর্ষণ ছিলো। শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য উত্তরসূরী ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তিনি স্বীয় পীর সাহেবের সন্তান হিসাবে খুব বেশী শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত করতেন। দু'বার নিজ খরচে তিনি তাকে কাতিয়া মাদ্রাসায় হেলিকপ্টার ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন। শেষের আগমনের সময় এ অধম লেখকও কাতিয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবকিছু অবলোকন করেছি। মাদ্রাসার বাৎসরিক 'খতমে বুখারী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ফিদায়ে মিল্লাত হেলিকপ্টারযোগে আসার পর তিনি অপর আরেক অনুষ্ঠানে ঐ হেলিকপ্টারযোগেই চলে যান। এরপর উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ 'মাসিক মদীনার' সম্মানিত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা. অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে বলেছিলেন, 'কাতিয়ার শেখ সাহেবকে আমরা সবাই চিনতে পারি নি- তিনি হচ্ছেন বাংলার কুতুব তথা কুতবে বাঙ্গাল'। উল্লেখ্য সেই থেকেই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কুতবে বাঙ্গাল' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন হযরত আর্শাদ মাদানী দা.বা.। হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকেও খুব শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত করতেন। বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হতেন এবং তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্ত থাকতেন। রাজনীতির মাঠেও হযরত কুতবে বাঙ্গালের অবদান কম ছিলো না। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের আজীবন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর জমিয়তের সভাপতির শূন্যপদ পূরণের জন্য তাঁকেই অনেকে সমর্থন করেছিলেন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আজরাবাদ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত 'নির্বাচনে' হযরত মাওলানা আব্দুল মুমিন ইমামবাড়ি সাহেব সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। নারী নেতৃত্বের প্রশ্নে হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থান সম্পর্কে সবাই অবগত। তিনি সারা জীবনই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। আমরা মনে করি, এই নারী নেতৃত্বের প্রশ্নে হযরত কুতবে বাঙ্গালের অনড় অবস্থানের কারণেই তিনি শেষ জীবনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া থেকে বঞ্চিত

হন। উল্লেখ্য এই সভাপতি নির্বাচনের সময় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত থেকে তখনকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ‘ঐক্যজোটের’ সদস্য ছিলো।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

কুতবে বাঙ্গালের ইন্তিকালের তারিখ ছিলো অত্যন্ত গুরুত্ববহ এক দিন। পবিত্র রমজান মুবারকের সর্বশেষ শুক্রবার তথা ৩০ রমজানের জুমু’আতুল বিদা’র দিন বাদ জুমু’আ তিনি সিলেটস্থ আলী সেন্টারে স্থাপিত মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। পরদিন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহ ময়দানে ৫ লক্ষাধিক মানুষ তার জানাযা নামাযে শরীক হন- তারপর ঐদিনই কাতিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আরো লক্ষাধিক মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মৃত্যুকালীন আরো কয়েকটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

শেষ বারের মতো কাতিয়া গ্রাম থেকে সিলেটে আসার আগের দিন কাতিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে ৫ বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তিনি সিলেট থেকে আর জীবিতাবস্থায় কাতিয়া গ্রামে ফেরৎ যান নি। মৃত্যুর আগের রাত থেকে ঈদের দিন বিকেল তিনটা পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেট ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার তথা ঈদের দিন বিকেল সাড়ে তিনটার সময় তাঁকে কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠের পূর্বদিকে হিফজখানার নিকটে কবরস্থ করা হয়। বেশ ক’দিন যাবৎ তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সময় এ সুঘ্রান সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যেতো। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দা ও অলিমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।
৯/২/২০১১

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মান আ'রাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আ'রাফা রাব্বাহু

নশ্বর এ ধরার বুকে ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী আমার। কোথা থেকে আগমন আর কোথায় যাওয়া, কী-ই বা এখানে আসার কারণ আর কী-ই বা পাওয়া। মাটির তৈরি এ দেহখানার মূল্য কেমন, জীবনটারই বা মূল্য কী? এখানকার চাকচিক্য, অট্টালিকা, নারী আর বাসরশয্যা- সবই তো মনভুলানো কারসাজি। আমি ভাবি বাইরের জগত নিয়ে- ঐ কোটি আলোক-বছর দূরের তারা আর পাশের সেই গুলবাগিচা আমার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। মহাসাগরের পারে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে থাকি একপলকে ঊর্মিতে দোদুল্যমান থৈ থৈ জলোপরি। দেখি দূরে আকাশের গাঁয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে বিরাট পাহাড়টি। আমার কল্পনা, ভাবনার শেষ নেই। শেষ নেই নিজেকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করার ফিকির। টাকা-বাড়ি-গাড়ি-নারী, সবই আমার একান্ত কাম্য। আরো আছে লোভনীয় অনেককিছু- যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা, যা পেতে জীবনভর আছি মহাধান্ধায়।

আমি সবই পেতে চাই। তা পেতে জীবনের পুরোটাই বিসর্জন দিই। কিন্তু ভাবি না একজিনিষ, যে জিনিষটি অতি কাছে, অতি আপন, অতি জরুরী, চিরসাথী সে-ই 'আপন'কে নিয়ে। তাইতো কবি বলেন, প্রত্যেক বস্তুর দাম জানা জ্ঞানের পরিচয়। আপন পরিচয় না জানা কি মূর্খতা নয়? আমি কে, কোথায় আমার আসল ঠিকানা, কোথা থেকে এলাম, যাবোই বা কোথায়? এ জগতের সবই আমি জানি চিনি, চেনার ফিকিরে সদাব্যস্ত- কিন্তু চিনি না শুধু নিজেকে, সর্বাপেক্ষা কাছের এই দেহাবয়বের বাইর-ভেতর ও নফসকে- কী আশ্চর্য মানুষ আমি! এই দেহটি কী যন্ত্র? এরই মাঝে লুকিয়ে থাকা ঊর্ধ্ব জগতের সেই সূক্ষ্ম জিনিসটির স্বরূপ কী? কোথায় তার মূল? সে এসেছে এই নশ্বর ধরায় প্রভুর নির্দেশে। কিন্তু এখানে সে কেমন অবস্থায় সময় কাটায়? তার চেতনাই তো 'আমার' চেতনা। তারই মাধ্যমে আমি জীবিত, সে-ই তো আমার প্রাণ। কিন্তু সে এই ক্ষণস্থায়ী ধরায় এসে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। সে হাহাকার করছে তার বাঁশ বাগানে ফিরে যেতে। এই আপনকে ভুলে আমি কোন্ সে যাদুকরের মহামন্ত্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম

এই নশ্বর ক'টি-দিন স্থায়ী ধরার মোহে? কেন এমনটি হলো? আমার স্রষ্টাকে জানার ইচ্ছেটা পর্যন্ত নিজের মাঝে জাগ্রত হয় না! যাদুকরী 'দুনিয়া' আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে- আসল কাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে। আমি জীবনকে খুইয়েছি। কবে কোন্ মুহূর্তে ঘাড়ে ধরে ধরাশায়ী করবে আমায় চিরতরে মালিকুল মাউত- কে জানে। একটি ক্ষণেরও তো নিশ্চয়তা নেই। আহ! কেন এই আসা আর যাওয়া। এহেন জীবন তো নিদ্রামগ্নতা। বেহুঁশী। বে-খেয়ালীপনা। যেন মৃত। তাহলে ব্যর্থ নয় কি আমার জীবন? কবরের সঙ্গী কেউ নেই- কিছু নেই। আছে শুধু বে-খবর, নাফরমানী আর দুনিয়ার ধান্ধায় অন্ধত্বের মাঝে জীবন কাটানোর এক দীর্ঘ ফিরিস্তি। আহ্! কী নিষ্ফল এক জীবন!

আমি যাকে জানার জন্য এলাম, যার ইবাদত আমার সৃষ্টির একমাত্র কারণ, যে আমাকে জীবন দিল ও পালন করলো, যার অনুগ্রহ দুনিয়া-আখিরাতে চিরন্তন, যে আমাকে জীবিত রাখে সে নিজে সজাগ থেকে যখন আমি রাতের অন্ধকারে নিদ্রামগ্ন- যে ঘুমকে স্বয়ং পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিদ্রা হলো মৃত্যুর সহোদর"। যে মহান প্রভু আমার গাফ্লতির কারণে নিজেই আক্ষেপ করেন। যিনি আমাকে ঈমানের স্বাদে আপ্লুত করলেন আর এর নূরেতে আলোকিত করে রাস্তার দিশা দিলেন, যিনি সৃষ্টি করলেন এই মহাবিশ্ব- এর মধ্যে যাহির-বাতিন কত শতকোটি নিয়ামত দিলেন আমাকে- শুধু আমার পালনকারিতা হেতু। যিনি পথের দিশারী হিসেবে পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁর মাহবুব, যার কারণে সবকিছুর অস্তিত্ব- সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, মহামানব, আমার ভাবনায় যাঁর চোখ দু'টো অশ্রুতে সিক্ত হয়েছে, যাঁর করুণা ছিল অসীম, যিনি শেষ বিচারের দিনে আমার জন্য সুপারিশ করবেন। হায়! আমি কী করে ভুলে রইলাম আমার মহান, দয়ালু, মেহেরবান, রাহমান, রাহীম, গাফ্ফার, ওয়াদুদ- একান্ত আপন, প্রভুকে? আমার আল্লাহকে আমি চিনতেই তো পারলাম না। ধিক্ এই নশ্বর দুনিয়া! ধিক্ এই জীবনের জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা! আমি একটিবার নিজেকে নিয়ে ভাবলাম না। আর নিজেকেই যদি জানতে হই অপারগ, তাহলে যেজন এই 'নিজকে' সৃজিলেন তাঁকে জানবো কি করে? শিল্পীকে কি তাঁর শিল্পকর্ম দিয়েই চিনতে হয় না? গুণিজনের সেই

বাণী ‘মান আ’রাফা নাফসাহু, ফাক্বাদ আ’রাফা রাব্বাহু’ - যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার রবকে জানতে পেরেছে-এর মর্মার্থ কী হয়, সে-নিয়েই তো একদিনও গভীরভাবে চিন্তা করি নি। চিন্তা করার সময় খুইয়েছি। সময়কে আজেবাজে ধ্বংসশীল বস্তুর পেছনে বিসর্জন দিয়েছি। আজ, শুধু হাহাকার। কবে কোন্ মুহূর্তে যে কবরে চলে যাওয়ার আযান আসে! জীবন কাটালাম মাকড়শার জালের মতো অতি দুর্বল অস্থায়ী এই জগতের কতকিছুর পেছনে। এখন দেখি কেউ নেই, কিছু নেই- সব হাতছাড়া! সবই ছিলো মরুভূমির মরীচিকা।

ভাইসব! বোনেরা! নিজেকে জানার ফিকিরে লেগে যান। লেগে যান আপনকে চিনে প্রভুর পরিচয়লাভের নেশায়। আমি গাফিলের মতো, ভুলের এক অসার জন্দেগী যাপন করে কবরের দিকে পাড়ি দেবেন না। আপনার তনু-মন-প্রাণকে নিবিষ্ট রাখুন এক আল্লাহর ধ্যানে। আর এই ‘প্রাণ’ বা ‘রূহ’ নামক বস্তুটি কি তা খুঁজে দেখুন। ইহসান ও একাগ্রতা তো আসবে নিজের মাঝে লুকানো আসল বস্তুকে জানা-চেনার পর। নিজেকে জানুন, চিনুন, ভাবুন। জীবনকে আর অহেতুক নষ্ট করবেন না। আমার মতো বে-খবর থেকে আর সময়টার অপচয় করবেন না। আসা-যাওয়ার এই খেলাঘরের আসবাবপত্র সত্যিই মনভুলানো, লোলুপপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে সেই সুসজ্জিত নারীর মতো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে এসে দাঁড়িয়েছিল মিরাজ রজনীতে।

আমি বলি না, জীবনের মানোন্নয়নে আপনি সম্পূর্ণ বিমুখতা দেখাবেন। জীবনকে আপনি টেকনোলজির সুবাদে, সুযোগ-সুবিধার ব্যবহারে- শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা দ্বারা আরও সুসমৃদ্ধ করুন- তবে তা হতে হবে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ রাস্তায়, সঠিক হালাল পন্থায়। আপনি সমগ্র পৃথিবীর মালিক হয়ে যান, তা-তে কিছু আসে যায় না- যদি আপনার অন্তর আল্লাহর পরিচয়লাভের ধ্যানে থাকে মগ্ন। আপনার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা যদি নিবদ্ধ হয় না ঐ সম্পদ আর অন্য সবকিছুর মধ্যে। মুসলমানের জীবন তো এরূপ হওয়া চাই। সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে, সবার সঙ্গে চলবে-ফিরবে-খাবে-দাবে। সে আয় উন্নয়নের লক্ষ্যে যেটুকু প্রয়োজন তা নিয়ে চেষ্টা-সাধনা করবে, কিন্তু- সে সর্বদা আখিরাতের অনন্ত জীবনের উপর

অগ্রাধিকার দেবে। সেই অশেষ জীবনটি যাতে বরবাদ না হয়ে যায়, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে সে যেনো বঞ্চিত না হয়, সেই খেয়াল থেকে গাফিল হবে না। আল্লাহর সম্মুখে একদা দণ্ডায়মান হওয়ার ভীতি তার অন্তরকে সময় সময় কাঁপিয়ে তুলবে। কুরআনুল করীমে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেনঃ "ওয়ালিমান খা-ফা মাক্বামা রাব্বিহি জান্নাতান"- যে তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় অন্তরে রাখে তার জন্য দু'টি বেহেশত। গাফ্‌লতিই মানুষকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই এক মহান দরবেশ বলেছেন, ওলিআল্লাহ সে ব্যক্তি যে ঘর-সংসার করে যেভাবে করতে হয় অথচ সে এক মুহূর্তও আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল নয়- আর তার এ অবস্থা কেউ জানতেও পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে নিজেকে জানা ও তাঁকে জানা-চেনা এবং তাঁর ইবাদতের মধ্যে ডুবে থাকার তাওফিক দিন। আ-মীন।

সিলেট, ১৫ নভেম্বর ২০০৫।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লন্ডনে সংবর্ধনা ও 'বাহরুল উলূম' উপাধিতে ভূষিত

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। তাঁর ক্ষুরধার কলমের উচ্চমানের লেখালেখি, সান্নিধ্য লাভ, স্নেহ-মমতা প্রাপ্তি ও জ্ঞানগর্ব কথাগুলো শ্রবণ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। এ অভাব কোনোদিন পূরণ হবে না। সৌভাগ্যক্রমে হযরতের ইন্তিকালের সময় দেশে অবস্থান করায় বাইতুল মুকাররম মসজিদে যেয়ে হযরতের জানাযার নামাযে শরীক হতে পেরেছিলাম। এ্যাম্বুলেন্সের জানালা দিয়ে দেখা তাঁর সেই চিরনিদ্রিত নূরানী চেহারাখানার ছবি আজো স্মৃতিপটে ভাস্বর। থাকবে যতোদিন পৃথিবীতে বেঁচে আছি। যখনই দু'চার কলম লিখতে ইচ্ছে করেছি তখনই হযরত মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহর কথা মনে পড়েছে। কারণ, আমার লেখালেখি জীবনের প্রেরণা-উদ্দীপনার উৎস ছিলেন তিনিই।

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হবে জেনে যারপরনেই খুশি হয়েছি। হযরত রাহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ বদরুদ্দীন খান সাহেব স্মারক গ্রন্থে প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ লেখার আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। হযরত খান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ ১৯৯৯ ঈসায়ী সালে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে বেড়াতে যান। তখন আমি একটি ইসলামী সাময়িকীর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম। সুতরাং ঐ সময়ের কিছু স্মৃতিচারণ করছি এ প্রবন্ধে।

আমি ছোট থেকেই হযরত মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ম্যাগাজিন 'মাসিক মদীনা'র কথা শুনে আসছি। সম্ভবত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরখানেক পূর্বে এই ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা প্রথমবারের মতো পাঠ করেছিলাম। তখন আমরা থাকতাম আমার জন্মস্থান সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর থানার বনগাঁও নামক এক নিভৃত পল্লীতে। পাড়াগাঁয়ে তখনকার যুগে জাতীয় পত্র-পত্রিকা খুব অল্পই পাওয়া যেতো। তবে আমাদের বাড়িটি সবদিক থেকে

অনেকটা অগ্রগামী ছিল। এর একাধিক কারণও আছে। প্রথমত বনগাঁও গ্রামের মধ্যে এ বাড়ির সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। বাড়ির মধ্যেই বহু পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল সরকারী প্রাইমারী স্কুল। এছাড়া আরও পুরাতন একটি মসজিদ। সুতরাং মসজিদ-স্কুলওয়ালা 'পূর্ব বাড়ির' লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো তুলনামূলকভাবে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এ বাড়ির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার এক চাচা মরহুম জনাব আবদুর রইছ এডভোকেট সত্তুরের নির্বাচনে 'আওয়ামীলীগ' এর এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং তখনকার মুক্তি যুদ্ধকালীন দিনগুলোতে আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের প্রফেশন্যাল লোকের বেশ আনাগোনা ছিল। এমনকি ৯ মাস যুদ্ধকালীন সময়ে একাধিক-বার কমান্ডার র‍্যাংকের মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনও ঘটেছে। যা হোক, শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে থাকা বনগাঁও 'পূর্ব বাড়ির' অনেকেই সিলেট ও সুনামগঞ্জ শহরে লেখাপড়ায় থাকতেন। স্বভাবতই তারা বিভিন্ন ছুটিতে জন্মস্থানে বেড়াতে আসতেন এবং সাথে নিয়ে আসতেন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, 'আউট' বই-পুস্তক ইত্যাদি। আর এভাবেই ঐতিহ্যবাহী 'মাসিক মদীনা' ম্যাগাজিনটি একদা আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছুয়ে গেল।

স্বাধীনতার এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিলেতে চলে যাই। তখন আমার বয়স পনেরো বছর মাত্র। দেশে থাকতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। কিন্তু নিজের ভাষাকে আরও শেখার প্রয়াস কখনও যায় নি। এটা বলা যায়, এ আগ্রহ মাতৃভাষার প্রতি নেচার‍্যাল আকর্ষণ থেকেই জন্ম নিয়েছিল। সুতরাং সুদূর বিলেতে থেকেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা পাঠের অভ্যেস অব্যাহত রাখি। পাশাপাশি অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা তো ছিলোই- কারণ, আমি দীর্ঘ ৬ বছর সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর লেখাপড়া করেছি। মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ- এবং আমার ক্ষেত্রে একটু অতিরিক্ত আগ্রহ থাকার ফলেই, সেখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এক দু'টো কবিতা ও চিঠিপত্র প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এরপর চলে গেল দু'টি যুগ। লেখালেখির প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়তে লাগলো, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা খুব একটা মিললো না। কারণ বামঘেঁষা স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোর সম্পাদক

সাহেবরা ‘ইসলামী’ লেখালেখি ছাপাতে সর্বদাই কিছুটা সংকোচবোধ করতেন। তাদের পত্র-পত্রিকার লেখক ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীরা। সুতরাং একটি ‘ইসলামী’ পত্রিকার অভাব সবাই অনুভব করি। শেষে কবি আবদুল মুকিত মুখতারের সঙ্গে একদা আমার বাসস্থানে বসে ‘ইসলামী সমাচার’ পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। আর এ পত্রিকাটি প্রকাশের সুবাদেই আমার হৃদয়ের আদর্শ পুরুষ, প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় ১৯৯৮ সালে। তখন তিনি প্রথমবারের মতো লন্ডনে বেড়াতে যান।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব [রাহিমাহুল্লাহ] লন্ডনের ‘মারকাজুল উলূম’ নামক মাদরাসা ও মসজিদের বার্ষিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে দ্বিতীয়বার যোগ দেন ১৯৯৯ ঈসায়ী সালে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা শোয়াইব আহমাদ সাহেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ‘ইসলামী সমাচারের’ সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত একমাত্র ‘ইসলামী’ এই ম্যাগাজিনটির উত্তরোত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। যা হোক, খান সাহেব হুজুরের দ্বিতীয়বার লন্ডনে আগমনের সংবাদ আমরা যথারীতি ‘ইসলামী সমাচারে’ প্রকাশ করলাম।

এ বছর মারকাজুল উলূমের বার্ষিক অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে হযরতের সঙ্গে দেখা করলাম। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শেষে অফিসে আসি। ইসলামী সমাচার পরিবারের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত জ্ঞানতাপসকে একটি সংবর্ধনা প্রদান করবো। পরদিন সম্পাদক আবদুল মুকিত মুখতার সাহেব মাওলানা শোয়াইব আহমাদকে ফোন করে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংবর্ধনার দিন-তারিখ ঠিক করে নিলেন। ইতোমধ্যে এদিনই আমরা অফিসে বসে তাঁকে স্বর্ণপদকসহ উপাধি প্রদান নিয়ে কথা বললাম।

আমাদের পত্রিকার আরেক কলামিস্ট ছিলেন মরহুম ডা. আবু বকর আহমাদ হারুন। তিনি যুক্তরাজ্যের সাফোক নামক কাউন্টি’র ইপসূইচ শহরে বসবাস করতেন। দূরে থাকায় তাঁর সঙ্গে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হতো না, তবে দৈনিক অন্তত একবার ফোনে আলাপ করতাম। তিনি স্বর্ণপদক

প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি ছিলেন বিএনএসএ (বাংলাদেশ নেশন্যাল স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন) নামক একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। হারুন সাহেব বললেন, অনুষ্ঠানে আমি নিজে উপস্থিত থাকতে পারবো না- তবে একটি স্বর্ণপদকসহ নির্দিষ্ট দিনে তা আপনাদের অফিসে পৌঁছুয়ে দেবো। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হলাম। এবার উপাধি কী হবে সে নিয়ে আলাপ হলো। অনেকে অনেককিছু বললেন। এক পর্যায়ে হঠাৎ আমার খেয়ালে আসলো, 'বিদ্যাসাগর' শব্দটি। আমি সাথে সাথেই বললাম, আমার মতে তাঁকে 'বাহরুল উলূম' উপাধিতে ভূষিত করা হোক। এতে সবার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো- সবাই একমত হলেন।

ঈসায়ী ১৯৯৯ সালের ১৮ই আগস্ট পূর্ব লন্ডনের হ্যানবারী স্ট্রিটে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী 'কবি নজরুল সেন্টার'-এ মাসিক মদীনার সম্মানিত সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহকে 'বাহরুল উলূম' উপাধিতে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো। আমরা এ মহতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করলাম। অনুষ্ঠানে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন আবু তাহের চৌধুরী, কলামিস্ট অধ্যাপক ফরিদ আহমাদ রেজা, আমার চাচা কবি আবুল বশর আনসারী (রাহ.), কলামিস্ট দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, লেখক শাহজাহান সিরাজ, ইসলামী সমাচার সম্পাদক কবি আবদুল মুকিত মুখতার, প্রিন্সিপাল মাওলানা শোয়াইব আহমাদ প্রমুখ গুণিজন উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান-কালে অধ্যাপক ফরিদ আহমাদ রেজা বললেন, হযরত খান সাহেব হুজুর হচ্ছেন বাংলা ভাষায় ইসলামী গবেষণার অগ্রদূত। তিনি ইসলামকে সর্বসাধারণের কাছে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় তুলে ধরে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আবু তাহের চৌধুরী বললেন, আমার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ যে জিনিসটি তাহলো হযরতের দ্বারা ভারতবর্ষে গোটা ক'টি তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল্লামা শফী (রাহ.) প্রণীত 'তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন' এর বঙ্গানুবাদ। এ থেকে জাতি অশেষ উপকার লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে করবেও। দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী বললেন, খান সাহেব হুজুরের

সুযোগ্য সম্পাদনায় ঐতিহাসিক মাসিক মদীনা ম্যাগাজিন ও এতে নিয়মিত প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর বিভাগটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ বলে মনে করি। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে অসংখ্য সমস্যাবলীর সঠিক ইসলামী শরীয়তসম্মত সমাধান আমরা এই বিভাগ থেকে পাই। অন্যান্য বক্তারাও মাসিক মদীনা সম্পর্কে ইতিবাচক ও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। সবশেষে সংবর্ধনার জবাবে খান সাহেব হুজুর বললেন, "আমার জীবনে অনেক পদক ও উপাধি পেয়েছি কিন্তু কেনো যেনো এটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালো ও মূল্যবান মনে হচ্ছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।" হযরত স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে মাসিক মদীনা প্রকাশের প্রাথমিক কঠিন দিনগুলোর কথা বললেন। এরপর সবাইকে আহ্বান জানালেন, "আপনারা সুদূর বিলেতের এই কুফরী পরিবেশে নিজেদের সন্তানাদিদেরকে লালন-পালন করছেন। আপনাদের উচিৎ 'ইসলামী সমাচারের' মতো একটি হক্বপন্থী সাময়িকীকে যে কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখা। প্রয়োজনে ঘরে ঘরে যেয়ে এটির গ্রাহক তৈরি করুন।"

'বিএনএসএ'র পক্ষ থেকে কবি আবদুল মুকিত মুখতার হযরতকে একটি স্বর্ণের মেডেল এবং ইসলামী সমাচারের পক্ষ থেকে 'বাহরুল উলূম' উপাধি সম্বলিত সনদপত্রটি প্রদান করেন। আমি অনুষ্ঠানে কোনো বক্তব্য প্রদান করি নি। এর একমাত্র কারণ ছিল, আমি বক্তৃতা দিতে জানি না! তবে আমার লেখালেখি জীবনের আদর্শ পুরুষ ও প্রেরণার উৎস যুগশ্রেষ্ঠ এই মহাত্মন বুজুর্গকে লন্ডনে সংবর্ধনা প্রদানের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে, সেদিন নিজেকে নিয়োজিত রাখার সৌভাগ্য পেয়ে খুব বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশকে ইলমের নূরে আলোকিত করে গেছেন। তিনি আরেকবার আমাদের কর্তৃক সিলেট শহরে প্রতিষ্ঠিত 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া'র ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে 'শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর খুলাফাদের' একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে খলিফায়ে মাদানী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা হাফিজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ (দা.বা.), খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দা.বা.), সদস্য সচিব মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, কবি আবদুল মুকিত মুখতারসহ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুলাফাবৃন্দ এবং অনেক উলামায়ে কিরাম ও লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক গুণিজন উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে খান সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ, আমার শায়খ ও মুর্শিদ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর প্রণীত গ্রন্থ ‘জীবন ও সাধনা’ প্রকাশের ব্যাপারে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দেন এবং গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্ব হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর খুলাফাবৃন্দের অনুরোধে নিজেই গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ উক্ত খানক্বার ইমারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আমাদেরই প্রতিষ্ঠিত মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে ২০১০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, মুতাবিক ৩০শে রমজান ১৪৩১ হিজরি শুক্রবার ইন্তিকাল করেন। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত মুহিউদ্দীন খান সাহেব রাহিমাহুল্লাহর সম্পাদনায় ঈসায়ী ২০১৪ সালের মে মাসে ‘কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- জীবন ও সাধনা’ শিরোনামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

সবশেষে আল্লাহর মহান দরবারে আবদার জানাচ্ছি, তিনি যেনো আমাদের এ প্রিয় ব্যক্তিত্ব, ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞানতাপস এবং অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও আপনজন হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। আমরা এটাও কামনা করছি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত উচ্চমানের ইসলামী ম্যাগাজিন ‘মাসিক মদীনা’ বহু বহুকাল যাবৎ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দ্বীনি চাহিদা পূরণসহ মনের খোরাক যোগান দিয়ে যাবে।

সিলেট, ২ নভেম্বর, ২০১৯ ঈসায়ী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমাদের এই বসুন্দরা ও শ্রেষ্ঠ জীবী আমরা

ফুলে, মূলে, ফলে, সবুজে ঘেরা নীল এ পৃথিবীটা আমাদের। এতে স্রষ্টা সৃজন করেছেন জীবন্ত কোটি কোটি মাখলুকাত বা প্রাণী। এরই মধ্যে সেরা জীবী আমরা মানবজাতি। সেরা হওয়ার স্বীকৃতি এসেছে স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকেই। তিনি তাঁর গ্রন্থ কুরআন শরীফে একাধিক স্থানে মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" - বা সৃষ্টির সেরা বলে সম্বোধন করেছেন। তাহলে বুঝা গেল সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যতো ভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জীবী হচ্ছি আমরা। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদের মধ্যে কি সব আলাদা বা বিশেষ গুণাবলী বিদ্যমান যার ফলে আমরা অন্যান্য সকল মাখলুকাত থেকে সেরা হওয়ার অধিকারী হলাম?

প্রতিটি 'প্রাণী'র মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুণাবলী বিদ্যমান থাকায় এগুলো 'জীবী' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ক'টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ১. প্রত্যেক প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে ও তাদের আছে পরিপাক ব্যবস্থা- অর্থাৎ খাদ্য পাক হয়ে প্রয়োজনীয় অংশ দেহে থেকে যায় এবং বাকী যা আছে তা মল মূত্র আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। ২. জীবীকে বড় ও সচল হতে হবে - অর্থাৎ বেড়ে ওঠা ও নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এ গুণাবলীটি ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। ৩. সবশেষে প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী অবশ্যই তার বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারের ক্ষমতা রাখবে। কারণ এটা না হলে সে জীবন্ত হতে পারে না এ কারণে যে, তার অস্তিত্ব এ ধরার বুকে ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়বে।

উপর্যুক্ত এ তিনটি গুণাবলী মানুষ, পশু, পক্ষী ও এমনকি গাছপালা এবং বৃক্ষরাজির মধ্যেও বিদ্যমান। তাহলে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হলো কেন? তার মধ্যে নিশ্চয় অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী আল্লাহ পাক দান করেছেন যার কারণে সে ফিরিশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে। একদিকে সে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী থেকে উৎকৃষ্ট তো আছেই এরপর সে ফিরিশতাদের চেয়েও উত্তম। এখানে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্রে মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার একাধিক কারণ নিহিত।

প্রথমতঃ মানুষের দেহকাঠামো অন্যান্য সকল প্রাণীর তুলনায় অনেক গুণ বেশী জটিল। দেহের সার্বিক ও বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা ও নম্যতা অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা মানব হাতের কথা বলতে পারি। পাঁচটি মাত্র আঙ্গুল এই হাতের মধ্যে। কিন্তু সবগুলো মিলে কী অপূর্ব কর্মক্ষমতা তাদের! এই হাতই সারা বিশ্বের যাবতীয় কিছু তৈরি করেছে। হাতের এই অপূর্ব নম্যতা ও ক্ষমতা জগতে অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এতো গেল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেসব ক্ষমতা রাখে তা। কিন্তু মানুষ দৈহিক দিক থেকে আরও অনেক গুণাবলীর অধিকারী যা অন্য কোন প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। এর একটি হলো চিন্তা। এই ক্ষমতাটি জীবন্ত বিচরণশীল সকল প্রাণীর মধ্যেই অল্প বিস্তর আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এর আধিক্য সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ মানুষের মাথায় যে মগজ বিদ্যমান তা এক অপূর্ব শক্তিধর বস্তু। একমাত্র হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ছাড়া দেহের যাবতীয় অঙ্গকে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবশ্য অন্যান্য চলমান প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা সত্য। তবে মানুষের মগজ এসব করেও অনেক বেশী অতিরিক্ত কাজ বা চিন্তা করতে জানে। বাস্তবে মগজ এতই শক্তিশালী যে আমরা তার ১০০ ভাগের মাত্র ২ থেকে ৪ ভাগ ব্যবহার করি- বাকী সব ক্ষমতা আজো অকেজো পড়ে আছে! মানুষের দৈহিক সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লক্ষ করার আছে। তবে যা বলেছি তাতেই আশা করবো সকলে বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীদের তুলনায় মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, শুধুমাত্র তার দৈহিক সৃষ্টির মধ্যে তুলনামূলক জটিলতা ও গুণাগুণ বেশী থাকায়। এবার প্রশ্ন জাগবে- তাহলে, সে কেমন করে নূরের তৈরি ফিরিশতা ও ধূর্মহীন আগুনের তৈরি জিন জাতি থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলো?

প্রশ্নটি নতুন নয়। মাটির উপাদান থেকে সৃষ্ট আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যখন আল্লাহ পাক যাবতীয় ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন এই একই প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সে সময়কার প্রশ্নকারী ছিল অভিশপ্ত শয়তান। আদম সৃষ্টি ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ আমাদের সবারই জানা আছে। অহংকার নামক

একটি খারাপ ধারণা শয়তানের মধ্যে দানা বেঁধেছিল তাই সে স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে বসলো। সে অভিশপ্ত হলো চিরকালের জন্য।

যা হোক, আমাদের প্রশ্নের মূলে কোন অহংকারের বিষয় নেই। আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি কোন্ জিনিষটি আমাদেরকে ফিরিশতা ও জিনদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলো। আর এটা ভালভাবে বুঝতে পারলে হয়তো আমরা নিজেদের চরিত্রকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবো, যা এই প্রবন্ধ রচনার আসল লক্ষ্য।

মানুষের মধ্যে একটি অতিরিক্ত গুণ বিদ্যমান যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। আর এটা হলো বিবেক। বিবেক খাঁটিয়ে মানুষ ভাল-মন্দ যাচাই করতে সক্ষম। ব্যক্তি থেকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবন চলার পথে মানুষ এই বিবেককে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করে নেয় তাহলে সে অনায়াসে সুষ্ঠু সুন্দর তুলনামূলকভাবে কলুষমুক্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। বিবেক নামক এই গুণটি ফিরিশতাদের মধ্যেও আছে। এটা জিন জাতির মধ্যেও বিদ্যমান। তবে জিন ও মানুষের মধ্যে বিবেক দ্বারা ভাল-মন্দ যাচাই ছাড়াও আরেকটি অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে। তাহলো, ভাল কিংবা মন্দ এই উভয়ের যে কোন একটি কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা। এখানে এসে আমরা ফিরিশতাদের থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে গেছি। ফিরিশতারা ভাল ও মন্দ উভয় বস্তু বুঝেন সত্যি কিন্তু ভাল ছাড়া মন্দ কর্ম সম্পাদনের কোন ক্ষমতা তাদের দেয়া হয় নি। তারা শুধুমাত্র প্রভুর নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে ভাল এবং মন্দ এই উভয় কাজের যে কোন একটি বা উভয়টি স্বেচ্ছায় আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআ'লায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, ভাল কাজ করার ক্ষমতা তো উত্তম জিনিস- মন্দ কাজ করার ইচ্ছে জাগ্রত হওয়া ও তা সম্পাদনের ক্ষমতা থাকার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কি হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ভাল কাজ করা ও মন্দ থেকে বিরত থাকার মধ্যে যে আত্মসংযম ও চেষ্টা, তদবীর, ফিকির করতে হয় তা ফিরিশতাদের করতে হয় না। তারা নিষ্পাপ। বস্তুত পাপ করার ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয় নি। মানুষকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং

দু'টির যে কোন একটি বাছাই করে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এখন, কেউ যদি মন্দটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে- আর যেহেতু এতে নফসে আম্মারা বা খোদাদ্রোহী 'নিজ' আরাম পেয়ে থাকে, রোজ কিয়ামতে তার পরিণাম হবে খারাপ। আর কেউ যদি মন্দকে পরিহার করে ভালটি গ্রহণ করে ও নফসে আম্মারাকে খোদাদ্রোহী আরাম থেকে বিরত রাখে তাহলে সে-ও কিয়ামতের দিন ভাল প্রতিদান পাবে। এখন মন্দকে কিভাবে পরিহার করতে হবে, এর সঠিক উপায় অবলম্বন ও রাস্তা কি- এসব প্রশ্নের জবাব আমরা পাই ইসলাম ধর্মে।

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে মন্দকে সনাক্ত ও তা পরিহার করা। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীবী হিসেবে তাকে মগজ দিয়েছেন আল্লাহ তাআ'লা যাতে তার বিবেক দ্বারা সে ভাল-মন্দের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে। কিন্তু 'ঈমান' ধর্মজ্ঞান ও সঠিক আমল ছাড়া সে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া সে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে যাবে। তাই বলা হয়, ইসলামের অর্থ 'আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ'। পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত রাস্তায় জীবনভর চলতে হবে। আমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সত্যি, কিন্তু আমাদের মধ্যে মন্দ স্বভাব যদি প্রবল হয়ে ওঠে এবং আমরা নফসে আম্মারার তাবেদারী তথা তাকে খুশি ও রাজী রাখার মধ্যে ঢুবে যাই তাহলে শুধু সর্বনাশ হবে না। আমরা শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়েও নেমে যেতে পারি অধঃপতিত একটি জন্তুর থেকেও নিম্ন পর্যায়ে। আমাদের চরিত্র পশু থেকেও খারাপ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

সব শেষে এটা স্পষ্ট হয়েছে বলা চলে যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত একাধিক কারণে হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয়টি হলো ভাল ও মন্দকে চেনা এবং এর যে কোন একটি বর্জন করার ইচ্ছে। এখন মন্দকে বর্জন করলে সে ফিরিশতাদের চেয়েও উত্তম হতে পারে। কারণ ফিরিশতাদের মধ্যে এই ক্ষমতা নেই। অপরদিকে মন্দকে গ্রহণ করে ভাল কর্মকে বর্জন করে সে হয়ে যেতে পারে পশু সমতূল্য। নিজেকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে তার স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লে জালালুহু অনুগ্রহ করে পৃথিবীতে

পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। তাঁরা প্রভুর দেয়া বিধি-বিধান ও পথ-নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে দেখিয়েছেন সঠিক রাস্তা- যে পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর যদি মানুষ তা বর্জন করে, তাঁদের দেখানো সত্যের পথে চলতে অপারগতা দেখায়, তাহলে সে শ্রেষ্ঠ জীবী হয়েও প্রভুর দরবারে ফিরে যাবে নিকৃষ্ট পশুসম হয়ে- সে সত্যিই সেদিন শ্রেষ্ঠ জীবী হওয়া সত্ত্বেও স্রষ্টার এবং নবী, রাসূল, কুতুব, আউলিয়া, দরবেশ, মুত্তাকী মু'মিন, নেককার ও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সম্মুখে ভীষণ লজ্জিত হবে। তাই আসুন, এই লজ্জা পাওয়া থেকে 'শ্রেষ্ঠ জীবী'র খেতাবে ভূষিত আমরা সকলে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি। ইসলামের প্রতিটি বিধি-নিষেধ মেনে চলি ও নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার প্রচেষ্টায় জিন্দেগী কাটিয়ে দিই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফিক দিন। আ-মিন।

সিলেট, ৭ শাওয়াল, ১৪২৬ হিজরী
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলমানদের উত্তরাধিকারঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ইতিহাস সাক্ষী, আরব মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গাণিতিক, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ, রসায়নশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের গবেষণার কারণেই পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটেছিল। আজকের বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার ফসল ভোগ করছে সমগ্র মানবজাতি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া থেকে মুক্ত এমন কোনো জনপদ পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছে প্রযুক্তি থেকে সৃষ্ট অসংখ্য হাই-টেক বস্তুর যাদুকরী ক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে সৃষ্ট কিছু বস্তু ও সুবিধার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়- যেমনঃ বিদ্যুৎ, মাইক্রফোন, যানবাহন, উড়োজাহাজ, মহাকাশ ভ্রমণ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রবট, কৃত্রিম বুদ্ধি, গ্লোব্যাল পজিশন সিস্টেম, সাংখ্যিক ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম, কৃত্রিম অরগ্যান, অরগ্যান ট্রান্সফার, লেইজার, হলোগ্রাম, ওয়াই-ফাই, মাইক্রওয়েভ, ফ্রিজ-ফ্রিজার, ড্রোন ইত্যাদি। এককথায়, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত মানবজীবনের সার্বিক উন্নতির পথ ও উপায় উদঘাটন করে যাচ্ছে। সৃষ্টি করছে অত্যাশ্চর্য, আকর্ষণীয় চমক ও অচিন্তনীয় প্রযৌক্তিক বস্তুসমগ্র।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের ব্যাপারে মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কী? জবাব মাত্র একটি- বিরাট। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মূলত ইসলাম ও মুসলমানদেরই অবদান। দ্রুত গতিশীল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযৌক্তিক উন্নয়ন একটি ‘ডবল-সাইডেড’ শানদার অসির মতো। ইসলামের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ পুরো মানবজাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে! সুতরাং আমাদের দায়িত্ব কেনো বিরাট তা এখন সঠিকভাবে অনুধাবনের সময় এসেছে।

পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষ ধীরে ধীরে স্বীকার করে নিচ্ছেন, নিষ্কলুষ তাওহিদী একমাত্র সত্যধর্ম হলো ইসলাম। আর ধর্মবিশ্বাস ছাড়া সত্যিকার অর্থে নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা ও তার ওপর জীবনচলার অন্য কোনো রাস্তা আদৌ খোলা নেই। মানুষ দার্শনিকদের নীতিশাস্ত্র [এ্যথিক্স]

থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শিখতে পারে বটে, কিন্তু জীবনচলার পথে এ জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ কি? জবাব হলো, প্রভুবিশ্বাস ও আখিরাতের বিচারদিবসের ওপর গাফিল তথা অবিশ্বাসী ধর্মহীন জনগোষ্ঠির সিংহভাগ মানুষ, জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পূরণে নীতি-নৈতিকতার জলাঞ্জলি দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টির অগোচরে কিংবা আইনের চোখ এড়াতে পারলেই তো হলো! অপরাধ ও নীতিবিরুদ্ধ কোনো কাজের জবাবদিহি তো আখিরাতের জীবনে যেয়ে দিতে হবে না। কারণ, তারা তো আখিরাত বিশ্বাসই করে না!

এখন প্রশ্ন জাগে মুসলমান হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগে কোন্ উপায়ে আমরা দায়িত্বহীনতা থেকে বেরিয়ে এসে, নীতি-নৈতিকতার বৃত্তের ভেতর আধুনিক বিজ্ঞানকে স্থানান্তরিত করতে পারি? আর যাই হোক, এটা সবাই মানবেন যে, বিরাট এ দায়িত্বপালন বিজ্ঞান-শিক্ষাকে বর্জন করে কখনো সম্ভব হবে না। সুতরাং আমাদেরকে বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে হবে। আর এটা জেনে নিতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মূলত মুসলমানদেরই উত্তরাধিকার।

বিজ্ঞানের ফসলের বীজ যদি গ্রীসে বপন হয়ে থাকে তাহলে এটাও সত্য যে, এর অঙ্কুরোদ্গাম, শাখা-প্রশাখা-পল্লবীর বিকাশ এবং এ যুগে এসে ফলন ইত্যাদির জন্য দায়ী ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাথমিক স্বর্ণযুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলদানকারী বৃক্ষসমূহের ক্ষেত্র ছিলো সে যুগের প্রসিদ্ধ মুসলিম জ্ঞানান্বেষায় উর্ভর-ভূমি আফগানিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, তাশকান্দ, তিরমিয, বাগদাদ, মিশর, কুর্দোভা, দামেস্ক, দিল্লী, গ্র্যানাডা, ফেজ, ইসফাহান, নিশাপুর, বসরা, কায়রওয়ান, ইস্কান্দারিয়া, সেভিল, সিসিলি, জায়তুনা ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ শহর ও কেন্দ্রস্থল। সবগুলো বৃক্ষই গজে ওঠেছিল একটিমাত্র বীচি থেকে। এ বীচির নাম হলো তাওহিদ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও তাঁরই ওপর নাজিলকৃত তাওহীদের বাণীসর্বস্ব সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, কুরআনুল করীমের কারণেই মানুষ সবদিক থেকে চরম উৎসর্গের পথে ধাবিত হয়েছিল। একদিকে তাওহিদ শিক্ষা দিয়েছিল, আল্লাহর পছন্দসই নীতি-নৈতিকতা

এবং অন্যদিকে আল্লাহর সৃষ্ট জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রেরণা। ফলে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরই ইসলামের পয়গাম পুরো সভ্য-পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই মুসলিম ভূমির বিভিন্ন শহরে বিজ্ঞান-গবেষণার চরম চেতনার বিকাশ ঘটে। জন্ম নেন অসংখ্য চিন্তাবিদ গবেষক- ইবনে সিনা, ফারাবি, কিন্দী, ইবনে রুশদ, ইমাম গাযযালী, আল-খোয়ারিজমি, বির্তুজী, ইবনে ফিরনাস, উমর খৈয়াম, উলুগ বেগ এবং আরো অনেক ইতিহাসখ্যাত মুসলিম মহাত্মন। তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সৃষ্ট জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করা ও প্রযৌক্তিক উপায়ে প্রদত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো। তাঁরা এসব কাজকে আল্লাহর নির্দেশ মানার অন্তর্ভূক্ত তথা 'ইবাদত' হিসাবে মনে করতেন।

সুতরাং, উপসংহারে এ কথাটিই ব্যক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছি যে, ইসলামের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত বৈজ্ঞানিক চেতনা বলতে আসলে কিছুই নেই। বিজ্ঞান তো মুসলমানদেরই উত্তরাধিকার। ইতিহাসের এক পর্যায়ে সে উত্তরাধিকারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে বিজ্ঞানচেতনা সম্পর্কে আমাদের মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে 'ঈমানী নূরে' বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব সকল মুসলমানের। আর খাস করে আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরামকে এ ব্যাপারে নিঃসংকোচে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী বিদ্যাপীঠসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করার নিশ্চয়তা দিতে হবে। বিজ্ঞানী তৈরির জন্য নয়- বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ-সৃষ্ট জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে তাওহীদের নূরে আরো বেশি আলোকিত হওয়া ও সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশ মানার নিমিত্তে এ সংস্কার কাজ সম্পাদন এখন সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আলিঙ্গনের সময় এসেছে। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমরা এক আল্লাহ-বিশ্বাসী মুসলমানদেরই উত্তরাধিকার।

সিলেট, নভেম্বর ১৬, ২০২৪।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইলমে তাছাওউফের গুরুত্ব

দু'টি কথাঃ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আ'লা রাসূলিহিল কারীম।

তারপর আরয, প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ- আপনারা এই প্রবন্ধটি পাঠের সময় মনোযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। ইলমে তাছাওউফ একটি উচ্চ পর্যায়ের বিষয় যার মূলে হলো ব্যক্তি জীবনে আত্মশুদ্ধির সাধনা। কারণ, আমরা তো সবাই পথভ্রান্ত, বিভ্রান্ত। মানুষ, জিন ও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত, রূহানীর দিক থেকে রোগাক্রান্ত। ইলমে তাছাওউফ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন খুব ভালো জিনিস, কিন্তু তা মোটেই যথেষ্ট নয়। আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার, আঘাতের পর আঘাতে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদিও যথেষ্ট নয়।

ইলমে তাছাওউফ তথা আল্লাহ-প্রাপ্তির আশা যদি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে থাকে, আর তা হওয়াই সবার জন্য বাঞ্ছনীয়, তাহলে অবশ্যই কোন ওয়াসিলার প্রয়োজন। ইলমে তাছাওউফ একটি কঠিন, কাটা-ভরা দীর্ঘ সরণী। এ রাস্তায় চলার নামই হচ্ছে তাছাওউফপন্থী হওয়া। যদি কেউ তা হতে চায় তবে অবশ্যই এ রাস্তা সম্পর্কে যে ব্যক্তি পুরোদমে ওয়াকিফহাল তাঁকে গাইড বা পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর এই ব্যক্তিই হচ্ছেন মুর্শিদে কামিল। সুতরাং আমার একান্ত আরয- এই প্রবন্ধ পাঠ শেষে যদি কারো হৃদয়ে এ রাস্তায় পাড়ি জমানোর অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে খুব শীঘ্র একজন হক্কানী পীরের নিকট বাইআত গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনার ব্যবস্থা করে নেবেন। বাস্তবে এই প্রবন্ধ লিখার একটুকুও ক্ষমতা আমার নেই। আল্লাহর খাস অনুগ্রহ, মায়া ও দয়া এবং আমার মুর্শিদ কুতবে বাঙ্গাল হজরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া (দাঃবাঃ) এর খাস দু'আ ও ওয়াসিলার ফসল এই লেখাটুকু। তবে মানুষ তো ভুলের ঊর্ধ্বে কখনও হতে পারে না। সুতরাং সকল ভুল-ত্রুটির জন্য আমি প্রথমত আল্লাহ জাল্লে জালালুহুর পবিত্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী।

এছাড়া সুহৃদ পাঠকদের নিকটও আশা, আপনারা এসব ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবেন। আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

তাছাওউফ পরিচিতি

তাছাওউফ সম্পর্কে এই কথাটি যথাযোগ্য: আমরা সবাই আত্মিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে রোগাক্রান্ত। এ রোগ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে তাযকিয়ায়ে নফ্‌স- তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি। তাযকিয়ায়ে নফ্‌স যেসব উপায়ে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব তা-ই হচ্ছে তাছাওউফ।

দুর্বল, রোগাক্রান্ত নফসের অধিকারী মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সহীহ্ ও মজবুত সম্পর্ক গড়তে অপারগ। আর এরূপ সম্পর্ক ছাড়া তাঁর নৈকট্য ও রেজামন্দি হাসিল অসম্ভব। তাযকিয়ায়ে নফসের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "ওয়াযকুরিসমা রাব্বিকা ওয়াতাবাত্তাল ইলাইকা তাবতীলা" [সূরা মুয্‌যাম্মিল]। অর্থাৎঃ তুমি নাম যপ্ কর তোমার প্রতিপালকের এবং সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে পুরোপুরিভাবে তাঁর দিকে নিবিষ্ট ও নিমগ্ন হয়ে থাক।

উপর্যুক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে যে আল্লাহর যিকির একাগ্রচিত্তে একান্ত সংগোপনে করাই হচ্ছে সর্বোত্তম যিকির। আর এই একা একা লোক সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে লুকিয়ে আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদাত-বন্দেগীতে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই তাযকিয়ায়ে নফ্‌স সম্ভব হতে পারে। যা হোক যিকির-মুরাকাবা সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনার আশা রাখি। এখানে তাছাওউফের একটি সম্ভাব্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা চালাচ্ছি মাত্র। কারণ তাছাওউফকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। বাস্তবে এর স্বরূপ আলোচনা করতে যেয়ে সুপ্রসিদ্ধ অনেক গাউস, কুতুব, আওলিয়া, আবদাল ও দরবেশ ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এতে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, তাছাওউফ বাস্তবে কোন বিশেষ বাক্য দ্বারা বা গণিতের প্রতিপাদ্যের মতো সংজ্ঞায়িত করার বিষয় নয়। এটা একটি বিরাট বিষয়। সুতরাং মা'রিফাত বা আল্লাহ-প্রাপ্তির সঠিক যতো রাস্তা আছে এগুলো সবই

তাছাওউফ- এ কথাটি অনুধাবন করে নিলেই তাছাওউফ কি তা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হবে বলে আশা করা যায়।

এবার দেখা যাক তাছাওউফকে বিভিন্ন কিতাবে কে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এ থেকে অবশ্যই আমরা অনেক ব্যাপার বুঝতে সক্ষম হবো।

তাছাওউফ শাস্ত্রের উপর হাজার বছর পূর্বে প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ হজরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (রাহঃ) [মৃঃ ৪৬৫ হিঃ] 'কাশফুল মাহজুব' নামকরণে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কিতাবটি আলোচিত শাস্ত্রের উপর ফার্সি ভাষায় অনেকের মতে প্রথম রচিত কিতাব। সর্বজন সমাদৃত ও স্বীকৃত এই প্রামাণ্য গ্রন্থে হজরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (রাহঃ) তাছাওউফের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে আগের যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর ক'টি এখানে তুলে ধরছিঃ ১. "চরিত্র বা স্বভাবঃ হযরত মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা.) বলেছেনঃ তাছাওউফ হলো সচ্চরিত্র ও সৎ স্বভাবের নাম। মানুষ সৎস্বভাবে যত অগ্রগামী হবে, তার তাছাওউফও ততটা বর্ধিত হবে।" [কাশফুল মাহ্‌জুব, অনুবাদ- মুহাম্মদ সিরাজুল হক, পৃঃ ৪৪; ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা]

২. "হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেছেনঃ আট প্রকার চরিত্র নিয়ে তাছাওউফ গঠিত। যথাঃ সাখাওয়াত [দানশীলতা], রেযা [আল্লাহর সন্তুষ্টি], সবর [ধৈর্য], ইশারাত [ইঙ্গিত - কথা কম বলা], গুরবাত [অপরিচিত হওয়া], পশমী পোশাক [মোটা সুতার পোশাক], সিয়্যাহাত [ভ্রমণ] এবং আল-ফাকরু [দারিদ্র্যতা - জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রতি অনীহা]।" [প্রাগুক্তঃ পৃঃ ৪৫]

৩. "তাছাওউফ এবং সূফী শব্দ দু'টি 'সাফা' শব্দ থেকে নির্গত। এর বিপরীত শব্দ হলো 'কযর' বা 'কাদুরত' যার অর্থ অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং যিনি স্বীয় চরিত্র, আচার-ব্যবহার সুন্দর করেন, চরিত্র ও স্বভাবকে অনাচার ও কলুষতা থেকে মুক্ত রাখেন এবং আল্লাহর দাসত্ব করার গুণাবলী নিজের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ব করে নেন, ঐ ব্যক্তিই হলেন সূফী। তিনিই 'আহলে তাছাওউফ' বা তাছাওউফপন্থীদের মধ্যে পরিগণিত হন।" [প্রাগুক্তঃ পৃঃ ৪৬]

তাছাওউফের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে উপরোদ্ধৃত ভাষার চেয়ে আরও সুন্দর ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এরপরও আমাদের মনে প্রশ্নের শেষ নেই। অনেকে ভাববেন, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে বর্ণিত উত্তম চরিত্র গঠনে চরিত্র-দর্শনের উপর অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমলই তো যথেষ্ট। আর তা অর্জনে চরিত্র দর্শনের উপর বড় বড় দার্শনিক ও সমাজ-সচেতন চিন্তাশীল মনীষীদের গবেষণার উপর স্ট্যাডি করা যেতে পারে। সুতরাং পীর-মুরীদি আবার কি জিনিস! এর দরকার কী?

অবশ্য মুসলিম-অমুসলিম গুণিজনদের মানব-কল্যাণে চিন্তা-গবেষণা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া এবং প্রয়োজনে উপদেশ গ্রহণ করা কোন দোষনীয় কাজ নয়- বরং তা প্রশংসনীয় ব্যাপার নিঃসন্দেহে। কিন্তু এসব ব্যাপার মোটেই তাছাওউফ নয়! তাছাওউফ অবশ্যই পীর-মুরীদির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। এর প্রমাণ এবার উপস্থাপন করবো।

এখানে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়- আর তাহলো 'বাইআত' শব্দের ব্যাখ্যা। অনেকে প্রশ্ন করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী আজকের পীরদের মতো 'বাইআত' গ্রহণ করতেন? এর জবাবে বলবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিহাদ ও ইসলাম কবুলের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বজন-জ্ঞাত সত্য। কিন্তু তিনি সাধারণ বাইআতও গ্রহণ করেছিলেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এসব বাইআতের উদ্দেশ্য ছিলো শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানা ও আমল-আখলাক সঠিক করা। এ ব্যাপারে একটি হাদীস শরীফ প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছি।

হজরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নয়, আট বা সাত ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বাইআত গ্রহণ করবে না? তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা কিসের উপর আপনার বাইআত গ্রহণ করবো? তিনি ইরশাদ করলেন- এ কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, আল্লাহর বিধান শোনবে এবং

তা পালন করবে। [মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফ - হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান (রাহঃ) প্রণীত 'শরীয়ত ও তাসাওউফ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

উপরে উদ্ধৃত হাদীস শরীফ কামিল মাশাইখগণের মধ্যে প্রচলিত বাইআত গ্রহণের রীতি আজো যে প্রচলিত আছে তা দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

মুর্শিদ বা শাইখের হাতে বাইআত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীস শরীফ ছাড়াও যুক্তির মানদণ্ডে যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। এটা মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বিধানসমূহের মধ্যে একটি এই যে, উস্তাদ ছাড়া কোন বিষয়েই পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। সাধারণত কোন ব্যক্তি যদি ডাক্তার হতে চায় তাহলে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করা ছাড়াও অন্তত ২-৩ বছর ইন্টারনি হিসেবে প্র্যাকটিস করতে হয়। অনুরূপ কেউ যদি দর্জি হতে চায় তাহলে মাস্টার দর্জির কাছে থেকে সবকিছু শিখতে হবে- শুধু বই-পুস্তক পাঠ করে দর্জি হওয়া যাবে না। ড্রাইভিং শিখতে হলেও গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে একজন উস্তাদের নির্দেশে ধরতেই হবে। ঠিক এভাবে তাছাওউফ বা তরীকতের জগতে একা একা চলার কোন সুযোগ নেই। চললে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী। এ ক্ষেত্রেও একজন দক্ষ, কামিল মুর্শিদের শরণাপন্ন হতে হবে।

তাছাওউফের সঙ্গে কেন্দ্রীয় যে বস্তুটি সর্বাবস্থায় জড়িত তা হলো ইশকে ইলাহী। কিন্তু এই ইশকের রাস্তায় পড়ে আছে অসংখ্য কাটা ও বাঁধা-বিপত্তি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল হচ্ছে মানবজীবনের পরম চাওয়া-পাওয়া ও একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং এ লক্ষ্যর্জনে বাঁধা-বিপত্তি তো থাকবেই। আর ইবলিস নামক মরদুদ তো আছেই- উপরন্তু আমাদের নিজের মধ্যে আরেক বড় দুশমন বাসা বেঁধে আছে যার নাম 'নফসে আম্মারা'। এসব শক্তিশালী দুশমনদের খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ইশকে ইলাহীর অনুপম সুধা পানে জীবনকে ধন্য করা সহজ ব্যাপার মোটেই নয়। তাই কবি বলেছেন:

হে হৃদয়! আধ্যাত্মিক সফরের বাসনা যদি তোমার মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে,

তবে তুমি অচিরেই কোন কামিল পথ প্রদর্শকের খিরকায় আঁকড়ে ধরো,

অন্যথায় সাথীহারা ইশকের পথে কদম ফেলে তুমি

সারা জনম কাটাবে, কিন্তু ইশকে ইলাহি তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই যাবে।

সুতরাং শুধুমাত্র কিতাবী বিদ্যায় পারদর্শিতা যেমন অসম্ভব তেমনি, কোন বুজুর্গের সুহবত বা সান্নিধ্য ছাড়া অর্থাৎ মুরীদের মতো মুরীদ না হয়ে কামালিয়াত হাসিল কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে এই: আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন হচ্ছে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু তা হাসিলে অবশ্যই হকপন্থী কামিল কোন মুর্শিদের নিকট মুরীদ হয়ে তাঁর নির্দেশমতো ইবাদত বন্দেগীসহ জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর এভাবে করার নামই হচ্ছে তাছাওউফ। তাছাওউফ একটি রাস্তার নাম- যে রাস্তায় চললে কাঙ্ক্ষিত মাক্বাম বা স্তরে উপনিত হওয়া যায়। আর সে মাক্বাম হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রেজা।

তাছাওউফ একটি প্র্যাকটিসের নাম। কামিল পীরের নির্দেশ মুতাবিক শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা ও যিকির-মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকা। তাছাওউফ ইশকে ইলাহীর রাস্তা। এই ইশকের খবর সঠিকভাবে সে-ই জানে যে সত্যিকার আশিক। সুতরাং এ রাস্তায় চলে যিনি অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানার্জন করেছেন, তিনি এ রাস্তার খবর রাখেন। একমাত্র তিনিই অন্যকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেন। আর এই গাইড বা পথপ্রদর্শকই হচ্ছেন মুর্শিদে কামিল।

কামিল পীরের পরিচয়

আমরা ইতোমধ্যে একথা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, তাছাওউফ হচ্ছে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য- আল্লাহ-প্রাপ্তির পন্থা। কিন্তু এ পথে সঠিক গাইড ছাড়া অগ্রসর সম্ভব নয়। সুতরাং এই মুর্শিদে কামিলের পরিচয় আমরা কিভাবে পাবো? যার প্রতিটি নির্দেশ আমি কায়মনোবাক্যে মেনে নিতে যাবো, যার কথায় আমার বাকী জীবনের ওঠা-বসা, ইবাদাত-বন্দেগী, জিকির-আজকার সবই পালিত হবে, সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে আমি চিনবো কি করে? আগে না চিনে যদি তাঁকে গ্রহণ করে নিই তাহলে পরে পস্তাতে হবে- হয়তো বেপথে পতিত হয়ে জীবন বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং

এই পীর, মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক কি রকম হওয়া উচিত। তাঁর মধ্যে কিসব গুণাবলী থাকা অত্যাবশ্যক?

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হাকিমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ্‌র সুযোগ্য খলীফা হজরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রাহঃ) নিম্নোক্ত ক'টি গুণাবলী প্রত্যেক কামিল পীরের মধ্যে থাকা একান্ত জরুরী বলে বর্ণনা করেছেন।

১. তিনি সুন্নাতের পুরোপুরি পাবন্দ একজন সঠিক দীনদার ব্যক্তি হবেন।

২. একজন দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী হবেন। অর্থাৎ তাঁর সুহবত হবে মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক রোগের নিরাময়।

৩. মুরীদদেরকে একজন দক্ষ শাসকের ন্যায় পরিচালনা করবেন। মুরীদদের প্রতি কড়া খেয়াল রাখবেন- যাতে তারা সঠিকভাবে শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনে চলে।

৪. তিনি দীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখবেন- সেটা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে কিংবা কোন কামিল মুর্শিদের সুহবত থেকে অর্জিত হোক- তাতে কিছু আসে যায় না।

৫. তিনি অবশ্যই নির্ভরযোগ্য কামিল কোন পীরের খলিফা হবেন। অর্থাৎ মুরীদ করার ইযাজত স্বীয় পীরের নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন।

৬. উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী হওয়া, অর্থাৎ তিনি কবীরা গোণাহ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকবেন। আর সগীরা গোণাহ কদাচিৎ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবাহ করে তা থেকে বিরত থাকবেন।

৭. তিনি পর্যাপ্ত সময় কোন শাইখের নিকট কাটিয়ে তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ থাকতে হবে।

৮. বিজ্ঞ হক্বপন্থী উলামা তাঁর সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ও জটিল কোন সমস্যার সঠিক সমাধান দেয়ার ক্ষমতা থাকা।

৯. তাঁর সুহবতের ফলে মানুষের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত কমে যাওয়া ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ বাড়া। তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়া। নিজের গোণাহ খাতার কথা হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে অনুশোচনা বা তাওবাহর ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠা।

১০. তাঁর বেশিরভাগ মুরীদদের চাল-চলন শরীয়তসম্মত হওয়া। অর্থাৎ তাঁর মুরীদ হওয়ার ফলে মানুষের ফায়দা হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া।

১১. তাঁর মধ্যে পার্থিব কোন লোভ-লালসা মোটেই না থাকা।

১২. তিনি স্বয়ং নিজেও আল্লাহর যিকির-ফিকির ও ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। [দেখুনঃ শরীয়ত ও তাছাওউফ, হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রাহঃ), অনুবাদঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ সাহেব, পৃঃ ৫২-৫৪]

কামিল বুজুর্গদের সাহচর্য লাভে উপকার

সৎসঙ্গে স্বর্গলাভ ও অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এই প্রবাদ বাক্যটি একদম হক্ব কালাম। মানুষ সৎসঙ্গের ফলে উপকৃত হবেই। তবে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত হতে হলে সত্যিকার কামিল বুজুর্গদের সাহচর্য লাভের প্রয়োজন। কেউ যদি ভালো ব্যবসায়ী হতে চায় তাহলে সফল ব্যবসায়ীদের সঙ্গ লাভ তার জন্য ফলদায়ক হবে। কেউ যদি ভালো দর্জি হতে চায় তাহলে কোন দক্ষ দর্জির সঙ্গ লাভ তার জন্য অবশ্যই উপকারী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের আশা রাখে তাহলে যে তা হাসিল করেছেন তাঁর সঙ্গ লাভ তথা সাহচর্য অর্জন যে মহামূল্যবান ব্যাপার, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া আরও অনেক উপকার নিহিত আছে।

সৎসঙ্গের গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (রাহঃ) বলেনঃ "আদব শিক্ষার প্রধান উপায় হলো, আল্লাহর নেক বান্দা ও বুযুর্গদের সংস্রব গ্রহণ করা, তাঁদের একান্ত সান্নিধ্যে থাকা।" [কাশফুল মাহজুব]

খাস করে স্বীয় মুর্শিদের সুহবত বা সংসর্গ প্রত্যেক মুরীদের জন্য একান্ত জরুরী। যেমন কবি বলেছেনঃ

মুর্শিদের সংসর্গ হতে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া চাই না,
আনন্দে হে মন নর্তন করো,
আস্তানার মৃত্তিকা চুম্বন করো,
কিন্তু জলদি না- পলায়ন করো।

[শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব রচিত 'মানাযেলে সুলুক' কিতাব থেকে উদ্ধৃত]

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব ‘মানাযেলে সুলুক’ গ্রন্থে সুহবতের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে যেয়ে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: জনৈক ব্যক্তি এক রঞ্জককে (যারা কাপড়ে প্রিন্ট বা রংয়ের কাজ করে) অনুরোধ করলো, ভাই আমার এই কাপড়খানায় রং করে দিন। রঞ্জক বললো, ৭২ ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু কাস্টমার ব্যক্তিটি অনুনয় করে বললেন, আমার হাতে এত সময় নেই। কালই আমাকে অন্যত্র যেথে হবে। রঞ্জক জবাব দিল, ঠিক আছে। কিন্তু রং পাকা হওয়ার কোন দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

উপর্যুক্ত উপমা থেকে এটাই স্পষ্ট যে, স্বীয় শায়খের সুহবত থেকে যারা তাড়াহুড়ো করে চলে যায় বা তাঁর সান্নিধ্যে সময় ব্যয় করে না তাদেরও রং কাঁচা থেকে যাবে। ইলমে মা’রিফাতের রংয়ে রঞ্জিত হতে পারবে না। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা পরিবেশও দীনের রংয়ে রঙিন হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ তাদের কথা, কাজ ও ওয়াজ-নসিহত থেকে শ্রোতাদের তেমন ফায়দা হয় না। পক্ষান্তরে যারা সুহবতে থেকে স্বীয় মুর্শিদের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে তখন তারা নিজেরাও উস্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। তাদের দ্বারা দীনের খিদমাত হতে থাকে। হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ) তাই বলেন:

আমি যেখানে যেই পরিবেশেই যাই,
সর্বত্র আমি তোমারই (আল্লাহর) গুণকীর্তন করি,
তোমারই মহিমা গাহিয়া বেড়াই।
যেই মাহফিলেই যাই, সব স্থানে তোমার রঙেই শুধু,
রাঙ্গা দেখিতে পাই।

সুহবতের ফায়দা বর্ণনা করতে যেয়ে হযরত মাসীহুল্লাহ খান ১২টি উপকার বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে:

১. শায়খের উত্তম গুণাবলী ক্রমান্বয়ে মুরীদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়।

২. নফসের ইসলাহ (পরিশুদ্ধি) পুরোপুরি না হলেও অন্তত তার নিজের মধ্যকার দোষ-ত্রুটি মুরীদের চোখে ধরা পড়ে।

৩. শাইখের আখলাক বা চরিত্র-দর্শনের অনুসরণ করার ফলে যিকির এবং ইবাদতে স্বাদ ও হিম্মত খোঁজে পায়।

৪. কোন জটিল আত্মিক, মানসিক কিংবা সাংসারিক অবস্থার সন্তোষজনক সমাধান মুর্শিদের কাছ থেকে পেয়ে যায়।

৫. শাইখের কাছ থেকে মৌখিকভাবে শোনা নসিহত ও তাছাওউফের আলোচ্য বিষয়াদি ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাধারণত উন্নতমানের ও সারসংক্ষেপ হয়ে থাকে। এতে মুরীদের আত্মিক অবস্থা তার নিজের নিকট স্পষ্ট ধরা পড়ে।

৬. মুর্শিদের সুহবতের একটি বরকত আছে- এছাড়া তাঁর চাল-চলন ও আমল আখলাকের অনুসরণ মুরীদের জন্য বিরাট শিক্ষনীয় ব্যাপার।

৭. সুহবতের বরকতে আমলের উৎসাহ-উদ্দীপনা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

৮. মুরীদের নিজের যোগ্যতার পরিমাপ হয়।

৯. আল্লাহর ইশকে উদ্বেলিত পীরের হৃদয় থেকে সুহবতের বদৌলতে ইশকের ছোঁয়া লেগে থাকে।

১০. কামিল পীর-দরবেশগণ সর্বদা নেক আমলের কারণে বরকতপূর্ণ হয়ে থাকেন। সুতরাং তাদের দেয়া তা'লিমের মধ্যে থাকে অফুরন্ত বরকত যা কস্মিনকালেও কিতাব অধ্যয়ন করে পাওয়া যায় না। মুরীদ সুহবতের ফলে তা লাভে ধন্য হয়।

১১. ভাল কথা বার বার শোনলে তার প্রতিক্রিয়া শ্রোতার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এর ফলে মুরীদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া মুর্শিদের মকবুল দু'আর মধ্যে বিরাট বরকত নিহিত। সুহবতে থাকলে সময় সময় এই দু'আ মুর্শিদের অন্তর থেকে এমনিতেই হয়ে থাকে- যে দু'আ নিজে চেয়ে পাওয়ার তুলনায় হাজার গুণেরও অধিক মর্তবার বিষয়। তাঁর মকবুল বান্দার অন্তরের খাস ইচ্ছাকে আল্লাহ পাক অবশ্যই কবুল করে থাকেন। আর গোপনীয় একটি বিষয় হচ্ছে এই: শায়খের মহব্বত মুরীদের জন্য বিশেষ বরকতপূর্ণ হয়ে থাকে। তার আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আমলে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়।

১২. কামিল পীরের অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত থাকে। এই নূরের মধ্যে আলো ও উত্তাপ উভয়টিই আছে। যেমন একটি অগ্নিকুণ্ডের কাছে যদি

মানুষ চতুর্দিকে দাঁড়ায় তাহলে সবাই উত্তাপ ও আলো উভয়টি পাবে। ঠিক তদ্রূপ কামিল মুর্শিদের সুহবতে থাকলে নূর ও উষ্ণতার মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে।

মা'রিফাত জগতের বাদশাহ প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশক্‌র (রাহঃ) ইসরারুল আওলিয়া গ্রন্থে বলেনঃ ওহে দরবেশগণ! আমি একবার কাযী হামীদ উদ্দীন নাগুরীর সাথে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ফরয এবং সুন্নাত কাকে বলে?

নাগুরী সাথে সাথেই উত্তর দিলেন- পীরের সংস্রব ফরয। পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু ত্যাগ করা সুন্নাত। [ইস্‌রারুল আওলিয়া, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল অনূদিত]

আগেকার দিনের মহাত্মন ওলিআল্লাহরা স্বীয় পীরের সুহবতকে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। একই প্রসঙ্গে হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশক্‌র (রাহঃ) স্বীয় পীর খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহিমাহুল্লাহ্‌র একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেনঃ

আগার আশেকী দুস্তী বাহ্ তানহাশ্ তলব;
দর খেলওয়াতে ইশ্‌ক আয়ে ওয়া পরদায়েশ তলব।
গরমী খাহী হুযুরে নেয়ামত হর রোয্;
আঁ জাকে কেসী না বাসাদ আঁজাশ তলব।

অর্থাৎঃ

যদি তুমি প্রেমিক হও তবে বন্ধুকে নির্জনে আহ্বান কর;
প্রেমের নির্জনতায় আস, পরে তাকে ডাক!
যদি তুমি প্রত্যহ তার সাক্ষাৎ চাও;
তবে তাকে এমন স্থানে ডাক যেখানে কেহ না থাকে।

এই ইশকের ছোঁয়া যার ওয়াসিলায় পাওয়ার আশা করা যায় তিনি তো মুর্শিদে কামিল। তাঁর সুহবত ছাড়া তা হাসিল হবে কি করে? সুতরাং স্বীয় মুর্শিদের সাহচর্য একান্ত জরুরী। তাছাওউফপন্থীকে তাই কস্মিনকালেও ভাবা উচিত নয় যে, আমি মাক্বামে মাকছুদে পৌঁছে গেছি! বাস্তবে স্বীয় পীরই মুরীদের অবস্থা সঠিকভাবে জেনে থাকেন। মুরীদ নিজে তার আত্মিক

রোগ হেতু অনেক সময় অনেক কথা ভাবে যা বাস্তবে ভ্রান্ত। এমনকি এটা হক্ব মনে করার ফলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একমাত্র মুর্শিদের সুহবতই এরূপ অবস্থায় অধঃপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

পরিশেষে এটুকু বলে প্রবন্ধের ইতি টানছি যে, ইলমে তাছাওউফ আমাদের জীবনে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যাঁ, একথা সঠিক- আমরা সবাই কামিল পীর-আওলিয়া-দরবেশ হতে পারবো না! কিন্তু যারা এই রাস্তায় নেমে কঠিন সাধনার মাধ্যমে নিজেদের সংশোধিত করে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের অনুসরণ, অনুকরণ এবং মুরীদ হয়ে তাযকিয়ায়ে নফসের সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে যৌক্তিকতা কিছু নেই। আমাদের সবারই কাম্য বস্তু হলো দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তি ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ। এই লক্ষ্যর্জনে নিজেদের নফসের ইসলাহ ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। ইসলাহ অবশ্যই করতে হবে। আর তা করার উপায়ই হচ্ছে ইলমে তাছাওউফ। ইলমে তাছাওউফ শরীয়তের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দিক। এটা ছাড়া শরীয়ত অপূর্ণ থেকে যায়। যারা তাছাওউফের গুরুত্ব অনুধাবন করতে অপারগ কিংবা তা মানে না তারা ভ্রান্ত। এরা বাহ্যিক জ্ঞানী হতে পারেন, সঠিক হাক্বিকাতের জ্ঞান সম্পর্কে এরা চিরদিনই গাফিল থেকে যাবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। তিনি অনুগ্রহ করে কোন খাঁটি পীর তথা কামিল ওলিআল্লাহর মুরীদ হওয়ার তাওফিক দিন, আ-মিন।

সিলেট, ২ মার্চ ২০০৫।